
মুক্ত বিহঙ্গ-১
কাজী আনোয়ার হোসেন
মাসুদ রানা
সেবা

মাসুদ রানা

মুক্ত বিহঙ্গ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

এক

মেশিন বা যন্ত্রের মধ্যে নারীসুলভ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মত। আপনমনে মুচকি একটু হেসে কথাটা ভাবল মাসুদ রানা। ওর কাছে মেশিন মাত্রেই স্ত্রীলিঙ্গ। অস্বীকার করবার যো আছে ওগুলো কৌতুকপ্রিয়, ছলনাময়ী এবং কেউ কেউ নষ্টা? কাজেই সবুজ আমগাছ তলায় এক সারে দাঁড় করানো বাহনগুলোকে প্রথমবার দেখামাত্র রানা বুঝল, ওগুলো অঘটনঘটনপটিয়সী লৌহমানবী।

তাঞ্জানিয়া সরকার শুধু এই গাড়িগুলোই নয়, বাড়তি অথবা বাতিল আরও অনেক জিনিস নিলামে বিক্রি করতে যাচ্ছে। অন্যান্য জিনিসের স্তূপ থেকে দূরে রাখা হয়েছে গাড়ি পাঁচটা। মে মাস, এবং সময়টা দুই বর্ষা মরশুমের মধ্যবর্তী শীতল ঋতু হলেও, সকালের মেঘহীন আকাশের নীচে জ্বলন্ত তন্দুর হয়ে আছে দার-এস-সালাম। আমগাছ তলার ছায়ায় পৌঁছে স্বস্তিবোধ করল রানা, দাঁড়াল লৌহমানবীদের গা ঘেঁষে, খুঁতখুঁতে মেকানিকের দৃষ্টিতে জরিপ শুরু করল।

পাঁচিল ঘেরা বড় উঠনটার চারদিকে একবার চোখ বুলাল ও, দেখল সে শুধু একাই গাড়িগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী। বহুবর্ণ সম্ভাব্য

ক্রেতারা ভিড় করেছে ভাঙা কোদাল, শাবল, খালি ড্রাম, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদির সামনে, আর্মারড কারগুলোর দিকে কেউ ভুলেও তাকাচ্ছে না। ওগুলোর দিকে আবার ফিরল ও, জ্যাকেট খুলে ঝুলিয়ে রাখল আমগাছের নিচু একটা ডালে।

ভাল জাতের জিনিস, তবে কঠিন ধকল গেছে ওগুলোর উপর দিয়ে। শক্ত চোখা রেখা আর কিনারাগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, রঙ চটে যাওয়ায় মরচে ধরেছে গায়ে, উপরের অংশ কাক আর বাদুড়ের বিষ্ঠা দিয়ে লেপা। ক্যানভাস ব্যাগটা একপাশে সরিয়ে রাখল রানা, ভিতরে টুলস্ রয়েছে। গাড়িগুলোর ঠিকানা কুলজী সম্পর্কে জানা আছে ওর। কারিগরি নৈপুণ্যের ভারি চমৎকার পাঁচটা নমুনা, তাঞ্জানিয়া উপকূলে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ষাট সত্তর বছর আগে শ্রেইনার বানিয়েছিল ওগুলো, উঁচু গম্বুজে ম্যাক্সিম মেশিনগান বসানোর জন্য রয়েছে খোলা জায়গা, এই মুহূর্তে শূন্য একটা অক্ষিকোটরের মত হাঁ করা। এঞ্জিন হাউজিঙের উপর প্ল্যাটফর্মটা চৌকো আর ঢালু, অত্যন্ত ভারি আর্মার প্লেট, রিবেটগুলোর সারি নিখুঁত ভাবে সাজানো, ছুটে আসা শত্রুর বুলেট থেকে রেডিয়েটরকে রক্ষার জন্য ইস্পাতের শাটার আছে, প্রয়োজনে বন্ধ করা যায়। ধাতব হুইলে নিরেট রাবারের টায়ার লাগানো, কাঠামোটাকে উঁচু করে রেখেছে। রানার ভাবতেও খারাপ লাগল সম্ভবত ওর হাত দিয়েই বডির ভিতর থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসবে এঞ্জিনগুলো। দু'একটা বডিও বোধহয় বাতিল করতে হবে, রঙের পোঁচ দিয়ে আর যাই হোক বুলেটের ফুটো বন্ধ করা যায় না। আর্মারড কারগুলোর উপর দিয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধের ধকল গেছে, আবরণের ভিতর মরচে ধরা লোহা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা তাই সন্দেহ। অবশ্য মাঝখানে এক সময় এঞ্জিন বদলে নতুন সাড়ে ছয় লিটার বেন্টলি লাগানো হয়েছিল, পরীক্ষা করে দেখতে

হবে সেগুলোরই বা কী অবস্থা। নতুন এঞ্জিন লাগানোর পর তাঞ্জানিয়া সরকার একটানা কয়েক যুগ সীমান্ত এলাকায় প্রহরার কাজে ব্যবহার করেছে ওগুলো, ড্রাইভাররা বেশিরভাগ সময় দুর্গম পাহাড় আর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গরুচোরদের ধাওয়া করে ফিরেছে। তবু রানার মনে ক্ষীণ আশা, যতই কিনা দুঃসময়ের ভিতর দিয়ে আসুক, বেন্টলি এঞ্জিন একেবারে বাতিল হওয়ার জিনিস না। অপারেশন শুরুর মুহূর্তে সার্জেন যেমন আস্তিন গুটায়, রানাও তেমনি গুটাল, নড়ে উঠল ঠোঁট জোড়া, 'তৈরি হও, সুন্দরীরা; তোমাদের নাড়ী-নক্ষত্র যাচাই করা হবে।'

মাসুদ রানা প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা, গায়ে অতিরিক্ত চর্বি না থাকলেও হাড়গুলো চওড়া এবং পেশীবহুল শরীর, আর্মারড কারের বডির ভিতর ঢুকবার পর নড়াচড়ার জায়গা খুব কমই অবশিষ্ট থাকল। কিন্তু কাজের ভিতর মন ঢেলে দেওয়ায় কোথায় কী কষ্ট বা অসুবিধে হচ্ছে খেয়ালই থাকল না ওর। গোল করা জোড়া ঠোঁট থেকে বিরতিহীন শিস হয়ে বেরিয়ে আসছে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-সুর, ভিতরের আবছা অন্ধকারে কুঁচকে আছে চোখের চারপাশ।

দ্রুত কাজ করছে রানা। প্রথমে কন্ট্রোলের থ্রটল আর ইগনিশন সেটিং চেক করল। দেখে নিল পিছনে বসানো ফুয়েল ট্যাংক থেকে লাইনগুলো কোন্ পথ ধরে এসেছে। ড্রাইভারের সিটের তলায় কক্ রয়েছে দেখে সন্তুষ্টির আভা ফুটল মুখে। পাঁচিল বেয়ে উঠবার ভঙ্গিতে টারিট থেকে বেরিয়ে এল ও, লাফ দিয়ে বাহনের উঁচু পাশটায় নামল, চুল থেকে গড়িয়ে গালে নেমে আসা ঘামের ধারা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছবার জন্য থামল মুহূর্তের জন্য, তারপর সামনে এগিয়ে খুলে ফেলল আর্মারড এঞ্জিনকাভার।

এঞ্জিনে চোখ পড়তেই খুশিতে নেচে উঠল মন। বেন্টলির গায়ে ধুলো আর তেল মাখামাখি হয়ে আছে, কিন্তু মরচের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কাঠামোর কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, প্রতিটি পার্টসের আকৃতি অবিকৃত। হাতের আঙুল আর তালু দিয়ে এঞ্জিনের গায়ে হাত বুলাল রানা, যেন আদর করছে। এঞ্জিন সাম্প থেকে ডিপস্টিক বের করে এক ফোঁটা তেল নিল দু'আঙুলের মাঝখানে। করকরে ভাব অনুভব করে গম্ভীর হলো চেহারা, গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল কাঠি। টেনে প্লাগ খুলল ও, অলসভঙ্গিতে ঘুরঘুর করতে দেখে এক আফ্রিকানকে কাছে ডেকে এক শিলিঙের বিনিময়ে ক্র্যাংকটা ঘোরাতে বলল, হাতের তালু ঠেকিয়ে কমপ্রেশন পরীক্ষা করল।

দ্রুত হাঁটাচলা করছে রানা, কখনও পিছু হটছে, কখনও সামনে বাড়ছে, দূর থেকে দেখে মনে হতে পারে নৃত্যচর্চায় মশগুল। এক এক করে পাঁচটা আর্মারড কার পরীক্ষা করল ও, গুরুত্বপূর্ণ কোন অংশই চেক করতে বাকি রাখল না। কাজ শেষ করে বুঝল, তিনটে অবশ্যই চালানো যাবে, সম্ভবত চারটে।

বাকি একটার কোন আশা নেই। ওটার এঞ্জিন ব্লকে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, রানার মনে হলো পিঠে মাহুত নিয়ে একটা হাতি অনায়াসে গলে যেতে পারবে। আর পিস্টনগুলো নিজেদের খোপে এমন নিরেটভাবে আটকে গেছে, দু'জন মিলে ক্র্যাংক হাতল ঘুরিয়েও সেগুলোকে নড়ানো গেল না।

দুটো গাড়ির গোটা কারবুরেটরই নেই, তবে চেষ্টা করলে হয়তো বাতিল লোহা-লক্কড়ের গাদা থেকে একটা অন্তত ম্যানেজ করা যেতে পারে। অর্থাৎ কারবুরেটর পাওয়া গেলে মোট চারটে সচল গাড়ি ভাগ্যে জুটবে। বেশি আশা না করে, তিনটেই ধরা উচিত।

প্রতিটি যদি এক হাজার একশো শিলিঙে বিক্রি করা যায়, সব মিলিয়ে হাতে আসবে তিন হাজার তিনশো শিলিং। কেনা এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বাদ দেওয়া যাক এক হাজার শিলিং, তারমানে লাভ থাকবে দু'হাজার তিনশো শিলিং। অর্থাৎ নিলামের সময় প্রতিটির জন্য দুশো শিলিঙের বেশি ডাক দেওয়া যাবে না। আফ্রিকান ছোকরাকে প্রতিশ্রুত শিলিং ছুঁড়ে দিয়ে আপনমনে হাসতে লাগল রানা। কেউ যখন স্বদেশ থেকে বহুদূর যোগাযোগবিহীন অনির্দিষ্টকাল আত্মগোপন করে থাকে, দু'হাজার তিনশো তাঞ্জানিয়ান শিলিং তার কাছে অস্তিত্ব রক্ষার বিরাট অবলম্বন তো বটেই।

ট্রাউজার থেকে পকেট-ঘড়িটা বের করে চোখ বুলাল রানা। নিলাম শুরু হতে এখনও দু'ঘণ্টা দেরি আছে। বেন্টলিগুলোর উপর কাজ শুরু করবার জন্য অস্থির হয়ে আছে ও। লাভটা বড় কথা নয়, এঞ্জিন নিয়ে কাজ করতে ভাল লাগে ওর, তা ছাড়া সময়টাও সুন্দর কাটত। দেখেশুনে মনে হলো মাঝখানে দাঁড়ানো গাড়িটার উপর হাত দিলে খুব তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যাবে। মাডগার্ডের আর্মারড উইং-এ ক্যানভাস ব্যাগটা রেখে একটা ৩/৮ ইঞ্চি স্প্যানার বেছে নিল। পরমুহূর্তে কাজের ভিতর বুঁদ হয়ে গেল ও।

আধ ঘণ্টা পর এঞ্জিনের ভিতর থেকে মাথা বের করল রানা, ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে গাড়ির সামনে ছুটে এল।

ফুলে উঠল ডান হাতের পেশী, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে। প্রথমবারের চেষ্টায় ভারি এঞ্জিন যান্ত্রিক শব্দছন্দ তুলল, কিন্তু পরমুহূর্তে থেমে গেল, স্টার্ট নিল না। মিনিটখানেক পর হাতল খুলে নিল রানা, ন্যাকড়া দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তেল আর কালির দাগ অবশ্য আগেই ভৌতিক করে তুলেছে চেহারাটা।

‘দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি রগচটা,’ ফিসফিস করে বলল ও। ‘কিন্তু ডার্লিং, আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।’

আবার ওর কাঁধ আর মাথা এঞ্জিন কাউলিঙের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল, ভিতর থেকে শক্ত ধাতুর সঙ্গে স্প্যানারের ঠোকাঠুকি আর শিসের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। দশ মিনিট পর আবার ক্র্যাঙ্ক হাতল ঘোরাল ও। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল এঞ্জিন, ব্যাক-ফায়ারের আওয়াজ হলো কামান দাগার মত, হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল—ওটা উল্টো করা মুঠোর ভিতর ধরা থাকলে বুড়ো আঙুলটা ছিঁড়ে নিয়ে যেত।

‘শালীর দেমাক কী!’ হতভম্ব রানা টারিটে উঠে কন্ট্রোলের দিকে ঝুঁকল, রিসেট করল ইগনিশন।

পরের বার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে সচল হলো এঞ্জিন, নিস্তেজ হতে শুরু করে আবার সতেজ হলো, তারপর নিয়মিত শব্দছন্দ বজায় রাখল। আড়ষ্ট সাসপেনশনের উপর কাঠামোটা মৃদু কাঁপছে, তবে জ্যান্ত থাকল এঞ্জিন।

পিছিয়ে এল রানা, দরদর করে ঘামছে, চেহারায় লালচে একটা আভা, তবে আনন্দে চকচক করছে চোখ জোড়া।

‘পরস্পরকে আমরা চিনেছি, তাই না?’

‘ব্রাভো! ব্রাভো!’ পিছন থেকে, দরাজ কণ্ঠস্বর। প্রায় চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘাড় ফেরাল রানা। ভুলেই গিয়েছিল দুনিয়ায় সে-ই একমাত্র প্রাণী নয়। অপ্রতিভ বোধ করল ও, যেন একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপন শারীরিক একটা বৈশিষ্ট্য আড়াল থেকে দেখে ফেলেছে কেউ। লোকটার দিকে কটমট করে তাকাল ও, পোজ দেওয়ার মার্জিত ভঙ্গিতে আমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে।

‘দারুণ একটা কৃতিত্ব চাক্ষুষ করলাম, মাইরি বলছি!’ মিটিমিটি

হাসছে আগন্তুক, তার কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার কানে ঢুকতেই রানার ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেল চুল। উচ্চারণ এবং বাচনভঙ্গি ইংলিশ, সবজান্তা ট্যুরিস্টদের একজন বলে মনে হলো। রানার জানা আছে, পরের ব্যাপারে নাক গলাতে ওদের জুড়ি মেলা ভার। কে জানে লোকটা কে বা কেমন! পালিয়ে তাঞ্জানিয়ায় চলে এসেছে ও, আবার না তাঞ্জানিয়া ছেড়ে পালাতে হয়।

পরে আছে মাখন রঙা দামী ট্রপিক্যাল লিনেন-এর সুট, পায়ে সাদা আর খয়েরী জুতো। সাদা স্ট্র হ্যাটের চওড়া কার্নিস ছায়া ফেলেছে মুখে। তবে চেহারায় লেপ্টে থাকা হাসিখুশি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূচক ভাব রানার চোখ এড়াল না। প্রচলিত অর্থে সুদর্শন বলা চলে, যদিও সহজ-সরল হাবভাবের মধ্যে সকৌতুক শয়তানীর একটা ভঙ্গি উঁকি-ঝুঁকি মারছে বলে সন্দেহ হলো রানার। চেহারায় অভিজাত একটা ভাবও আছে, তবে তার কতটুকু বানোয়াট বা অর্জিত আর কতটুকু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, বলা কঠিন। তবে সন্দেহ নেই সুন্দরীদের আবেগ উথলে উঠবার একটা কারণ সৃষ্টি করবে এই মুখ, তাতে গতি সঞ্চার করবে দরাজ কণ্ঠস্বর। বহুজাতিক কোন কোম্পানীর সেলস এজেন্ট? উঁহু, সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল রানা। কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল ওর। লোকটা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাত ও পা স্থির, তবু গোটা ভঙ্গিটার মধ্যে কী যেন একটা আছে যা ধরা দেই দেই করেও দিচ্ছে না।

‘ওটাকে জ্যান্ত করতে মোটেও বেশি সময় নাওনি তুমি।’ গাছে হেলান দিয়েই থাকল, তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বদলে গেল। জোড়া পা নীচের দিকে ক্রস চিহ্নের আকৃতি পেল, একটা হাত কোট পকেটের ভিতর। আবার হাসল সে, এবার তার হাসিতে ব্যঙ্গ আর

চ্যালেঞ্জ পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। লোকটাকে চিনতে ভুল করেছে ও। না, সাধারণ কোন লোক নয়। ভালমানুষ তো নয়ই। ওই চোখ জোড়া একজন সর্বস্বহরণকারী লুটেরার, ব্যঙ্গাত্মক এবং নেকড়েসুলভ, ছায়ার ভিতর ছুরির ধারাল ফলার মত বিপজ্জনক।

'বাকিগুলোও যে সহজে মেরামতযোগ্য তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই,' অনুসন্ধানী সুর, স্রেফ মন্তব্য নয়।

'ভুল করছ, বন্ধু।' সব হারানোর একটা আশংকা রীতিমত ব্যথা হয়ে জাগল রানার বুকে। চেহারা সুরৎ দেখে মনে হয় না সৌখিন ইংরেজ পাঁচটা আর্মারড কার কিনতে চাইবে, আবার বলাও যায় না–হাজার হোক বেনিয়ার জাত। সাবধানের মার নেই, গাড়িগুলোর অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাইয়ে দিলে মন্দ হয় না। 'শুধু এই একটাই কোন রকমে চলবে, এটারও নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শব্দ শুনে বুঝছ না, উন্মাদ কাঠমিস্ত্রী যেন যেখানে-সেখানে পেরেক ঠুকছে।' কাউলিঙের ভিতর হাত গলিয়ে ম্যাগনিটো অফ করল ও।

হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে যাওয়ায় নিস্তব্ধতা নেমে এল। গলার স্বরে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে আবার বলল রানা, 'বাতিল লোহা!' সামনের চাকার কাছে মাটিতে থুথু ফেলল ও, কিন্তু চাকায় নয়। চেষ্টা করেও অতটা নির্দয় হতে পারল না ও। তারপর যন্ত্রপাতি কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরল, এক কাঁধে ব্যাগ অপর কাঁধে জ্যাকেট ঝুলিয়ে রওনা হলো গেট অভিমুখে, লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না।

'তুমি তা হলে নিলামে অংশগ্রহণ করছ না, ওল্ড চ্যাপ?' আগন্তুক গাছতলা ছেড়ে রানার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

'আরে না!' গলার সুরে বিপুল হতাশা ফোটাতে চেষ্টা করল রানা। 'তুমি?'

‘ধ্যেৎ, ভাঙাচোরা পাঁচটা আর্মারড কার নিয়ে আমি কী করব!’ নিঃশব্দে হাসল লোকটা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। ‘বাঙালী, তাই না? ভারতীয়?’

দাঁড়িয়ে পড়তে গিয়েও দাঁড়াল না রানা। উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ও, ‘কেন মনে হলো?’

‘কোলকাতায় ছিলাম কিছুদিন,’ আড়ষ্ট উচ্চারণে বাংলায় বলল আগন্তুক। ‘এঞ্জিনিয়ার?’

‘তুমি আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছ,’ কঠিন সুরে বলল রানা। হোটেলের খাতায় লেখা তথ্যগুলোই উচ্চারণ করেছে লোকটা। ভারতীয়, কার মেকানিক। লোকটা এঞ্জিনিয়ার বলেছে ব্যঙ্গ করে। তবে কোলকাতায় বোধহয় সত্যি ছিল, চেহারা দেখে ধরে নিয়েছে বাঙালী।

‘চলো কিছু পান করা যাক, কী?’ ভুরু নাচিয়ে প্রস্তাব করল লোকটা, রানার মনে হলো ঘুষ দিতে চাইছে।

‘কত খরচ করতে চাও হিসেব করে টাকাটাই বরং দাও,’ বলল ও। ‘আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।’

সৌখিন আগন্তুক আবার হেসে উঠল, বন্ধুত্বসূচক সকৌতুক শব্দঝংকার। ‘তা হলে শুভেচ্ছা জানাই, ওল্ড চ্যাপ,’ বলল সে, তাকে পিছনে ফেলে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল রানা তাপদগ্ধ দার-এস-সালামের খোলা রাস্তায়, পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে হাঁটতে লাগল হন হন করে। দৃঢ় পদক্ষেপ, কাঁধ জোড়ার আড়ষ্ট ভাব পরিষ্কার জানিয়ে দিল এখানেই বিদায়পর্ব চূড়ান্ত, পিছু নিয়ে কোন ফায়দা হবে না।

প্রথম বাঁকেই খুদে একটা রেস্তোরাঁ পেয়ে গেল রানা, সরকারী

গুদামের উঠন থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, লুকিয়ে থাকবার জন্য পছন্দ হলো ওর। একটা নোটিস দেখে ভাল লাগল, শুধু বিদেশীদের বিয়ার বা মদ পরিবেশন করা হয়। বরফ আর বিয়ার নিয়ে বসল রানা, চিন্তায় পড়ে গেছে। ব্যাটা ইংরেজ ওকে ভারি অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি দান করেছে, গাড়িগুলো সম্পর্কে তার আগ্রহ স্রেফ নির্মল কৌতূহল বলে মনে হয়নি। নিলামে যদি জাত বেনিয়া কেউ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ওকে হয়তো প্রতিটি গাড়ির জন্য দুশো শিলিঙের বেশি প্রস্তাব দিতে হতে পারে। জ্যাকেটের ভিতরের পকেট থেকে ছাগ চর্মের তৈরি মানিব্যাগটা বের করল রানা, ওর সমস্ত জাগতিক সম্পদের এটাই বর্তমানে একমাত্র ভাণ্ডার–অন্তত যতদিন না বি.সি.আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে পরিচিত দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ হয়। কোলের উপর সব টাকা বের করে গুণল ও। তাঞ্জানিয়া শিলিং রয়েছে হাজার পাঁচেক। কিছু ডলার আর ব্রিটিশ পাউন্ডও আছে, ভাঙানো কঠিন কিছু নয়, তবে সব মিলিয়ে অংকটা এত বড় নয় যে রানী এলিজাবেথের সৌখিন ধান্দাবাজ প্রজার সঙ্গে টক্কর দেওয়া যায়। বিয়ার শেষ করল রানা, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল, শক্ত করল চোয়াল, আরেকবার চোখ বুলাল পকেট-ঘড়ির উপর। বারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট।

দীর্ঘদেহী মাসুদ রানাকে ভিজে বেড়ালের মত গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেখে সামান্য হতাশ হলো মেজর মাইকেল সেভারস্, কিন্তু মোটেও বিস্মিত হলো না। পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন একটা টি-পার্টিতে শুধু বয়োবৃদ্ধারা রয়েছে, কাঁটাচামচ চুরি করবার জন্য চুপিসারে ঢুকে পড়েছে একজন লোক–রানার হাঁটা আর হাবভাব দেখে এরকম একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে

গেল তার।

আমগাছ তলায় উল্টো করা একটা ড্রামের উপর বসে রয়েছে মাইকেল সেভারস্, ড্রামের উপর একটা রুমাল বিছিয়ে নিয়েছে দামী সুটে যাতে কোন ময়লা না লাগে। স্ট্র হ্যাটটা তার হাতে রয়েছে, মাথার চুল সুন্দর করে ছাঁটা এবং নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো। চুলের এই রঙ সহজে চোখে পড়ে না, সোনালি লালচে, কোমল জ্বলজ্বলে একটা ভাব নিয়ে শোভা পাচ্ছে মাথায়। গোঁফ জোড়াও একই রঙের, চওড়া এবং খাটো করে ছাঁটা। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, ম্লান নীল রঙের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। উঠন পেরিয়ে জোড়া আমগাছের দিকে এগোচ্ছে রানা, ক্রেতারা সবাই ভিড় করেছে সেখানে। সরাসরি না তাকিয়েও টের পেয়ে গেছে ও, কেউ একজন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে ওকে। কে হতে পারে লোকটা আন্দাজ করে নিয়েছে। পরিবর্তনটুকু সূক্ষ্ম হলেও, মাইকেল সেভারসের দৃষ্টি এড়াল না। শক্ত হয়ে উঠল রানার কাঁধের পেশী, দৃঢ় হলো হাঁটবার ভঙ্গি, উঁচু করা মাথা আর ফুলে থাকা বুক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চোখ ফিরিয়ে নিল মাইকেল সেভারস্, পকেট থেকে এনভেলাপ বের করে নিজের আর্থিক সঙ্গতির হিসাব পাবার চেষ্টা করল।

তার আর্থিক অবস্থা রানার চেয়ে কোন অংশে সুবিধের নয়, গত পাঁচটা মাস ভাগ্য তাকে কোন রকম সহায়তা করেনি। অসুস্থতার মিথ্যে অজুহাতে ব্রিটিশ আর্মি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মেজর মাইকেল সেভারস্ অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্য আর আফ্রিকা চষে বেড়াচ্ছে। অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে ব্যবসাকে জোড়া লাগানোয় ভারি ওস্তাদ সে। 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই,' এই নীতি কখনোই তার দ্বারা লঙ্ঘিত

হয়নি। কিন্তু তার কপাল মন্দ, শিয়া মিলিশিয়াদের কাছে বিক্রি করা অস্ত্রের চালান বৈরুত বন্দরে পৌঁছুনোর মাত্র দু'ঘণ্টা আগে খ্রীস্টান ফালাঞ্জিস্টদের স্যাবোটাজের শিকার হয়ে ভূমধ্যসাগরে তলিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে তার পাঁচ বছরের কষ্টকর সাধনালব্ধ মূলধন। তবে হাল ছেড়ে দেয়নি সে, আবার প্রথম থেকে শুরু করবার জন্য যথেষ্ট খাটাখাটনি করছে। ব্যবসায়িক বুদ্ধি, কূটকৌশল, মোক্ষম জায়গায় উপঢৌকন বিতরণ ইত্যাদির সাহায্যে অস্ত্রের আরেকটা চালান ডেলিভারি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে সে, অস্ত্রগুলো এই মুহূর্তে দার-এস-সালাম বন্দরের চার নম্বর ওয়্যার হাউসে রয়েছে, তার বের করে নিয়ে আসবার অপেক্ষায়। ক্রেতাও ঠিক করা আছে, বারো দিনের মধ্যে ডেলিভারি নিতে আসবে সে। চালানটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা চেহারা পেতে পারে যদি অস্ত্রের সঙ্গে আর্মারড কারগুলোও থাকে।

আর্মারড কার? হ্যাঁ, চেষ্টা করলে কোন রকমে গছিয়ে দেওয়া সম্ভব। যদিও তার ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জানা যায় পাইলট সহ এয়ারক্রাফট পেলে সবচেয়ে খুশি হবে সে।

আজ সকালে প্রথম যখন ওগুলো দেখল মাইকেল, সঙ্গে সঙ্গে কিনবার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছিল। অত্যন্ত পুরানো, অবহেলার সঙ্গে রাখা হয়েছে, চেহারাই বলে দেয় মেরামতের যোগ্য নয়। ফিরে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ দেখতে পেল একটা আর্মারড কারের তলায় পেশীবহুল একজোড়া পা। তারপর তার কানে ঢুকল, গাড়ির তলা থেকে শিসের আওয়াজ আসছে।

এখন সে জানে অন্তত একটা গাড়ি মেরামত করে চালানো যাবে। কীভাবে কী করতে হবে সব ঠিক করে ফেলেছে সে। কয়েক গ্যালন রঙ দরকার হবে। প্রতিটি আর্মারড কারের

মাউন্টিঙে একটা করে ভিকার্স মেশিনগান থাকবে। দেখে কী মনে হবে? মনে হবে সদ্য তৈরি ঝকঝকে পাঁচটা আর্মারড কার কারখানা থেকে এইমাত্র বের করা হয়েছে। ক্রেতাকে কীভাবে মোহিত করবে মাইকেল সেভারস্? কেন, তার প্রসিদ্ধ বিক্রয় কৌশল রয়েছে না! একটা, মাত্র একটা আর্মারড কার স্টার্ট দেবে সে, এলোপাতাড়ি পাঁচশো গুলি ছুঁড়ে মেশিনগানের কেরামতি প্রদর্শন করবে—ব্যস, গলে ছাতু হয়ে যাবে রাস্টাফারিয়ান গোত্রের রাজপুত্তুর, উল্লাসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সবগুলো আর্মারড কার আর মেশিনগানের দাম চুকিয়ে দেবে।

তার রঙিন স্বপ্নে কালি ছিটাচ্ছে শুধু একজন। বাঙালী যুবকটাই তার উদ্বেগের কারণ। হয়তো ভয় পাবার কিছু নেই, দু'দশ শিলিং বেশি দর হাঁকলেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, পাল্লা দিতে না পেরে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে লোকটা। না, আসলেও ভয় পাবার কোন কারণ নেই। হাবভাব, চেহারা-সুরৎ দেখে তো মনে হলো কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে, ঝুঁকি নেওয়ার বা বাজে খরচ করবার পয়সা পকেটে নেই। দেখা যাক।

কোটের আস্তিনে আঙুলের টোকা দিল মাইকেল, হয়তো ধুলোর খানিকটা ভাব জমেছিল ওখানে। সোনালি লালচে মাথায় পানামাটা তুলল, সতর্কতার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করল চওড়া কার্নিস, ছাই পরীক্ষা করবার জন্য লম্বা সরু চুরুটটা নামাল ঠোঁট থেকে, তারপর ড্রাম ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, ধীর শান্ত পায়ে এগোল ভিড় লক্ষ্য করে।

নিলামদার একজন শিখ বামন, কালো সুট পরা, লম্বা দাড়ি বাঁক নিয়ে গলায় মাফলারের মত জড়িয়ে আছে, মাথায় মস্ত একটা সাদা পাগড়ি।

সবচেয়ে কাছের আর্মারড কারের টারিটে উঠে পড়েছে সে, দাঁড়ে বসা কালো কাকের মত লাগছে তাকে। তার কণ্ঠস্বর সকরুণ বিলাপের মত, শোকাকুল। প্রস্তাব পাবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে সে। উপস্থিত লোকজন ভাবলেশহীন পাথুরে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, চোখে শাণিত দৃষ্টি।

'আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ, কেউ একজন এক হাজার শিলিং বলে চিৎকার করে উঠে আমার কানে মধুবর্ষণ করুন! আমি কি "প্রতিটি হাজার শিলিং" শুনলাম?'

মাথা একদিকে কাত করে ভাল করে শুনবার ভঙ্গি করল সে, গাছের ডালে বাতাসের শব্দ ছাড়া কোথাও কোন আওয়াজ নেই। কেউ নড়ল না, কেউ মুখ খুলল না।

'পাঁচশো শিলিং, প্লিজ? বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সুচতুর কোন ব্যবসায়ী আছেন কি যিনি এই চমৎকার বাহনগুলোর প্রতিটির জন্য পাঁচশো শিলিং দিতে চান? ওগুলো আর্মারড কার, মহোদয়গণ! নামটাই যে শুধু গালভরা তাই নয়, কাজেও এক একটা অক্লান্ত ঘোড়া! যেমন তেজি তেমনি সুন্দর, যেমন রূপ তেমনি তার গুণ! ঠিক আছে, ভাইসব, মাত্র আড়াইশো শিলিং—আসুন, জমজমাট দর হাঁকাহাঁকির প্রতিযোগিতা আড়াইশো শিলিং দিয়েই শুরু করি আমরা।' চোখে নগ্ন প্রত্যাশা নিয়ে ভিড়ের উপর চোখ বুলাল বামন শিখ, কেউ নড়ছে না দেখে কোঁচকানো ভুরু থেকে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কল্পিত ঘাম মুছল সে। 'প্রস্তাব, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে একটা প্রস্তাব দিন, প্লিজ!' চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে।

'পঞ্চাশ শিলিং!' ভিড় থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। শিখ নিলামদার এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল, তারপর ধীর নাটকীয় মন্থরতার সঙ্গে মাথা তুলে রানার দিকে তাকাল সে। ভিড়ের মধ্যে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে রানার মাথা।

'পঞ্চাশ শিলিং!' খসখসে, কাঁদো কাঁদো গলায় ফিসফিস করে বলল শিখ নিলামদার। 'এত সুন্দর, এমন তেজি আর্মারড কারের জন্যে মাত্র পঞ্চাশ শিলিং...,' কথা শেষ না করে দুঃখ এবং হতাশার সঙ্গে ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে। তারপর অকস্মাৎ তার আচরণ বদলে গেল, চোখের পলকে ব্যবসায়ীসুলভ চটপটে ভাব ফুটল চেহারায়। 'আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে প্রতিটি পঞ্চাশ শিলিং। আমি কি একশো শিলিং শুনলাম? পঞ্চাশ শিলিঙের ওপর কেউ প্রস্তাব দিচ্ছেন না?' হাতে ধরা হাতুড়িটা শূন্যে তুলল সে। 'প্রথমবার বলছি, পঞ্চাশ শিলিং। দ্বিতীয়বার বলছি...'

সামনে বাড়ল মাইকেল সেভারস্, জাদুমন্ত্রের মত ফাঁক হয়ে গেল ভিড়টা, লোকজন দু'পাশে সরে গেল সসম্মানে।

'একশো শিলিং,' মৃদুকণ্ঠে বলল সে, নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল কথাটা। দীর্ঘদেহী রানার আপাদমস্তক আড়ষ্ট হয়ে উঠল, লালচে আভা ফুটল নগ্ন ঘাড়ে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পাশে তাকাল সে, ইতিমধ্যে ভিড়ের কিনারায় পৌঁছে গেছে ইংরেজ যুবক।

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মাইকেলের চেহারা, রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে অভিজাত ভঙ্গিতে সে তার পানামা হ্যাটের কার্নিস দু'আঙুলে আলগোছে একবার স্পর্শ করল। শিখ নিলামদারের পাকা ব্যবসা বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে গেছে ওদের দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব রয়েছে। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে উঠল তার হাসি।

'আমি শুনলাম একশো...।' নিরীহ ভঙ্গিতে শুরু করল সে।

'দেড়শো,' ধমকের সুরে বলল রানা।

'দুশো,' বিড়বিড় করে উঠল মাইকেল, রানা অনুভব করল

ক্রোধের অদম্য একটা ঢেউ ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। অনুভূতিটার সঙ্গে পরিচয় আছে, চেষ্টা করল দমন করতে, কিন্তু কোন লাভ হলো না। উপস্থিত লোকজন লম্বা লোকটার দিকেই তাকিয়ে আছে, সবাই উত্তেজিত। উপভোগ্য নিলাম দেখবার লোভেই ভিড় জমিয়েছে তারা।

'আড়াইশো,' বলল রানা, পরমুহূর্তে প্রতিটি মাথা ঘুরে গেল ইংরেজ লোকটার দিকে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে ফিরল মাইকেল। 'তিনশো?'

'সাড়ে তিনশো।' রানার চোখে পলক পড়ল না।

'চারশো?'

'পাঁচশো।'

'সাড়ে পাঁচশো।'

'ছ'শো।' নির্লিপ্ত রানা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি সাড়ে ছ'শো।'

'আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সাড়ে ছ'শো...,' নিলামদারের গলা কেঁপে গেল।

'সাতশো।' বাইরে থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই রাগ দমন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু মনে মনে জানে বেনিয়া লোকটাকে গাড়িগুলো কোনভাবেই নিতে দেবে না ও। শেষ পর্যন্ত যদি কিনতে না-ই পারে, ওগুলো পুড়িয়ে দেবে সে।

কুতকুতে চোখে মাইকেলের দিকে তাকাল নিলামদার। 'সাড়ে সাতশো, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সে, উত্তরে মৃদু হাসির সঙ্গে হাতের চুরুটটা শুধু দোলাল মাইকেল। মনে মনে বিস্ময়ের সীমা নেই, তার হিসাব অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক আগেই আর্থিক সঙ্গতির সীমা পেরিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে হিসাবে ভুল হয়েছে

তার।

'আট,' বলল রানা, মনে মনে নিজের সঙ্গে কথা বলছে—ওগুলো আমার, মানিব্যাগ খালি করে হলেও কিনব আমি।

'নয়শো।' মাইকেল সেভারসের হাসিতে আড়ষ্ট ভাব, সে-ও এবার তার নিজের আর্থিক সঙ্গতির কিনারায় পৌঁছে যাচ্ছে। নিলামে জিতলে সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা অথবা স্থানীয় অনুমোদিত ব্যাংকের চেক জমা দিতে হবে। নগদ টাকা যেখানে যা পাওয়ার ছিল অনেক আগেই সব চেঁছে তুলে এনেছে সে। আর স্থানীয় কোন ব্যাংকের ম্যানেজার যদি মাইকেল সেভারসের চেক পেয়ে টাকা দেয় তা হলে চাকরি থাকবে না।

'সাড়ে নয়শো।' রানার কণ্ঠস্বর কঠিন, আপোষহীন। যদিও তিরস্কার করছে নিজেকে, লাভের মধ্যে ইংরেজ ব্যাটাকে এক হাত দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা-ও শেষ পর্যন্ত কে জিতবে বলা যায় না।

'সাড়ে...,' মাইকেল সেভারস্ শেষ করতে পারল না।

তার আগেই রানা বলল, 'পুরো এক হাজার।'

'এগারোশো?'

'বারো,' দম না নিয়ে বলল রানা। ক্ষীণ আশা রয়েছে, ওর ক্রেতাকে হয়তো বুঝিয়ে একেকটা বারোশো শিলিঙে বিক্রি করা যাবে।

মাইকেল বলল, 'সাড়ে বারোশো।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। বারোশো শিলিঙের বেশি দাম পড়লে নির্ঘাত লোকসান দিতে হবে ওকে।

'আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিলামদার, 'বারোশো পঞ্চাশ শিলিং...।' হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

‘তেরো।’

‘তেরো পঞ্চাশ।’

মনে মনে হিসাব রাখছে রানা, দুশো শিলিং করে লোকসান হবে। ‘চোদ্দ।’

‘পনেরো,’ এবং এটাই মাইকেল সেভারসের শেষ সীমা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, বুঝতে পেরেছে গাড়িগুলো তার কপালে এভাবে জুটবে না। সাড়ে সাত হাজার শিলিংই তার পকেটের সম্বল, জবাই করে ফেললেও তার বেশি বের করতে পারবে না। অবশ্য আরও হাজারটা উপায় আছে, তার যে-কোন একটার সাহায্যে গাড়িগুলোর মালিক হতে পারবে সে। হতে পারবে, এবং হবেও। প্রিন্স হাসান সালে হারারি-কে পটিয়ে বেশি দাম আদায় করতে হবে, এই যা।

‘সাড়ে পনেরোশো,’ বলল রানা, ভিড়ের ভিতর থেকে চাপা গুঞ্জন উঠল, প্রতিটি মাথা ঘুরে গেল মাইকেল সেভারসের দিকে।

‘সম্মানিত মহাশয়,’ নিলামদার সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি ষোলোশো বলেছেন, স্যার?’ পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পাবে সে।

সগর্বে, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মাথা নাড়ল মাইকেল সেভারস্, গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে তার চুরুটের ছাই পরীক্ষা করছে। তারপর মুখ তুলল সে, ঠোঁটে এক টুকরো কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘না, ভুলে যান, আমি কিছুই বলিনি।’ রানার দিকে তাকাল সে। ‘ওগুলো তোমাকে আনন্দ দান করুক, এই কামনা করি। মনে কোন দুঃখ রেখো না, ওল্ড চ্যাপ।’ ভিড় ঠেলে ঘুরে দাঁড়াল সে, গেটের দিকে হাঁটা ধরল। এখুনি কোন প্রস্তাব দিয়ে লাভ নেই, বাঙালী বাবু ভাল একটা প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে বসতে পারে। তবে একটা বিষয় নিয়ে ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে। এত দিন নিজের উপর অগাধ আস্থা ছিল তার, লোক চিনতে কখনও ভুল

করে না। বাঙালী লোকটাকে দেখে তার মনে হয়েছিল, লোকটা ভাবাবেগ দমন করতে জানে। কিন্তু প্রমাণিত হলো ঠিক উল্টোটা। এত দাম দিয়ে গাড়িগুলো সে কিনল শুধু রাগের বশে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনতে ভুল করেছে সে?

বহু কাল আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে পৌঁচেছে মেজর মাইকেল সেভারস্, যুদ্ধ করে শুধু বোকারা, জ্ঞানী লোকেরা তাদেরকে যুদ্ধের উপকরণ যোগান দেয়–লাভের বিনিময়ে, অবশ্যই।

দুই

ঠিক তিন দিন পর আবার ইংরেজ লোকটার সঙ্গে দেখা হলো রানার। ইতিমধ্যে সে তার পাঁচটা লৌহমানবীকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে এনেছে ছোট্ট ঝর্ণার কিনারায় নিজের সদ্য তৈরি ক্যাম্পে। জায়গাটা শহরের বাইরে, পাহাড়ের কাছাকাছি, চারপাশে আফ্রিকান মেহগনি গাছের ছড়াছড়ি, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা শিস দেয় পাখিরা।

মেহগনির ডালে কপিকল ঝুলিয়ে এঞ্জিনগুলো বের করে নিয়েছে রানা, পেট্রল ল্যাম্পের আলোয় গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেছে ওগুলোর উপর। পুরো একটা দিন কেটেছে বাতিলযোগ্য পার্টস সনাক্ত করতে। পুরানো লোহা-লক্কড়ের দোকানে গিয়ে তালিকা মিলিয়ে খুঁজতে হয়েছে সেগুলো। দিনে আঠারো ঘণ্টা খেটেছে ও, দিনের বেলা ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাখিরা শিস দেওয়ায় পরিশ্রমটুকু গায়ে লাগেনি। তৃতীয় দিন বিকেলের দিকে

ঘর্মাক্ত কলেবর মাসুদ রানা তিনটে বেন্টলি এঞ্জিন চালু করতে পারল। খুঁটির উপর তৈরি বাঁশের নিচু মাচায় এঞ্জিনগুলোকে একেবারে নতুন বলে মনে না হলেও, ঝকঝক করছে। সন্দেহ নেই মেকানিকের হাতের ছোঁয়ায় জাদু আছে।

সেদিনই বিকেলে, চারদিক যখন নির্মম রোদে পুড়ছে, রানার ক্যাম্পে হাজির হলো মাইকেল সেভারস। রিকশায় চেপে এল সে, সেটা টেনে নিয়ে এল অর্ধনগ্ন ঘর্মাক্ত একজন কালো আফ্রিকান। গদি লাগানো সিটের উপর বিশ্রামরত চিতার মত লাগল তাকে, পরে আছে দুধ-সাদা লিনেনের সুট, ভাঁজগুলো তীক্ষ্ণ। একটা এঞ্জিন চালু করে আওয়াজে কোন ত্রুটি আছে কি না পরীক্ষা করছিল রানা, কোমর পর্যন্ত উদোম, গ্রিজ লেগে কালো হয়ে আছে হাত দুটো, বুক আর পিঠে ঘাম চকচক করছে, যেন তেল মেখেছে সারা গায়ে।

'এমনকী দাঁড়িয়ো-ও না, বন্ধু,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'সোজা হেঁটে চোখের সামনে থেকে দূর হও।'

নিঃশব্দে হাসল মাইকেল, যেন পুরানো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রসিকতা গায়ে মাখছে না। সিটের এক পাশ থেকে সিলভারের একটা বালতি উঁচু করে রানাকে দেখল সে, গায়ে শিশিরের মত পানি জমে আছে, ভিতরে টুকরো বরফ পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ করছে। বালতির কিনারা থেকে উঁকি দিচ্ছে এক ডজন বিয়ারের বোতল।

'যুদ্ধ নয়, শান্তির প্রস্তাব, ওল্ড চ্যাপ,' বলল মাইকেল, 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অঙ্গীকার।' তৃষ্ণার্ত রানার গলার ভিতরটা হঠাৎ করে এমন শুকিয়ে গেল যে এক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারল না ও।

'শর্তহীন উপহার—ঘুষ বা টোপ নয়?' এই প্রচণ্ড গরমের

ভিতরও কাজের মধ্যে এমনই মগ্ন হয়ে ছিল রানা যে যতটুকু প্রয়োজন তার সিকিভাগ তরলপদার্থও গলাধঃকরণ করেনি, যা-ও বা করেছে তার মধ্যে এ-ধরনের ম্লান সোনালি, বুদ্‌বুদ্‌ ওঠা, বরফ মেশানো কিছু ছিল না। বিয়ারের বোতলগুলো দেখে শুধু যে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার অবস্থা হলো তাই নয়, ওগুলো পাবার প্রচণ্ড ইচ্ছায় কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি।

রিকশা থেকে নামল মাইকেল, বগলের তলায় বালতি নিয়ে এগিয়ে এল। 'মাইকেল,' বলল সে। 'মেজর মাইকেল সেভারস।' খালি ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'রানা, মাসুদ।' তাই তো বলি! ভাবল রানা। হাতটা ধরল ও, তবে চোখ এখনও আটকে আছে বালতির উপর।

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে গিয়ে বিজয়রত্ন নামে এক সিংহলী বক ভারতীয় র., মার্কিন সি.আই.এ. এবং রাশিয়ান কে.জি.বি-র আক্রোশে পড়ে। বিজয়রত্ন যে মাসুদ রানা এ-কথা বি.সি.আই. চীফ রাহাত খান ছাড়া আর কেউ জানত না। গোপনসূত্রে তিনি খবর পান, তিনটে দানবাকৃতি সংস্থার একটি বিজয়রত্নকে মাটির বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেছে। সময় থাকতে রানাকে তিনি আত্মগোপন করবার নির্দেশ দেন। বসের নির্দেশ মেনে নিলেও, নিজের নামটা গোপন করবার কোন কারণ দেখেনি রানা, হোটেলের খাতায় তাই আসল নামটাই লিখিয়েছে।

বিশ মিনিট পর। ঝর্ণার পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে রানার, বগলের তলায় সাবান ঘষছে, বিয়ারের বোতল নাগালের মধ্যে।

'বিপদটা দেখা দেয়, কারণ পরস্পরকে আমরা চিনতে ভুল করেছিলাম,' ব্যাখ্যা করল মাইকেল, বোতল থেকে সরাসরি বিয়ার

ঢালল গলায়। তাঁবুর বাইরে, শেড ফ্ল্যাপের নীচে ছায়ায় ফেলা রানার একমাত্র ক্যানভাস ক্যাম্প চেয়ারটায় প্রায় শুয়ে আছে সে। 'স্বীকার করছি, কোথায় পা ফেলছি দেখিনি।'

'লাথিটা প্রায় নিজের বুকেই খেয়েছ,' একমত হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা, তবে গলায় ঝাঁঝ নেই, ঠাণ্ডা বিয়ার মেজাজের উপর ওষুধের কাজ করছে।

'তোমার কেমন লেগেছিল বুঝতে পারি,' বলল মাইকেল। 'কিন্তু ভেবে দেখো, বলেছিলে নিলামে তুমি থাকবে না। যদি সত্যি কথা বলতে, আমরা হয়তো একটা চুক্তিতে আসতে পারতাম।'

সাবানের ফেনা ঢাকা হাত বাড়িয়ে বিয়ারের একটা বোতল তুলে নিল রানা। ঢক ঢক করে দু'ঢোক গিলল। একজোড়া ঢেকুর তুলল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল।

'ব্লেস ইউ!' ঢেকুর তোলা অমঙ্গলসূচক ধরে নিয়ে সম্ভাব্য অঘটন বা উৎপাত থেকে রানাকে রক্ষার জন্য আশীর্বাদ করল মাইকেল। 'যখনই বুঝতে পারলাম তুমি সিরিয়াসলি ডাক দিচ্ছ, পিছিয়ে গেলাম আমি। জানতাম, দু'জনের জন্যে লাভজনক একটা সমঝোতায় পরে আমরা ঠিকই আসতে পারব। আর দেখো, বান্দা হাজির, তোমার সাথে বসে বিয়ার খাচ্ছি, একটা চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা চলছে।'

'কথা বলছ একা তুমি, আমি শুধু শুনছি,' বলল রানা।

'ঠিক তাই।' চুরুট কেস বের করল মাইকেল, সাবধানে বেছে নিল একটা, সামনের দিকে ঝুঁকে কায়দা করে গুঁজে দিল রানার দুই ঠোঁটের মাঝখানে। বুটের সোলে ঘষা দিয়ে দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালল, জোড়া করপুটের ভিতর নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল আগুনটা। 'আমার ধারণা তোমার সন্ধানে ভাল একজন ক্রেতা আছে, কী?' ভুরু জোড়া একবার নাচাল সে।

‘এখনও আমি শুনছি,’ আয়েশ করে চুরুটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা।

‘তুমি নিশ্চয়ই গাড়িগুলোর একটা দাম ঠিক করেছ। তারচেয়েও বেশি দাম দিতে আমি ইতস্তত করব না।’

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে এই প্রথমবার স্থিরদৃষ্টিতে মাইকেলকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে, আমার নির্ধারিত দামে, গাড়ি পাঁচটা কিনতে চাও তুমি?’

‘চাই,’ বলল মাইকেল।

‘যদি বলি শুধুমাত্র তিনটে চালানো যাবে, বাকি দুটোর কোন আশা নেই?’

‘তাতেও আমার প্রস্তাব বদলাবে না।’

হাত বাড়িয়ে বিয়ারের বোতলটা তুলে নিল রানা, কয়েক ঢোকে নিঃশেষ করে ফেলল। আরেকটা বোতল খুলল মাইকেল, ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

প্রস্তাবটা নিয়ে দ্রুত চিন্তা করল রানা। তাঞ্জানিয়ার মাঝারি গোছের একটা সুগার কোম্পানীর সঙ্গে কথা হয়েছে ওর, ওদেরকে নির্ধারিত এক হাজার একশো শিলিঙে গ্যাসোলিন-চালিত সুগারকেইন ক্র্যাশার সরবরাহ করবে ও। তিনটে গাড়ি থেকে সব মিলিয়ে তিন হাজার তিনশো শিলিং আসবার কথা। কিন্তু ইংরেজ লোকটা কিনতে চাইছে পাঁচটাই, ওর চাওয়া দামে। ‘বুঝতেই পারছ, ওগুলোর পিছনে সময় নষ্ট করেছি আমি।’ দাম হাঁকবার আগে মাইকেলকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে নিতে চাইছে।

‘জানি, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।’

‘প্রতিটি তিন হাজার একশো শিলিং, মোট পাঁচটা। সব মিলিয়ে পনেরো হাজার পাঁচশো শিলিং।’

‘এঞ্জিনগুলো তুমি আবার জোড়া লাগিয়ে জাহাজে তোলার উপযোগী করে দেবে।’

‘অবশ্যই।’

‘রাজি,’ বলল মাইকেল, দু’জনেই পরস্পরকে স্মিতহাসি উপহার দিল। ‘বেচাবিক্রির একটা চুক্তিপত্র এখুনি আমি তৈরি করে ফেলতে চাই।’ একটা চেক বই বের করল মাইকেল। ‘আমি আবার বাকিতে কাজ করতে পছন্দ করি না। তোমার পাওনা পুরো টাকার চেক এখুনি লিখে দিচ্ছি।’

‘টাকার কী?’ রানার মৃদুহাসি ম্লান হতে শুরু করল।

‘চেক। যে সে ব্যাংক নয়, লন্ডনের সিটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে আমার, পিকাডেলি স্কয়্যারে…।’

কথাটা মিথ্যে নয়। লন্ডনের সিটি ব্যাংকে সত্যিই একটা অ্যাকাউন্ট আছে বটে মাইকেল সেভারসের। তবে অ্যাকাউন্টটার সর্বশেষ হিসাবে জানা যায়, পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ও.ডি.নিয়েছে মাইকেল, এবং বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও টাকাটা শোধ দিতে গড়িমসি করছে সে। মাত্র ক’দিন আগেও লাল কালিতে লেখা ম্যানেজারের একটা রিমাইন্ডার পেয়েছে সে।

‘নগদ টাকা নিজের সাথে রাখা নিরাপদ নয়, বিশেষ করে বিদেশবিভুঁইয়ে,’ বলল মাইকেল, চেক বইটা খুলে লিখবার জন্য তৈরি হলো সে। চেকটা লন্ডনে পৌঁছুতে অন্তত হপ্তাখানেক লাগবে—এবং টাকার আকৃতি নিয়ে কখনোই ওটা ফিরে আসবে না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার আগেই পালিয়ে মাদ্রিদে চলে যাবে মাইকেল, শুনেছে ওখানে নাকি ধনকুবেরদের বোকা বানিয়ে সহজেই দু’পয়সা কামানো যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশও নাকি ভাল। হাতে কিছু পুঁজি থাকলে সিঁড়ি বেয়ে আবার তর তর করে উঠে যাবে সে।

‘চেক ভাল জিনিস, তোমার সাথে আমি একমত। কিন্তু মুশকিল হলো আমার ঠিক সয় না, অ্যালার্জি আছে।’ চুরুটটা নামিয়ে হাতে নিল রানা। ‘নগদ আর চেক দুটোই যদি তোমার কাছে সমান হয়, আমি বরং পনেরো হাজার পাঁচশো শিলিং নগদই নেব।’

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল মাইকেল। উঁহু, ব্যাপারটা এত সহজে সারা যাচ্ছে না। ‘দেখো দিকি, কী বিপদেই না পড়া গেল–চেক ক্লিয়ার হয়ে আসতে খানিকটা সময় তো লাগবেই।’

‘কোন তাড়া নেই,’ নিঃশব্দে হেসে তাকে আশ্বস্ত করল রানা। ‘কাল দুপুরের মধ্যে যে-কোন সময় টাকাটা পেলেই চলবে আমার। আমার প্রথম ক্রেতাকে ওই সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দেয়ার কথা হয়ে আছে। সময় মত তুমি যদি টাকা নিয়ে পৌঁছুতে পারো, গাড়িগুলো তোমার হয়ে যাবে।’ নিচু ঝর্ণা থেকে উঠে এল ও, ওর আফ্রিকান ভৃত্য হাতে একটা তোয়ালে ধরিয়ে দিল।

‘আজ তোমার ডিনার প্ল্যানটা কী রকম?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

‘মোসলেমের ইচ্ছে আজ আমাকে হরিণের মাংস রেঁধে খাওয়াবে।’ আফ্রিকান কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল রানা।

‘তারচেয়ে ফরচুনা-য় তুমি আমার অতিথি হও, কী?’

‘যার বিয়ার খেতে পারি তার ডিনার খেতে আপত্তি করব কেন?’ সহাস্যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল রানা।

ফরচুনার ডাইনিং রুমটা বরফের মত ঠাণ্ডা, তবে মেজবান মাইকেলের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করল রানা। ওকে আলিঙ্গন করল সে, সবিনয় ভদ্রতার সঙ্গে পথ দেখিয়ে এক কোণে

একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল, সারাক্ষণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা, একের পর এক দামী খাবারের অর্ডার দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ওয়েটারদের। তার হাসি সংক্রামক, এক সময় রানাও আক্রান্ত হয়ে পড়ল। আলাপ শুরু হতে না হতে দু'জনেই ওরা আবিষ্কার করল দুনিয়ার প্রায় সব বড় শহরে রানা যখন ছিল প্রায় ঠিক একই সময়ে মাইকেলও সেখানে ছিল। তারপর জানা গেল রানা যাদেরকে চেনে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের চেনে মাইকেল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রানা যখন সম্মুখসমরে লড়ছে, মাইকেল তখন লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চাঁদা তুলছে। তারপর জানা গেল, দু'জনের রক্তেই রয়েছে দুর্দমনীয় অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, কেউ বিবাহিত নয়, কারও কোন পিছুটান নেই, এবং দু'জনেই স্বাধীনচেতা। পরস্পরকে কিঞ্চিৎ চিনতে পারবার পর, একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। ডিনার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দু'জনের মধ্যেকার অমিল সম্পর্কে সহনশীল একটা মনোভাব তৈরি হলো ওদের মধ্যে। রানা মাইকেলকে জাত বেনিয়াদের একজন বা মাইকেল রানাকে কালা আদমী বলে ভাবছে না–কিন্তু তার মানে অবশ্য এই নয় যে রানা মাইকেলের কাছ থেকে কোন চেক গ্রহণ করতে যাচ্ছে বা মাইকেল গাড়ি পাঁচটা হাত করবার প্ল্যান ত্যাগ করেছে। অবশেষে ব্র্যান্ডির বোতলটা নিঃশেষে খালি করে হাতঘড়ি দেখল মাইকেল।

বলল, 'আরে, মাত্র ন'টা বাজে! রাত সবে শুরু হলো, তাই না, ওল্ড চ্যাপ? কোথায় যাব আমরা, কী করব?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রস্তাব পাবার অপেক্ষায় থাকল রানা।

'শুনেছি মাদাম জুলিয়ানার ওখানে আজই নাকি ইটালি থেকে দুটো মেয়ে এসেছে, ভারি সুন্দরী। এক্কেবারে ফ্রেশ।'

প্রস্তাবটা তাড়াতাড়ি বাতিল করে দিল রানা। ‘পরে দেখা যাবে–ডিনারের পরপরই ঠিক ভাল্লাগবে না।’

দ্বিগুণ উৎসাহে আরেকটা প্রস্তাব দিল মাইকেল, আসলে এটাই গেলাতে চাইছে রানাকে। ‘কয়েক হাত তাস খেললে কেমন হয়? দার-এস-সালাম ক্লাবে মার্জিত ভদ্রলোকেরা খেলেন।’

‘কিন্তু যাব কীভাবে। আমরা তো মেম্বার নই।’

‘খুশির কথা, দু’জনকে এক ইউনিট হিসেবে দেখছ–দেহ আলাদা হলেও আত্মা এক। কিন্তু আমি মেম্বার, অর্থাৎ আমরা মেম্বার, কী?’ ভুরু নাচিয়ে একগাল হাসল মাইকেল।

দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে খেলতে বসেছে ওরা। সময়টা উপভোগ করছে রানা। সুন্দর, মার্জিত পরিবেশ; উপস্থিত সবাই গণ্যমান্য ব্যক্তি। জানালা দরজায় ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে ঝুলছে হান্টিং ট্রফি এবং গাঢ় রঙের তৈলচিত্র। তিনটে বিলিয়ার্ড টেবিল থেকে আইভরি বলের আওয়াজ ভেসে আসছে, কালো টাই আর কালো ট্রাউজার পরা ধনীর দুলালরা খেলছে ওদিকে, সবাই যে-যার সান্ধ্যকালীন জ্যাকেট খুলে রেখেছে।

কন্ট্র্যাক্ট ব্রিজ খেলা হচ্ছে তিনটে টেবিলে, ফিসফিসে আওয়াজ ভেসে আসছে ডাক পাল্টা-ডাকের, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই শ্বেতাঙ্গ, সবার পরনে দামী সুট।

টেবিলগুলোর ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত আসা-যাওয়া করছে ওয়েটাররা, পরনে আজানুলম্বিত আচকান, মাথায় ফেজ টুপি, হাতের ট্রে-তে পানীয় ভর্তি গ্লাস।

পোকার খেলা চলছে মাত্র একটা টেবিলে। টেবিলটা বার্মা টিকের তৈরি, পিতলের ছাইদানি কাঠের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকানো,

মদের গ্লাস ও আইভরি চিপস্ রাখবার জন্য অগভীর গর্ত করা রয়েছে টেবিলের উপর, তা-ও চকচকে পিতল দিয়ে মোড়া। টেবিলে পাঁচজন বসে আছে, তাদের মধ্যে একা শুধু রানার পরনে আনুষ্ঠানিক সান্ধ্যকালীন পোশাক নেই। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন পোকার খেলায় এতটাই কাঁচা যে রানার লোভ হতে লাগল–ওদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে হোটেল কামরার আলমারিতে তুলে রাখে। টাকার অভাব হলেই আলমারি খুলে খেলতে বসাবে।

একজন আমেরিকান, প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য, আফ্রিকায় এসেছেন শিকার করতে। গভীর জঙ্গল থেকে সদ্য ফিরেছেন তিনি, ওখানে বন্য পশুদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য আফ্রিকান এক শিকারী হেভি ক্যালিবার রাইফেল হাতে সারাক্ষণ তাঁর কনুইয়ের পাশে উপস্থিত ছিল, এবং তার উপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি বুনো মোষ, সিংহ ও গণ্ডার নিধন করেছেন ভদ্রলোক। তাঁর একটা শারীরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করল রানা–ডান চোখের নীচে অতি সংবেদনশীল একটা শিরা রয়েছে, হাতে ভাল কার্ড উঠলেই তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে সেটা। এতে যদি প্রমাণও হয় যে লোকটা নার্ভাস প্রকৃতির, বলতেই হবে তার প্রকৃতির সঙ্গে ভাগ্যের কোন সম্পর্ক নেই। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ভদ্রলোক প্রায় প্রতি দানেই ভাল কার্ড পাচ্ছেন, ফলে রানা আর তিনিই শুধু জিতছেন।

দ্বিতীয়জন মাইকেলের সমবয়সী, উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পপতি। হাতের কার্ড খারাপ হলে বা হেরে গেলে সাপের মত হিসহিস করে ওঠে।

রানার ডান দিকে বসেছেন বয়স্ক একজন আমলা, তাঁর মস্ত টাকের মাঝখানে কলংকের মত কাঁচাপাকা অল্প ক'গাছি চুল দেখে খুবই বিরক্ত বোধ করল রানা, ওর মনে হলো ওগুলো ফেলে দিলে

টাকটা যথাযোগ্য মর্যাদা পেতে পারত। ভদ্রলোক বেশিরভাগ সময় হু-হু করে হাসছেন, কিন্তু জিতবার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিলেই নেয়ে উঠছেন ঘেমে।

সতর্কতার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক খেলবার পর সাতশো শিলিঙের মত জিতল রানা, মাইকেলের ঔদার্যে ভক্ষণ করা উপাদেয় ডিনার যেখানে হজম হচ্ছে সেখানে উষ্ণ এবং তৃপ্তিকর একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। এই মুহূর্তে ওর জীবনে অশান্তি এবং অস্বস্তির এক মাত্র কারণ যেটা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দায়ী মাইকেল সেভারস্, ওর নতুন বন্ধু এবং স্পনসর।

সহজ ভঙ্গিতে, পেশী ঢিল করে দিয়ে বসে আছে মাইকেল। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে মোটেও কার্পণ্য করছে না। আমেরিকান শিকারী জিতছেন, কাজেই তাঁকে বাহবা দিচ্ছে। সমবয়সী শিল্পপতি আর বয়স্ক আমলা হারছে, ওদেরকে আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে সৎ পরামর্শ দিতেও ইতস্তত করছে না—যেহেতু হেরেছেন, কাজেই টাকা তুলতে হলে বেশি করে বাজি ধরতে হবে। সে নিজে খুব বেশি হারেনি বা জেতেনি, প্রায় সমান সমান অবস্থায় রয়েছে অথচ তার তাস বাঁটবার মনোমুগ্ধকর ধরন অভিজ্ঞ রানার চোখে সাংঘাতিক সন্দেহজনক বলে মনে হতে লাগল। লম্বা দশ আঙুলের ভিতর নিয়ে কার্ডগুলো এত দ্রুত শাফল করতে পারে যে দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি কার্ড অনুসরণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ রাখল রানা, চুপিসারে, প্রতিবার যখনই কার্ড বিলি করবার দায়িত্ব পেল মেজর মাইকেল সেভারস্। একজন ডিলার যত কুশলীই হোক, তার হাতের ছোঁয়ায় যতই না কেন জাদু থাকুক, পছন্দ মত নির্দিষ্ট কোন কার্ড অন্যান্য কার্ডের

ভিতর সাজিয়ে রাখা সম্ভব নয় যদি না সে শাফল করবার সময় ওগুলো নিজের দিকে সিধে করে রাখে। রানা দেখল, শাফল করবার সময় কার্ডের দিকে তাকাচ্ছেই না মাইকেল। প্রতিপক্ষের মুখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শান্ত দৃষ্টি, হালকা সুরে কথা বলে চলেছে। রানার পেশী একটু একটু করে শিথিল হতে শুরু করল।

শিল্পপতি কার্ড বাঁটল। চারটে একরঙা কার্ড পেয়ে দানটা জিতল রানা। আইভরি চিপস নিজের দিকে টেনে গর্তের ভিতর জমা করল ও।

সেদিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল মাইকেল। 'এসো নতুন একটা প্যাকেট খোলা যাক,' বলল সে, হাসল, আঙুল বাঁকা করে কাছে ডাকল একজন ওয়েটারকে। 'দেখা যাক, তোমার জেতার ভাগ্যটাকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় কি না।'

নতুন প্যাকেটের সীল পরীক্ষা করবার জন্য সবাইকে দেখাল মাইকেল, তারপর প্যাকেট খুলে কার্ডগুলো মেলল, বের করে নিল জোকার দুটো। তাসের পিছনে বাইসাইকেলের চাকার ছবি ছাপা রয়েছে। শাফল করতে শুরু করল সে, একই সঙ্গে শুরু হলো একজন বিশপের অশ্লীল গল্প–চ্যারিং ক্রস স্টেশনে ভুল করে মহিলাদের রেস্টরুমে ঢুকে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, তারপর সেখানে কী ঘটেছিল। কৌতুকটা বর্ণনা করতে এক কি দেড় মিনিট সময় নিল সে, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষালি হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই, এই সুযোগে কার্ড বিলি করতে শুরু করল মাইকেল–যথেষ্ট দূর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের সামনে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হলো কার্ডগুলো, একটার উপর নিখুঁত ভাবে আরেকটা। একা শুধু রানাই লক্ষ করল, রেস্টরুমে মহিলাদের নির্লজ্জ আচরণে বিশপ যখন আতংকিত এবং দিশেহারা, কার্ডগুলো দু'ভাগে ভাগ করে দু'হাতে নিয়ে শাফল করছে মাইকেল, শার্টের আস্তিন আগেই খানিকটা

গুটিয়ে নিয়েছে সে—কার্ডগুলো বাঁকা হয়ে একটার উপর আরেকটা পড়বার আগের মুহূর্তে উপর দিকে মুখ তুলছে, চকিতে সেগুলোর উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল মাইকেল।

প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন, হাসতে হাসতেই নিজের কার্ডগুলো তুলে নিয়ে চোখ বুলালেন। দম নিয়ে আবার হাসতে শুরু করবেন, মাঝপথে বিষম খেলেন তিনি। তাঁর ডান চোখের নীচে ঘন ঘন লাফাতে শুরু করল বেয়াড়া শিরাটা, ওটা যেন তাঁর নাকটাকে আদর করছে। টেবিলের ওদিক থেকে জোরাল হিসহিস ভেসে এল, হাতে ধরা কার্ডগুলো তাড়াতাড়ি এক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল শিল্পপতি, তারপর দু'হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল। রানার ডান দিকে আমলা ভদ্রলোকের চেহারা হাতির হলুদ দাঁতের মত চকচক করছে, মাথার চুল থেকে কপাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের একাধিক ধারা, বিস্ফারিত চোখে হাতে ধরা কার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

নিজের কার্ড তুলল রানা, তিনটে কুইন পেয়েছে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার নিজের গল্প বলা শুরু করল ও।

'আমি একবার মোটর ভেসেল হোয়াং টাং-এর এঞ্জিনরুমে ছোটখাট একটা দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমাদের জাহাজ নোঙর ফেলেছিল হংকঙে। আমাদের ক্যাপটেন একদিন এক সৌখিন শ্বেতাঙ্গকে অভ্যর্থনা জানালেন জাহাজে, ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছে দু'চার দান তাস খেলবেন আমাদের সাথে। খেলা শুরু হলো, প্রথম থেকেই লাফিয়ে বাড়তে লাগল বাজির অংক। মাঝরাতের দিকে সৌখিন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক ভয়ংকর একটা দান বাঁটলেন।'

রানার গল্প কেউ শুনছে বলে মনে হলো না, প্রত্যেকে যে যার নিজের কার্ড নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত। শুরু করল রানা:

‘স্কিপার পেলেন চারটে রাজা। আমি পেলাম চারটে গোলাম। আর জাহাজের ডাক্তার পেল চারটে দশ।’ আবার গল্পের মাঝপথে থামল রানা, হাতের রানী তিনটে নতুন করে সাজাল। এই সময় আমলা ভদ্রলোকের অনুরোধে সাড়া দিয়ে মাইকেল তাঁকে আরও দুটো কার্ড সরবরাহ করল।

‘সৌখিন ভদ্রলোক নিজেও ড্র থেকে একটা কার্ড নিলেন, আর তারপরই খেলাটা বিদ্যুৎ গতি লাভ করল। যার যা আছে সব বের করে বাজির অংক বাড়াতে লাগলাম সবাই। ধন্যবাদ, বন্ধু, আমিও দুটো কার্ড নেব।’

রানার দিকে দুটো কার্ড ছুঁড়ে দিল মাইকেল, সেগুলো তুলবার আগে নিজের হাত থেকে কার্ড ফেলে দিল রানা। ‘যা বলছিলাম, সবার হাতে ভাল তাস থাকায় উন্মাদের মত সর্বস্ব বাজি ধরছিলাম আমরা। একা শুধু আমার পকেট থেকেই আড়াই হাজার হংকং ডলার বেরিয়ে গেছে…।’

নতুন কার্ড তুলে কোনরকমে হাসি চাপল রানা। ওর হাতে এখন চার চারটে সুন্দরী নারী। ‘নগদ টাকা শেষ, সবার পকেট খালি, এখন উপায়? লিখিত বন্ড দিতে শুরু করলাম আমরা। ডাক্তার আর আমি আমাদের আগামী কয়েক মাসের বেতনের টাকা বাজি ধরলাম। খেলা চলছে, কেউ হার মানতে রাজি নয়, সবার ধারণা তার কার্ডই সবার চেয়ে ভাল, সে-ই জিতবে।’

প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যকে একটা কার্ড দিল মাইকেল, নিজেও একটা নিল। এতক্ষণে ওরা গল্পটা শুনছে, রানার ঠোঁট আর নিজেদের কার্ড, দুটোর মাঝখানে ছুটোছুটি করছে ওদের দৃষ্টি।

‘যাই হোক, এক সময় কার্ড শো করার অবস্থা হলো। আমাদের সামনে সিলিং ছোঁয়া নগদ টাকা। সৌখিন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক স্ট্রেইট ফ্ল্যাশ দেখিয়ে কুপোকাৎ করলেন আমাদের।

পরিষ্কার মনে আছে আমার—তিন থেকে আট পর্যন্ত ছ'টা চিড়িতন। আঘাতটা সামলে উঠতে আমার আর স্কিপারের সময় লাগে বারো ঘণ্টা, এবং তারপরই আমরা হিসেব করে বের করলাম কোন রকম কারচুপি না করে বাঁটা হলে এ-ধরনের তাস পড়ার সম্ভাবনা ছয় কোটি বারের মধ্যে একবার। ব্যাপারটা সৌখিন শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে যায়, কাজেই তাঁকে আমরা খুঁজতে বেরুলাম।'

থামল রানা, সবাই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে যে যার কার্ডের দিকে, তবে খাড়া কান রানার দিকে তাক করা।

'ভদ্রলোককে আমরা সী বীচ হোটেলের সৈকতে পেলাম, আমাদের কষ্টার্জিত টাকা মদ আর মেয়েমানুষের পিছনে দু'হাতে ওড়াচ্ছিলেন। ওই সময় আমরা নোঙর তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আমাদের বয়লার ঠাণ্ডা ছিল। ভদ্রলোককে ধরে এনে বসানো হলো ঠিক বয়লারের ওপর, তারপর আগুন দেয়া হলো নীচে। তাঁকে অবশ্য বেঁধে নিতে হয়েছিল। খানিকক্ষণ পরই নিতম্বের ওপর তাঁর ট্রাউজার আর খুলির ভেতর তাঁর শয়তানী বুদ্ধি আগুনের আঁচ পেতে শুরু করল। ট্রাউজার পোড়ার গন্ধের সাথে মাংস পোড়ার গন্ধ পেতে শুরু করলাম আমরা...।'

'মাই গড,' প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য আঁতকে উঠলেন। 'কী ভয়ংকর!'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে গন্ধটা,' তাঁর সঙ্গে একমত হলো রানা। 'আমরা অবশ্য নাকে রুমাল দিয়ে নিয়েছিলাম, তা না হলে কার বাপের সাধ্যি এঞ্জিনরুমে থাকতে পারে!'

টেবিল ঘিরে বিস্ফোরণোন্মুখ নিস্তব্ধতা নেমে এল। সবাই সচেতন, প্রচণ্ড ঝড়ের মত একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই বুঝল গুরুতর একটা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু

বেশিরভাগ লোক জানে না অভিযোগটা কি বা কার বিরুদ্ধে উত্থাপিত। রক্ষাকবচের মত যে-যার কার্ড আঁকড়ে ধরে আছে সবাই, চোখে নগ্ন সন্দেহ নিয়ে একজন আরেকজনের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। টেবিলের পরিবেশ এতটাই উত্তেজনাকর হয়ে উঠল যে তা গোটা কামরায় ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না, আশপাশের টেবিলের লোকজন নিজেদের খেলা ছেড়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল ওদের পাঁচজনের দিকে।

'আমার ধারণা,' দৃঢ়, মার্জিত কণ্ঠে বলল মাইকেল সেভারস্, কামরায় উপস্থিত প্রত্যেকে শুনতে পেল তার কথা, 'মি. মাসুদ রানা বলতে চাইছেন কেউ একজন খেলায় চুরি করছে।'

মাথার উপর ছাদ ভেঙে পড়লেও কেউ বোধহয় এতটা চমকে উঠত না। দার-এস-সালাম ক্লাবে চুরির অভিযোগ! চিন্তাও করা যায় না। অভিজাত পরিবেশে মার্জিত ভদ্রলোকেরা সুরুচির অনুশীলন করেন এখানে, তাঁদের মাঝখানে চোর থাকে কীভাবে! খুনের অভিযোগ মেনে নেওয়া যায়, যৌন-অপরাধের অভিযোগও না হয় সহ্য হয়, কিন্তু চুরির অভিযোগ, হায় ঈশ্বর!

'আমিও মি. মাসুদ রানার সাথে একমত হয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, হ্যাঁ,' মাইকেলের ঠাণ্ডা নীল চোখ বিস্ময়ে হতভম্ব প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের উপর স্থির হলো, 'চুরি সত্যি হচ্ছে বটে।' মার্কিন শিকারী ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকল সে। 'এখন দেখার বিষয়, আপনি, স্যার, যথেষ্ট ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে, আমাদের টাকা যা আপনি অন্যায়ভাবে জিতেছেন, দয়া করে প্রত্যেককে ফেরত দেবেন কি না।' শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর চড়ল, গুরুগম্ভীর মেঘের ডাকের মত লাগল শুনতে।

আমেরিকান ভদ্রলোক তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, যেন জন্ম থেকেই হাবা এবং বোবা তিনি, মাইকেলের

কোন কথাই তাঁর বোধগম্য হয়নি। তারপর, ধীরে ধীরে, তাঁর চেহারা রঙ পেতে শুরু করল। প্রথমে বেগুনি, তারপর লালচে, সবশেষে টকটকে রক্তবর্ণ ধারণ করল তাঁর অবয়ব। 'স্যার! আপনার এত স্পর্ধা! গুড গড, স্যার!' সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছেন, ঠকঠক করে কাঁপছেন, গলার ভিতর শব্দ আটকে যাচ্ছে।

'উনি পালানোর মতলবে আছেন!' চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিল মাইকেল! 'ধরো, ধরো!' দু'হাতে ধরে টেবিলটা উল্টে দিল সে, যেন প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের পালানোর পথ বন্ধ করাই উদ্দেশ্য। টেবিলটা সশব্দে কাত হলো মেঝেতে, ওটার নীচে চাপা পড়ল শিল্পপতি এবং আমলা ভদ্রলোক–চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আইভরি চিপস আর তাস। এখন আর কারও জানবার উপায় নেই মাইকেল সেভারস্ নিজে বেঁটে কী তাস নিয়েছিল। উঠে দাঁড়াবার সংগ্রামে ব্যস্ত ধরাশায়ী খেলোয়াড়দের দিকে ঝুঁকে মার্কিন শিকারীর বাম কানের নীচে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল সে। 'চিটিং, অ্যাঁ? চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন, আজ আপনার রক্ষা নেই!'

শিকারী ভদ্রলোক আহত বাঘের মত গর্জে উঠলেন, তিনিও মুঠো পাকিয়ে ঘুসি ছুঁড়লেন মাইকেলকে লক্ষ্য করে। মাইকেল তো সহজেই একদিকে কাত হয়ে সেটা এড়াল, কিন্তু বেচারা ক্লাব সেক্রেটারী এড়াতে পারল না–হৈ চৈ শুনে এইমাত্র দু'জনের মাঝখানে ছুটে এসেছে সে। সরাসরি নাকের উপর খেলো বেচারা।

সংক্রামক মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ল মারামারি। ক্লাব সেক্রেটারীকে সাহায্য করবার জন্য আর সব টেবিল থেকে লোকজন ছুটে এল। হঠাৎ সৃষ্ট ভিড়ের মধ্যে থেকে হাত বাড়িয়ে

মাইকেলের শার্ট খামচে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। 'উনি নন–তুমি!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল ও। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শোরগোলের মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

কামরায় চল্লিশজন সদস্য উপস্থিত রয়েছে। মাত্র একজনের পরনে আনুষ্ঠানিক পোশাক নেই–জ্যাকেট পরে রয়েছে রানা। কাউকে কিছু বলে দিতে হলো না, এক পাল শিকারী কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল খরগোশের উপর।

'পিঠ বাঁচাও, ওল্ড বয়!' পরম বন্ধুর মত রানাকে সাবধান করে দিল মাইকেল, রানার লম্বা করা হাত তার কোটের কিনারা প্রায় ধরে ফেলেছে।

ঝট্ করে ঘুরল রানা, রক্ত-মাংসের সচল একটা পাঁচিলের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটল। সদস্যরা রাগে উন্মাদ, তারস্বরে চিৎকার করছে। মাইকেলের উদ্দেশে শক্ত করা রানার মুঠো প্রথম সারির দু'জন সদস্যের উপর বর্ষিত হলো, প্রথমজন ঘুসি খেলো চোয়ালে, দ্বিতীয়জন নাকের উপর। তারা পড়ে গেল বটে, কিন্তু বাকিরা হুংকার ছেড়ে আরও দ্রুতগতিতে ছুটে এল ওর দিকে।

'চালিয়ে যাও!' বিপুল উৎসাহে আহ্বান জানাল মাইকেল। 'যে থামতে বলবে তার কপালে জুতোর বাড়ি!' অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সে এখন সশস্ত্র, তার হাতে একটা বিলিয়ার্ড কিউ দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কালো সান্ধ্যপোশাকের তলায় আক্ষরিক অর্থেই চাপা পড়ে গেছে রানা। ওর পিঠে সওয়ার হয়েছে তিনজন, দু'জন ঝুলে আছে ঊরু আঁকড়ে ধরে, দু'জন দুই বগলের নীচে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

'আমি নই!' মিছেই চিৎকার করছে রানা। 'ভুল করছেন–আমি নই, ও!' মাইকেলের দিকে হাত তুলবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু হাত দুটোর কোনটাই মুক্ত করা গেল না।

‘ঠিক বলেছ, বৎস!’ সায় দেওয়ার সুরে বলল মাইকেল। ‘ভদ্রবেশী চোর!’ আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বিলিয়ার্ড কিউটা ব্যবহার করছে সে। উল্টো করে ধরেছে সেটা, মোটা প্রান্তটা সজোরে ঠুকে অব্যর্থভাবে একের পর এক খুলি ফাটিয়ে চলেছে রানার পিঠে সওয়ার সুবেশী ভদ্রলোকদের। এক এক করে রানার পিঠ থেকে খসে পড়তে লাগল তারা। আবার একবার মাইকেলের মুখোমুখি হলো রানা।

‘শোনো–,’ গর্জে উঠল রানা। ধরাশায়ী কয়েকজন লোক ওর পা জড়িয়ে ধরেছে, তা সত্ত্বেও মাইকেলের দিকে এগোবার চেষ্টা করল ও।

‘আমিও তো তাই বলছি, শোনো!’ মাথা একদিকে কাত করে শুনবার ভঙ্গি করল মাইকেল, দু’জনেই হঠাৎ উপলব্ধি করল পুলিশের হুইসেল বাজছে। জোড়া দরজার সামনে ইউনিফর্মও দেখতে পেল মাইকেল। ‘এটা সত্যিকার বিপদ, ওল্ড চ্যাপ, একশো ভাগ খাঁটি! সুবোধ বালকের মত পিছু নাও!’ সুকৌশল অসি চালানোর ভঙ্গিতে বিলিয়ার্ড কিউটা বার কয়েক ব্যবহার করে পাশের জানালার সমস্ত কাচ ভেঙে ফেলল সে, তারপর ধীর শান্ত ভঙ্গিতে বাইরের অন্ধকার বাগানে নেমে পড়ল।

তিন

দ্রুতপায়ে ফুটপাত ধরে হাঁটছে রানা। মেইন রোড ধরে ঝর্ণার কিনারায় নিজের ক্যাম্পে ফিরছে ও। পিছনের অন্ধকারে শোরগোল আর হুইসেলের আওয়াজ অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। ওর রাগও পড়ে গেছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের রক্তবর্ণ চেহারা আর বিস্ফারিত চোখ দুটো কল্পনা করে আপনমনে হাসল কিছুক্ষণ। একটু পরই সন্দেহ হলো ওর, পিছু নিয়েছে কেউ। টুংটাং ঘণ্টা বাজিয়ে একটা রিকশা আসছে, রিকশাওয়ালার খালি পা থপ থপ আওয়াজ তুলছে কংক্রিটের রাস্তায়। পিছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারল রানা কার পাল্লায় পড়েছে সে।

'সন্দেহ হচ্ছিল, তোমাকে বুঝি হারিয়েই ফেললাম,' হালকা সুরে বলল মাইকেল, হাস্যরসে ভরপুর তার সুদর্শন চেহারা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে ধরা চুরুটের আগুনে উদ্ভাসিত হয়ে আছে, আয়েশী ভঙ্গিতে রিকশার গদিতে হেলান দিয়ে রয়েছে সে। 'তোমার কেটে পড়ার ভঙ্গিটা দারুণ মুগ্ধ করেছে আমাকে, মাইরি বলছি! ভাদ্র মাস এলে আমাদের পোষা টম পাড়ার বিউটিকে যে গতিতে ধাওয়া করত, ঠিক যেন সেই গতিতে ছুটতে দেখলাম তোমাকে। সত্যি, তোমার আরেকটা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল।'

কথা না বলে নিজের পথে হাঁটতে থাকল রানা।

'এ-ও কি সম্ভব যে তুমি শুয়ে পড়ার কথা ভাবছ?' মাইকেলের রিকশা রানার পাশেই থাকছে। 'রাত তো এখনও শিশু হে, তা ছাড়া কে বলতে পারে মজার মজার আরও কত কী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কী?' ভুরুর কৌতুককর নাচ কল্পনায় দেখা

গেল।

হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করল রানা, নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে হাঁটছে।

'মাদাম জুলিয়ানার ওখানে?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

রানা নিরুত্তর।

'আমি তো ভেবে পাই না, বয়স থাকতে কেন মানুষ মৌজ-ফুর্তি করবে না—বিশেষ করে পরের খরচায়!'

'গাড়িগুলো তোমার খুব দরকার, না?'

'ব্যথা পেলাম,' ঘোষণা করল মাইকেল। 'আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাবের সাথে কোন জাগতিক স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে?'

'মাদাম জুলিয়ানাকে আমি চিনি না,' বলল রানা। 'তার কাছে আসা মেয়েদের সম্পর্কেও আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'বিশ্বাস করলাম না। নিঃসঙ্গ পুরুষমানুষ, মেয়েদের সম্পর্কে আগ্রহ থাকবে না কেন? নাকি ভাবছ রদ্দিমার্কা বাসি মাল?'

'নয়?'

'মাতা মেরীর কিরে, তোমার একজন বয়স্ক গাইড-কাম-গার্জেন দরকার,' বলল মাইকেল। 'তুমি দেখছি কিছুই জানো না, হে। শোনো তা হলে। মাদাম জুলিয়ানা ইটালিয়ান ভদ্রমহিলা, দার-এস-সালামে আদম ব্যবসা করেন। চাকরি পাবার আশায় ইটালি থেকে বহু ভদ্র পরিবারের মেয়ে তাঁর কাছে আসে। কিন্তু সবাইকে তিনি সাথে সাথে চাকরি যোগাড় করে দেবেন কীভাবে, বলো? অথচ মেয়েগুলো আসে প্রায় খালি হাতে। মাদাম জুলিয়ানা অত্যন্ত দয়ালু, তিনি শুধু শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ডেকে পাঠান, এবং মেয়েগুলোকে বলে দেন তারা যেন ওদের সঙ্গদান করে কিছু

খসিয়ে নেয়। এতে দু'পক্ষেরই লাভ—আমরাও ফুর্তি পেলাম, ওদেরও দিন কয়েক চলার মত ব্যবস্থা হলো। তাজা, এবার বুঝতে পারছ তো?'

একটা ঢোক গিলল রানা। হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। নারীসঙ্গ থেকে কতদিন বঞ্চিত, হিসাব পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। যেন এক যুগ পেরিয়ে গেছে। শরীরে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, ঠিকই বলেছে মাইকেল—আগ্রহ নেই, কথাটা সত্য নয়। তবে পয়সার বিনিময়ে নারীসঙ্গ লাভের কথা কল্পনাও করা যায় না। আরও কয়েক যুগ নিঃসঙ্গ থাকলেও না। কিন্তু এই লোকটা এভাবে লেগেছে কেন ওর পেছনে...আসল উদ্দেশ্যটা কী? বাজে একটা লোক, কিন্তু একে কিছুতেই অপছন্দ করতে পারছে না কেন সে?

'মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে কী...'

'তুমি না বললে, শুধু শ্বেতাঙ্গদের ডেকে পাঠান...।'

'আমার কাছে সাদা-কালোর ভেদাভেদ নেই,' বলল মাইকেল। 'মাদাম জুলিয়ানা ট্যাঁ-ফোঁ করলে আমি তার ভুঁড়ি গেলে দেব।' কী যেন মনে করে হো হো করে হেসে উঠল সে।

'আমি কোন কথা দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'এমন হতে পারে ওখানে যাবার পর ভাল লাগল না, তা হলে ফিরে আসব আমি। কিন্তু খরচ দেবে কে?'

'কেন, বলিনি তুমি আমার মেহমান? উঠে এসো, ওল্ড চ্যাপ।'

তবু ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল রানা। কোন সন্দেহ নেই ওর নির্বাসিত জীবনে অদ্ভুত এক চরিত্র হিসাবে উদয় হয়েছে মাইকেল সেভারস্, তার আচরণের অপছন্দনীয় দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করছে ও, লোকটার সঙ্গ ছেড়ে ক্যাম্পে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। জানতে ইচ্ছে করছে লোকটা আসলে কী রকম।

‘কী হলো, উঠে এসো!’ তাগাদা দিল মাইকেল। ‘কী ভাবছ? গাড়ির বদলে রিকশা করে গেলে রাজার সম্মান ক্ষুণ্ন হবে? নাকি ভাবছ আমার পয়সায় আর কত ফুর্তি করবে?’

‘তোমার বিয়ার খেয়েছি, ডিনার খেয়েছি, হঠাৎ সমাপ্তিই বা টানব কেন?’ ফুটপাত থেকে নেমে রিকশার দিকে এগোল রানা। ‘চলো তা হলে, দেখা যাক। কী বললে? রাজা?’

দু’জন হাস্যমুখর আরোহীকে নিয়ে শহরের দিকে ফিরে চলল রিকশাওয়ালা, রানার দুই ঠোঁটের মাঝখানে একটা চুরুট ঠেসে দিল মাইকেল। জবাব দিল না।

‘নিজের পাতে ঝোল তো ভালই ঢেলেছিলে,’ জিজ্ঞেস করল রানা, ‘কিন্তু কী ঝোল?’ ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছে ও। ‘চারটে টেক্কা? নাকি স্ট্রেইট ফ্ল্যাশ?’

‘আমার চরিত্রে কলংক লেপনের অপচেষ্টা হতে দেখে আমি স্তম্ভিত এবং মর্মাহত, স্যার। প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে যাব।’

ঝাঁকি খেতে খেতে আরও খানিক সামনে এগোল রিকশা, এরপর মাইকেলের প্রশ্নে নিস্তব্ধতা ভাঙল। ‘সৌখিন শ্বেতাঙ্গের পাছাটা সত্যি তোমরা পোড়াওনি, তাই না?’

‘না,’ স্বীকার করল রানা। ‘তবে এই উপাদানটুকু থাকায় গল্পটা দারুণ উতরে গেছে।’

মাদাম জুলিয়ানার গেটে পৌঁছুল ওরা, গেটের ভিতর অন্ধকার বাগান, বাগানের শেষ মাথায় কাঠের একটা দরজার পাশে অল্প শক্তির একটা বালব জ্বলছে। বাগান পেরিয়ে এল ওরা। নক করল দরজায়।

‘নাহ্, এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, আরও দেরি করে অপরাধের মাত্রা বাড়াতে চাই না,’ বলল মাইকেল, তার কাঁচুমাচু

ভঙ্গি দেখে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'তোমার কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সত্যি, প্রথম থেকেই তোমাকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম।'

'আসল কথা সময়টা আমরা উপভোগ করেছি।'

'না, মানে, ভাবছি, তোমার কাছে আমার সৎ থাকতে হবে।'

'এভাবে বেমক্কা ধাক্কা দিয়ো না তো, আছাড় খেয়ে মারা গেলে চিরকালের জন্যে হারাবে আমাকে। তারচেয়ে যেমন আছ তেমনি থাকো, শুধু খেয়াল রেখো ভুল করেও আমার লেজে পা দিয়ে ফেলো না।' দু'জনেই ওরা নিঃশব্দে হাসতে লাগল, রানার কাঁধে হালকা ঘুসি মারল মাইকেল।

বলল, 'আগের কথাই ঠিক থাকল, কেমন? সব খরচা আমার।'

মাদাম জুলিয়ানার ভুঁড়ি গেলে দেওয়ার কথা বলে হেসে উঠেছিল মাইকেল, মহিলাকে দেখামাত্র কারণটা বুঝতে পারল রানা, এবং হাসি চেপে রাখা দায় হলো ওর। মহিলা এত বেশি লম্বা আর রোগা যে কোমর, পেট, নিতম্ব বা বুক বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ হতে লাগল। এমন একটা ড্রেস পরে আছে যেটা হাড্ডিসার দেহকাঠামো ঢাকবার চেয়ে বেশিরভাগ উন্মুক্ত করে রেখেছে, তবে পায়ের পিছনে তিন ফুট মেঝে ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয়নি। গলার পিছনে ঘাড়ের উপর মস্ত একটা খোঁপা, নিঃসন্দেহে পরচুলার অবদান। মাইকেলের সঙ্গে রানাকে দেখে মহিলা বিশেষ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না, তবে ভদ্রতা বজায় রেখে মৃদু হাসল সে। সোফায় বসতে বলল। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে কার্পেটের উপর, রানার পায়ের কাছে বসল মাইকেল।

'মেজর সেভারস্, আপনার দর্শনলাভ করা একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। এত দিন কোথায় ছিলেন? ভাবছিলাম শহর ছেড়ে

আবার কোথাও চলে গেলেন কি না!’

‘ওনাকে চেনেন, মাদাম জুলিয়ানা?’ সোফায় বসা রানাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মাইকেল। ‘আরব্য রজনী থেকে উঠে আসা মহানুভব একটা চরিত্র। নাম জেনে কাজ নেই, মধ্যপ্রাচ্যের ছোট্ট এক রাজ্যের রাজা উনি, গরিবী হালে চলাফেরা করেন, দুনিয়াটা ঘুরে দেখবার জন্যে বেরিয়ে আমাকে বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবে পেয়ে গেছেন। উনি যে দয়া করে আপনার এখানে পায়ের ধুলো ফেলেছেন, সে আপনার সাত পুরুষের ভাগ্য। নতজানু হোন, নতজানু হোন!’

‘আহ্, মাইকেল!’ প্রতিবাদ করল রানা। ‘তুমি দেখছি জঘন্য…’

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এক মুহূর্ত স্থির পাথর হয়ে থাকল মাদাম জুলিয়ানা, তারপর রানার সামনে মাইকেলকে নতজানু হয়ে প্রণাম জানাতে দেখে সে-ও আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করল।

রানা ছিটকে সরে যাবার আগে ওর পায়ের পাতায় চিমটি কাটল মাইকেল, তারপর সিধে হলো সে, বসল, ফিসফিস করে বলল, ‘উদ্দেশ্যটা যদি তুমি ধরতে পেরে না থাকো…’

‘আমি গেলাম,’ বলে দরজার দিকে ঘুরল রানা, ভয়ানক রেগে গেছে।

‘রাজা কী ভাষায় কথা বলেন?’ ফিসফিস করে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল মাদাম জুলিয়ানা। ‘আপনি ওঁকে শান্ত করুন, আমি এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করছি।’ প্রায় ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কার্পেট থেকে লাফ দিয়ে উঠে রানার পথরোধ করে দাঁড়াল মাইকেল। ‘আরে পালাচ্ছ কেন! রাজা না বানালে মাদাম জুলিয়ানা

তোমাকে মশা বা মাছি ছাড়া কিছুই ভাবতেন না। এখন দেখো কেমন তোয়াজ করেন!'

রানা কিছু বলবার আগেই কামরায় পুনরাগমন ঘটল মাদাম জুলিয়ানার। সে নিজেই একটা ট্রে-তে করে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস নিয়ে এসেছে, তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া মাত্র আবার সোফার নীচে কার্পেটের উপর বসে পড়েছে মাইকেল। 'আপনার প্রাইভেট লাউঞ্জ খালি তো, মাদাম?' জিজ্ঞেস করল সে। 'মহামান্য রাজা আমার সাথে কিছু গোপন আলাপ করবেন—কেউ যেন আমাদেরকে বিরক্ত না করে। আর, মহামান্য রাজার সেবা করার জন্যে দু'চারটে ভাল জিনিস যদি থাকে তা হলে পাঠিয়ে দেবেন, একদম ফ্রেশ হওয়া চাই, তা না হলে দরকার নেই।'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে প্রাইভেট লাউঞ্জে নিয়ে এল বাকরুদ্ধ মাদাম জুলিয়ানা। মাইকেল তাকে এক রকম ঠেলেই বের করে দিল প্রাইভেট লাউঞ্জ থেকে, তার পিঠের উপর বন্ধ করে দিল দরজা।

ধপাস করে একটা সোফায় বসে হেলান দিল সে, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে সদ্য ধরানো লম্বা চুরুট, এক হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস। 'ইথিওপিয়ায় এখন কী ঘটছে সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে, ওল্ড বয়?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

বিষণ্ন দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল রানা। হাতে গ্লাস থাকলেও শ্যাম্পেন খেতে ভাল লাগছে না ওর।

'ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তোমার বিশ্বাস জন্মেছে যে কোন কারণ ছাড়া আমি কিছু করি না?' হাসছে না মাইকেল। 'এবং এখন থেকে যা কিছু করব তার একটাই উদ্দেশ্য থাকবে—বন্ধুত্বটাকে লাভজনক করে তোলা।'

'ওখানে সম্রাট হাইলে সেলাসির বিরুদ্ধে আন্দোলন এখন

তুঙ্গে।'

'বলো সম্রাটের সম্রাট হাইলে সেলাসি। বেশ, এবার বলো, ইরিত্রিয়া সম্পর্কে তুমি কী জানো?' রানা রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল মাইকেল, 'আহা, এত অধৈর্য হলে চলে কী করে! সবুরে কী ফলে জানো না?'

'বছর দশেক আগে ইথিওপিয়ার সাথে এক হয়েছে ইরিত্রিয়া।'

'কিন্তু তবু সব ইটালিয়ান ইরিত্রিয়া ছেড়ে আজও চলে যায়নি, শিফটারা তাদেরকে জামাই আদরে রেখেছে।'

'শিফটা?'

'চোর-ডাকাত, দুষ্কৃতকারী, অসভ্য—পাহাড় আর বনেজঙ্গলে বাস। ইটালিয়ানদের ওপর তাদের ভারি ভক্তি, কারণ ওরা যুদ্ধকৌশল জানে, অন্তত শিফটাদের তাই ধারণা। এবার, ইথিওপিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা কী?'

'আদিবাসীদের মধ্যে অন্তর্কলহ এবং সম্রাটের শোষণ।'

'ব্রাভো! শোনো তা হলে, এখানেই আমার কথা এসে পড়ে। আদিবাসীদের একটা গ্রুপ, রাসটাফারিয়ানরা দুর্গম এলাকায় বাস করে, অন্যান্য গোত্রের সাথে এমন কোন দিন নেই যেদিন তাদের সংঘর্ষ বাধে না। কিন্তু সে-সব ছোটখাট সংঘর্ষ, কয়েক শতাব্দী ধরেই চলছে। ওদের আসল শত্রু শিফটারা। শিফটাদের হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে ইটালিয়ানরা, কিছু ভাড়াটে সৈনিকও আছে তাদের, ফলে হামলা হলেই মার খায় রাসটাফারিয়ানরা, পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই গোত্রটি সম্রাট হাইলে সেলাসিকে দেবতা জ্ঞান করে, কিন্তু সম্রাট নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্যে এতই ব্যস্ত যে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এদেরকে সাহায্য করার কথা ভাবার সময় নেই তাঁর।'

'বুঝলাম,' বিরক্ত হয়ে বলল রানা। 'কিন্তু এ-সব কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন?'

'বরং জিজ্ঞেস করো, এত কথা আমি জানলাম কোত্থেকে। জানাই আমার পেশা, ওল্ড চ্যাপ। রাসটাফারিয়ানদের একজন গোত্রপ্রধান আছে, সে-ও ছোটখাট একজন রাজা, তার আছে এক পুত্র অর্থাৎ ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার হলেও সে-ও একজন রাজপুত্র। এই রাজকুমারের সাথে অস্ত্র বেচাকেনার একটা চুক্তি হয়েছে আমার।'

ক্ষীণ আগ্রহ বোধ করল রানা। 'কেন, তোমার কাছ থেকে কেন অস্ত্র কিনতে যাবে তারা?'

'এমবার্গো, ওল্ড চ্যাপ। উপজাতীয়দের মধ্যে হরদম যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকে বলে অস্ত্র কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন সম্রাট। অবশ্য অন্তর্নিহিত কারণটা হলো একটা ভয়—গোত্রপ্রধানদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার অনুমতি দেয়া হলে সে-সব সম্রাটকে উৎখাতের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। এতে করে শিফটাদের ভারি সুবিধে হয়ে গেছে, লুঠ আর ডাকাতি করা বিপুল সম্পদ রয়েছে তাদের হাতে, রয়েছে ইটালিয়ান সমরনায়ক, তার ওপর বিদেশী কুচক্রের কুমন্ত্রণা এবং সহযোগিতা তো আছেই। এই কুচক্রটির উদ্দেশ্য সম্রাটের অবহেলার সুযোগে ইথিওপিয়ার ওই অঞ্চলে ব্যাপক গোলযোগ ছড়িয়ে দেয়া। ইরিত্রিয়ার লোকজন এক অর্থে এই বিশৃংখলা সমর্থন করে, কারণ দুর্বল ইথিওপিয়াই তাদের কাম্য—তা হলে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পাবে তারা।

'শিফটাদের রয়েছে রাইফেল, আর্মার, এয়ারক্রাফট—এয়ারক্রাফট বা ট্যাংক ঠিক এই মুহূর্তে নেই, তবে বিদেশী কুচক্রের কাছ থেকে পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে তারা।

আর রাসটাফারিয়ানদের? মান্ধাতা আমলের ঢাল আর তরোয়াল, ভাঙাচোরা দু'একটা রাইফেল।'

গল্পটা শুনছে রানা, তবে ঠিক বুঝতে পারছে না কতটুকু সত্যি বা এ-সবের মধ্যে ওদের স্বার্থ কোন্‌খানটায় বা কী পরিমাণ। মাইকেলের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসবার কোন ইচ্ছে ওর নেই, বরং সুগার মিলেই আর্মারড কারগুলো বিক্রি করতে চায় ও।

মাইকেল মিটিমিটি হাসছে, যেন রানার মনের সব কথা অনায়াসে পড়তে পারছে। 'খবরটা শুনেছ?' অলস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল সে। 'আর কারও মুখ থেকে শুনলে ভাল হত। আমি বললে তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না।'

'কী খবর?'

'তোমার পার্টি, মানে পুয়ান্ডা সুগার মিল লাটে উঠেছে?'

কথাটা বিশ্বাস করবে কি না চিন্তা করবার আগেই বুকে একটা ধাক্কা খেলো রানা। 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'বললাম না, জানাই আমার পেশা, ওল্ড চ্যাপ?' সহানুভূতিসূচক চুচ্‌ চু আওয়াজ বেরল মাইকেলের মুখ থেকে। 'নাকি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, কী?'

বাইরে বেরিয়ে খবর নিলে সত্যিমিথ্যে এখুনি জানা যাবে। তবে খবরটা মিথ্যে না হওয়ারই সম্ভাবনা। পুয়ান্ডা সুগার মিল স্যাবোটাজের কারণে গত ক'বছর ধরেই লোকসান দিচ্ছিল। চুপ করে থাকল রানা, এতক্ষণে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিল ও।

'আমরা যখন পরস্পরের প্রতি এমন ভীতিকরভাবে সৎ, তোমাকে লাভের পরিমাণ জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। রাসটাফারিয়ানরা আমাদেরকে একেকটা গাড়ির জন্যে পনেরো হাজার ইথিওপিয়ান ডলার দেবে। অবশ্য ওগুলোর পিছনে আরও

কিছু খরচ আছে আমাদের। রঙ লাগাতে হবে, টারিটে থাকবে একটা করে মেশিনগান।'

'এখনও আমি শুনছি,' সোফায় হেলান দিল রানা।

'ক্রেতা আমি ঠিক করছি, ভিকার্স মেশিনগান আমি যোগান দিচ্ছি, যেগুলো ছাড়া গাড়িগুলোর কোন মূল্যই নেই। তোমার রয়েছে গাড়িগুলো এবং ওগুলোকে চালানোর জন্যে কারিগরি দক্ষতা।'

মাইকেল সেভারসের মধ্যে আরেকজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছে রানা। অলস ভঙ্গি, সকৌতুক হাসি, বোকা বোকা ভাব তার চেহারা থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। তার ভাষা এখন কাটা কাটা, শব্দগুলো নির্বাচিত, ম্লান নীল চোখে দস্যুসুলভ আলো ঝিক ঝিক করে উঠছে। আবার মুখ খুলল সে, 'এর আগে কখনও কারও সাথে পার্টনারশিপে ব্যবসা করিনি আমি। সব সময় জানতাম, আমি একাই ভাল করব। তবে এক্ষেত্রে তোমার ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখার এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাইছি না। কেন যেন মনে হচ্ছে আরও অনেক গভীরে তোমার সাথে আমার মধুর এবং সুস্থ কিছু মিল আছে। সত্যি আছে কিনা জানার একটা কৌতূহল হলো। জীবনে এই হয়তো প্রথম এবং শেষবার। তুমি কী বলো?'

'মাইকেল সেভারস্, মনে রেখো, বেঈমানী করলে আমি তোমাকে আগুনে পোড়াব।'

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে উল্লাসে হেসে উঠল মাইকেল। 'তুমি যে তা পারো আমি বিশ্বাস করি, রানা!' সোফা থেকে নেমে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'সমান সমান পার্টনার। তুমি গাড়ি দিচ্ছ, আমি দিচ্ছি মেশিনগান—লভ্যাংশ ভাগ হবে আধাআধি, কী?' উত্তরে তার হাতটা ধরে ঝাঁকাল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল ও।

‘আজকের মত যথেষ্ট ব্যবসা হয়েছে,’ বলল মাইকেল। ‘এসো মেয়েদের ওপর চোখ বুলানো যাক।’

‘বরং, আমি এখন ক্যাম্পে ফিরব।’

বডিতে এঞ্জিন আর রঙ লাগানোর কাজে যথেষ্ট খাটাখাটনি আছে, রানা নিজের ধারণা প্রকাশ করল, সমান অংশীদার হিসাবে কাজটায় নিশ্চয়ই ওকে সাহায্য করবে মাইকেল।

মাইকেলের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি একটা চুরুট ধরাল সে। ‘শোনো, ওল্ড চ্যাপ। সমান অংশীদারিত্বের ব্যাপারটা টেনে খুব বেশি লম্বা কোরো না। গায়ে-গতরে খাটা আমার পোষাবে না, তা ছাড়া এ-ধরনের পরিশ্রম আমার সম্মানের জন্যে হানিকর।’

‘তা হলে আমাকে লোকজন ভাড়া করতে হবে।’

‘গায়ে তেল-কালি মেখে সং সেজে থাকো সেটা আমারও পছন্দ নয়। যাকে খুশি যত খুশি লোক যোগাড় করো।’ উদার ভঙ্গিতে চুরুটটা নাড়ল সে। ‘আমাকে বন্দরে একবার যেতে হচ্ছে, ডকের কিছু অফিসারের মুখ চুম্বন করে আসি, অদূর ভবিষ্যতে কাজে আসবে। আজ সন্ধ্যেয় ব্রিটিশ দূতাবাসে ডিনারেও উপস্থিত থাকতে হবে। ভেবো না নিজের কাজে যাচ্ছি। ওখানে গুরুত্বপূর্ণ কারও সাথে খাতির হয়ে গেলে দু’জনের স্বার্থেই কাজে লাগবে।’

রিকশায় চেপে, পাশে বিয়ারের ভর্তি সিলভারের বালতি সহ, পরদিন সকালে মেহগনি গাছের নীচে রানার ক্যাম্পে হাজির হলো মাইকেল, দেখল ছয়জন লোক নিয়ে গাড়ি রঙ করবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে রানা। রঙটা রানা বেছে নিয়েছে গ্রে, কয়েকটা গাড়িতে প্রথম পোচ লাগানো হয়েছে মাত্র। পরিবর্তনটা অবিশ্বাস্য, বিধ্বস্ত

এবং পরিত্যক্ত আর্মারড কারগুলো অজেয় ওঅর মেশিনে রূপান্তরিত হয়েছে, আনকোরা নতুন এবং বিপজ্জনক।

'মাইরি বলছি,' উৎফুল্ল হয়ে উঠল মাইকেল, 'রাসটারা পাগল হয়ে যাবে।' গাড়িগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে এল সে। 'মাত্র তিনটে রঙ করা হয়েছে। এ-দুটো বাদ পড়ল কেন?'

'তোমাকে আগেই বলেছি। শুধু তিনটে চালানো যাবে।'

'শোনো, ওল্ড চ্যাপ। স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে ইতস্তত কোরো না তো। সব ক'টায় রঙ চড়াও—কীভাবে গছাতে হয় সে আমি দেখব। আমরা কোন গ্যারান্টি দিয়ে মাল সাপ্লাই দিচ্ছি না। কী, ঠিক আছে?'

'না, নেই...,' শুরু করল রানা, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল মাইকেল।

'ভয় পাচ্ছ পরে ওরা আমাদের ধরবে, কী?' উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে একটা চোখ টিপল মাইকেল। 'অভিযোগ যখন উঠবে, ততদিনে আমরা অন্য কোথাও সরে গেছি—ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস না রেখেই।'

প্রস্তাবটা যে রানার নীতিবোধ, বিবেক ইত্যাদির উপর চাপ সৃষ্টি করছে সেটা উপলব্ধি করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল মাইকেলের। হঠাৎ সে লক্ষ করল, রানার কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ।

আধঘণ্টা পরও দেখা গেল ওদের তর্ক থামেনি।

'এ স্রেফ আমার দ্বারা সম্ভব নয়,' চেঁচিয়ে উঠল রানা, বাতিল বাহনগুলোর একটা চাকায় লাথি মারল ও। 'এভাবে মানুষকে ঠকাবার কথা তুমি ভাবতে পারো কীভাবে! অচল জিনিস সচল বলে চালিয়ে দেয়া...'

দ্রুত শিখবার ব্যাপারে মাইকেলের জুড়ি নেই, রানার

মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলবার চমৎকার একটা কৌশল বেছে নিল সে। বুঝতে পারছে, এভাবে চলতে থাকলে দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি বেধে যাবে। হঠাৎ করে কৌশলটা কাজে লাগাল সে। 'শোনো, ওল্ড চ্যাপ,' নরম সুরে বলল, 'নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করার কোন মানে হয় না...'

'আমি চেঁচাচ্ছি না!' গর্জে উঠল রানা।

'না, অবশ্যই না,' প্রায় আদর করবার সুরে রানাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল মাইকেল। 'তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারছি। তুমি ঠিক কথাই বলছ। তোমার মত আমিও কাউকে ঠকাতে চাই না।'

সামান্যই শান্ত হলো রানা, প্রতিবাদে ফেটে পড়বার জন্য আবার মুখ খুলল, কিন্তু ঠোঁট গলে শব্দ বেরুবার আগেই ফাঁকটার ভিতর লম্বা কালো একটা চুরুট ভরে দিল মাইকেল। 'এসো, এবার ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধি খাটাই আমরা, কেমন? প্রথমে আমাকে বলো, কেন চলবে না, বা কী করলে ওগুলোকে সচল করা যায়।'

পনেরো মিনিট পর। তাঁবুর বাইরে সান-ফ্ল্যাপের ছায়ায় বসে বরফ দেওয়া বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ওরা, মাইকেলের নিপুণ দক্ষতায় মধুর বন্ধুত্বসূচক পরিবেশ ফিরে এসেছে আবার।

'একটা স্মিথ-বেন্টলি কারবুরেটর,' চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করল মাইকেল।

'সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করে দেখেছি আমি, কোথাও নেই। এক হতে পারে, অর্ডার দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আনানো—তাও যদি পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকান থেকে কোন সাপ্লাইয়ার যোগাড় করতে পারে। এত পুরনো জিনিস কে রাখতে গেছে!'

'উঁহুঁ, ইংল্যান্ড থেকে আনাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে।

শোনো, ওল্ড বয়। কী করতে হবে, আমি জানি। কাজটা করার জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বড় ঝুঁকি নিতে হবে, তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু আমাদের যৌথ ব্যবসার স্বার্থে কাজটা আমি করব।'

তাঞ্জানিয়ায় ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোকের এক মেয়ে আছে, বাবার বিশাল সয়-সম্পত্তি এবং সম্মানজনক খেতাব থাকা সত্ত্বেও বত্রিশ বছর পেরিয়ে যেতে চলল অথচ আজও তার বিয়ের ফুল ফোটেনি।

আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে এক পলকে কারণটা উপলব্ধি করতে পারল মাইকেল সেভারস্। প্রথম যে বিশেষণটা তার মনে পড়ল সেটা হলো 'ঘোড়ামুখী', কিন্তু না, ঠিক মিলল না বলে মনে হলো মাইকেলের। 'উটমুখী'—হ্যাঁ, উটমুখী বললে চেহারার কাছাকাছি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। দেহ-মন অবশ করা একটা উট, ভাবল সে। চামড়া মোড়া নরম সিটে কাত হয়ে বসে মেয়েটা তার দিকে প্রেম-কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, জবাবে দু'কান বিস্তৃত হাসি হাসছে মাইকেল, ফলে আপনা থেকেই চোখ বুজে আসায় না তাকানোর অজুহাত তৈরি করতে হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে সারাক্ষণ হাসতে থাকায় এরইমধ্যে মুখ ব্যথা করছে তার, তা ছাড়া চোখ বুজে কতক্ষণ একজন মানুষ গাড়ি চালাতে পারে? রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'মেয়ে হিসেবে তোমার কোন তুলনা হয় না। বেড়ানোর জন্যে তোমার বাবার এত শখের গাড়িটা আমার হাতে তুলে দিয়েছ, কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!'

রোমান্স বা রোমাঞ্চ যাই হোক, তার প্রতিক্রিয়া, এরকম আগে কখনও হতে দেখেনি মাইকেল। মেয়েটা কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল, হলুদ কোদালগুলো বের করে, যেন কেউ তাকে অবিরাম

কাতুকুতু দিচ্ছে।

'তুমি জানো, তোমার বাবাকে আমি হিংসা করি? কোথাও যদি পাই, এ-ধরনের পুরনো একটা গাড়ি অবশ্যই আমি কিনব, দেশে ফিরে।' মেইন রোড ছেড়ে ধুলো ঢাকা পথ ধরল মাইকেল, পামগাছের মাঝখান দিয়ে সাগরের কিনারা ঘেঁষে বহুদূর চলে গেছে। বাঁক নেওয়ার সময় একজন পুলিশ এমব্যাসীর নাম্বার প্লেট চিনতে পারল, ঝট করে সিধে হয়ে স্যালুট করল সে। মার্জিত ভঙ্গিতে আলগোছে হ্যাটের কিনারা ছুঁলো মাইকেল, একটা ঢোক গিলে লক্ষ করল, দূতাবাসে গাড়িতে উঠবার পর থেকে মুহূর্তের জন্যও তার মুখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি চিরকুমারী মেয়েটা।

'সামনে চমৎকার একটা স্পট আছে–নির্জন। কিছুক্ষণের জন্যে ওখানে আমরা থামতে পারি।'

এত জোরে ঘাড় ঝাঁকাল মেয়েটা, মাইকেলের সন্দেহ হলো ওটা না মাথা সহ ছিঁড়ে পড়ে। কোন কথাই বলছে না ওর সঙ্গিনী, সম্ভবত বিপুল উল্লাস আর অবিশ্বাস নিজের উপর আস্থাহীন করে তুলেছে তাকে, ভয় পাচ্ছে কথা বলতে চেষ্টা করলে চিঁ চিঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বেরুবে না। সেজন্য মাইকেল অবশ্য কৃতজ্ঞ, এবং তার কৃতজ্ঞতা মিটিমিটি হাসি হয়ে ফুটে বেরুল। সাড়া পাচ্ছে মনে করে বেগুনি হয়ে গেল সঙ্গিনীর চেহারা, ঠোঁটের ফাঁকে আবার বেরিয়ে পড়ল হলুদ কোদালগুলো।

ওর চোখ দুটো সুন্দর, নিজেকে সান্ত্বনা এবং অভয় দেওয়ার চেষ্টা করল মাইকেল–অবশ্য তোমার যদি উটের চোখ পছন্দ হয়। একজোড়া বিষণ্ন সাগর, বড় বড় পাতা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মাইকেল, শুধু চোখ দুটোর দিকে তাকাবে সে, এড়িয়ে যাবে দাঁতগুলোকে। আকস্মিক উদ্বেগের একটা আঁচ অনুভব করল সে।

নাজুক, সংকটময় মুহূর্তে মেয়েটা কামড়ায় না তো? ওই ধারাল কোদাল গুরুতর জখম করতে পারে! মুহূর্তের জন্য পরিকল্পনাটা বাতিল করে দেওয়ার কথা ভাবল সে। তারপর কল্পনার সাহায্যে নিজেকে দেখাল থরে থরে সাজানো রয়েছে ইথিওপিয়ান ডলার, সঙ্গে সঙ্গে সাহস ফিরে পেল সে।

ব্রেক করল মাইকেল, বাঁকটা কোথায় খুঁজল। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা, পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। গাড়ি নিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো।

অবশেষে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে থামল বেন্টলি। চারপাশে উঁচু ঝোপ, মাথার উপর পাম গাছের ডাল, খুব কাছে থেকে সাগরের ভোঁতা গর্জন ভেসে আসছে, আশপাশে লোকবসতি বা লোকজনের আনাগোনা নেই।

'দেখো কাণ্ড, সত্যি পৌঁছে গেছি আমরা, কী?' সঙ্গিনীর দিকে ফিরল মাইকেল, মুখে চোখ বোজা হাসি। 'ঘাড়টা যদি একটু বাঁকাও, বোধহয় সাগরও দেখতে পাবে।'

সামনের দিকে ঝুঁকে সাগরের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে সে, অ্যামব্যাসাডরের মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। মাইকেলের সর্বশেষ সচেতন চিন্তা ছিল, অবশ্যই তাকে দাঁতের কামড় এড়াতে হবে।

নতুন রঙ করা ঝকঝকে বিশাল বেন্টলি যতক্ষণ না ঝাঁকি খেতে শুরু করল, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, ওটাকে ঢেউয়ের উপর লাইফবোটের মত দুলতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও, হাতে ক্যানভাস ব্যাগ। মাথা নিচু করে বনেটের কাছে চলে এল, এঞ্জিন কাউলিং খুলবার সময় শব্দ হলেও গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ফোঁস-ফাঁস আর নাকিসুরে ফোঁপানির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সব। ইচ্ছাকৃতভাবে নয়,

দুর্ঘটনাবশত উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ভিতরে একবার চোখ পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আতংকে কুঁকড়ে গেল ও, দৃশ্যটা জীবনে কখনও ভুলবে না–মেয়েটার সরু সাদা পা, লম্বা আর হাড্ডিসার, গাঁটগুলো উটের পায়ের মত শক্ত আর বেঢপ, ক্যাবের সিলিঙে অবিরত লাথি মারছে। তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে একটা ঢোক গিলল ও। এই প্রথম দুঃখ হলো মাইকেলের জন্য।

কাজটা দ্রুত শেষ করল রানা, কারবুরেটর হাতে চলে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গাড়ির ভিতর ধস্তাধস্তির আওয়াজ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। আর্মারড কারগুলো রঙ করবার কাজে মাইকেল ওকে সাহায্য করেনি বলে রাগ হয়েছিল রানার, হঠাৎ করে সেই রাগটা পানি হয়ে গেল। এই মুহূর্তে মাইকেল সেভারস্ যে গাধার খাটনি খাটছে, তার তুলনায় গাড়ির পেছনে যে-কোন অমানুষিক পরিশ্রম তাৎপর্যহীন বলে মনে হবে।

গোটা কারবুরেটর অ্যাসেম্বলি ক্যানভাস ব্যাগে ভরে নিয়ে পিছু হটতে শুরু করল রানা। হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল বেন্টলি, তীক্ষ্ণ একটা শেষ চিৎকারের পর অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল। ঝোপের আড়ালে পৌঁছে সিধে হলো রানা। ভাড়া করা রিকশাটা আধ মাইল দূরে রেখে এসেছে ও।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, এই অসুস্থ শরীরে হেঁটে বাড়ি ফিরতে জান বেরিয়ে গেছে আমার। সেই সাথে মহিলাকে বিশ্বাস করাতে হয়েছে, গাড়ির ভেতর ঘটনাটা বাগদানের কোন অংশ ছিল না।'

'অকুতোভয় বীরত্ব দেখানোর জন্যে অবশ্যই তোমাকে পদক দেয়া হবে,' প্রতিশ্রুতি দিল রানা, আর্মারড কারের হাউজিঙ থেকে

ক্রল করে বেরিয়ে এল ও। 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে আদর্শের ধ্বজাধারী মেজর মাইকেল সেভারস্ একাই দুর্গম দুর্গের দিকে ধাবিত হন, শত্রুহননে চরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বধ করেন...'

'প্রচণ্ড কৌতুককর,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল মাইকেল। 'কিন্তু মনে রেখো, লোকজনকে না ঠকানোর ব্যাপারে তোমার যেমন একটা সুখ্যাতি আছে তেমনি আমারও একটা সুনাম আছে। এই ঘটনা যদি ফাঁস হয়ে যায়, নির্দিষ্ট একটা মহলে আমার মাথা কাটা যাবে। কথা দিতে হবে, ওল্ড চ্যাপ। স্পিকটি নট, কী?'

'কথা দিলাম,' আন্তরিকতার সঙ্গে বলল রানা, ক্র্যাঙ্ক, হ্যান্ডেল ঘোরাবার জন্য ঝুঁকল। প্রথমবার ঘোরাতেই স্টার্ট নিল এঞ্জিন, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করবার পর নিঃশব্দে হাসল রানা। 'শুনতে পাচ্ছ, মাইকেল? এঞ্জিনের এই মিষ্টি গান তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়?'

নরকতুল্য দৃশ্যটার কথা স্মরণ করে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়বার ভঙ্গি করল মাইকেল, হেসে উঠল রানা।

'চার চারটে লৌহমানবী। জীবনের কাছ থেকে আর কী আশা করো তুমি?'

'পাঁচটা,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মাইকেল, ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা। 'পাঁচ নম্বরটা আমার নামে বিক্রি হবে,' মিনতির সুরে আবার বলল সে। 'তোমার সুখ্যাতি রক্ষার জন্যে আমার নিজের প্যাডে লিখব, ওটা আমি বিক্রি করেছি, কী?' কথা না বললেও রানার গম্ভীর চেহারা জবাবের জন্য যথেষ্ট। 'না?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইকেল। 'এই আমি বলে রাখলাম, তোমার মান্ধাতা আমলের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দু'জনকেই প্রতিমুহূর্তে বিপদে ফেলবে।'

'আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি।'

‘স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, ওল্ড চ্যাপ।’ ঘন ঘন মাথা নাড়ল মাইকেল। ‘একটা কথা বোধহয় ঠিক, অচল মাল দিলে রাসটারা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। ওরা আবার তরোয়াল ব্যবহার করে, আর ওটা দিয়ে ওরা শুধু মাথাই কাটে না—অন্তত তাই শুনেছি। থাক, পাঁচ নম্বরটা গছাবার দরকার নেই।’

মাসের বাইশ তারিখে ‘একের বুন’ নোঙর ফেলল দার-এস-সালাম বন্দরে, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক বার্জ আর লাইটার ছেঁকে ধরল জাহাজটাকে। সাউদাম্পটন থেকে রওনা হয়ে কেপ টাউন, ডারবান ঘুরে দার-এস-সালাম এসেছে একের বুন, জিবুতি পর্যন্ত যাবে।

প্রথমশ্রেণীর দুটো স্যুইট আর পাঁচটা ডাবল কেবিন প্রিন্স হাসান সালে হারারির দখলে রয়েছে, কয়েকজন সঙ্গী-সহকারীকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ সফর শেষ করে ফিরছে সে। প্রিন্স হাসান সালে একজন রাসটাফারিয়ান, সম্রাট হাইলে সেলাসি কর্তৃক নিযুক্ত পাহাড় এবং মরু অধ্যুষিত বিশাল এক ভূখণ্ডের শাসক তার বাবা। শিফটাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, এবং সম্রাটের দৃষ্টি তথা আর্থিক ও সামরিক সাহায্য আদায়ে ব্যর্থ হয়ে চাঁদা সংগ্রহের জন্য পশ্চিমা দুনিয়ার কাছে ধরনা দিতে গিয়েছিল প্রিন্স, দীর্ঘ তিন মাসের সফর আংশিক সফল হওয়ায় দেশে ফিরবার পথে দার-এস-সালামে যাত্রাবিরতি, উদ্দেশ্য গোপনে কিছু অস্ত্র কেনা। প্রিন্সের পশ্চিমা দেশগুলো সফর করবার পিছনে শুধু আর্থিক সহায়তা লাভই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, শিফটাদের ঘন ঘন হামলায় কীভাবে তার গোত্রের লোকজন প্রাণ এবং সম্পদ হারাচ্ছে তার একটা ছবি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বলা যায় সংবাদমাধ্যমগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হয়েছে

সে, যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত একটি পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতাকে তার সঙ্গে পাঠানো হয়েছে সরেজমিনে পরিস্থিতি জরিপ করবার জন্য। এই সংবাদদাতার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সরকার এবং সাহায্যদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করবার পরিকল্পনা রচনা করবে, সে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে তাকে। তবে, এক অর্থে, মন ভেঙে গেছে প্রিন্সের। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তার গোত্রকে শিফটাদের হামলা থেকে রক্ষার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করতে রাজি হয়নি কেউ। সবার ধারণা, সম্রাট এই মুহূর্তে নিজের সিংহাসন রক্ষায় এতই ব্যস্ত যে এ-ধরনের অনুরোধে তিনি কান দেবেন না। মন খারাপের আরেকটা কারণ, পশ্চিমা দুনিয়ার কোন সরকার অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়নি তাকে, এবং বিভিন্ন বেসরকারী সূত্র থেকে যে চাঁদা পাওয়া গেছে তা দিয়ে চোরা বাজার থেকে খুব বেশি কিছু কেনাও যাবে না।

জেটি থেকে একটা হুড খোলা কারে চড়ল প্রিন্স, অপরটায় উঠল তার সঙ্গী-সাথীরা। ওগুলো কে পাঠিয়েছে এই মুহূর্তে ঠিক জানা নেই প্রিন্সের, ড্রাইভারদের কাছ থেকে শুধু জানা গেল ডকে অপেক্ষা করছেন স্যার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

স্যার অর্থাৎ মেজর মাইকেল সেভারস্ তার নবীন বন্ধু মাসুদ রানাকে নিয়ে চার নম্বর ওয়্যারহাউসে অপেক্ষা করছে, ড্রাইভারদের আগেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সে।

'মনে আছে তো, ওল্ড চ্যাপ? কথা বলার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবে তুমি, কী?' বিশাল ওয়্যারহাউসের ভিতর আলো খুব কম, আগ্রহ এবং উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছে ওরা। 'মারমুখো গাম্ভীর্য থাকবে তোমার চেহারায়। জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে দেখানোর দায়িত্ব তুমি নিতে চাইছ, বেশ নাও, কিন্তু দেখো,

আবার ডুবিয়ো না।'

'তোমাকে না বললাম, ভাড়াটে সৈনিক হিসেবেও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে,' রানা গম্ভীর এবং মারমুখো।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি রানাকে শান্ত করল মাইকেল। 'মোট কথা, প্রিন্সকে মুগ্ধ করতে হবে। তুমি ভাড়াটে সৈনিকই হও বা গুপ্ত পুলিসই হও, সে-ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা এই কারণে নেই যে তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি।'

আবছা অন্ধকারে হাসি গোপন করতে রানাকে বেগ পেতে হলো না।

ম্লান নীল ট্রপিক্যাল সুট পরেছে মাইকেল, বোতামের গর্তে ঝুলছে তাজা একটা গোলাপ। তার টাইটা আড়াআড়িভাবে ডোরা কাটা। লালচে সোনালি চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, আজ সকালে সুন্দর করে গোঁফও ছেঁটেছে সে। বন্ধু রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকাল, সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ঠোঁটে। নিজের পকেট থেকে একশো শিলিং খরচ করে ওকে নতুন একটা সুট বানিয়ে দিয়েছে সে, অবশ্য তারপরই ওর কাছ থেকে ধার করেছে দুশো শিলিং, ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ জানাতে ভুলে গেছে। রানার পায়ের জুতোটা পুরানো হলেও, সদ্য পালিশ করা, নতুনের মতই ঝকঝক করছে। তবে অনেক বলেও চুল ছাঁটাতে পারেনি, ঝাঁকড়া হয়ে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে। যদিও নিজের গরজেই হাত আর নখের ভিতর থেকে গ্রিজের সব দাগ পরিষ্কার করে ফেলেছে রানা।

'ওরা সম্ভবত ইংরেজি জানে না,' বলল মাইকেল। 'প্রয়োজনে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে হতে পারে। রাগ কোরো না, এখনও সময় আছে–তুমি রাজি হলে পাঁচ নম্বরটা ওদেরকে

অনায়াসে গছানো যায়।' রানার চেহারা দেখে একটা হাত তুলল। 'থাক, এ-প্রসঙ্গ থাক।' কান খাড়া করল সে, এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। 'ওই বোধহয় আসছে ওরা। সব মনে আছে তো, কী?'

ওয়্যারহাউসের সামনে প্রখর রোদের মধ্যে থামল গাড়ি দুটো, কিচিরমিচির করতে করতে নামল আরোহীরা। সাদা ঢোলা আলখাল্লা পরে আছে চারজন, অনেকটা প্রাচীন রোমানদের পরিধেয় টোগা-র মত দেখতে, কাঁধের উপর থেকে ভাঁজ হয়ে নেমে এসে পা ঢেকেছে। আলখাল্লার নীচে গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার আর খোলা স্যান্ডেল। সবাই তারা বয়স্ক লোক, মুখে বলিরেখা, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল। কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙল না, সবাই সসম্ভ্রমে ঘিরে দাঁড়াল পশ্চিমা ধাঁচে তৈরি গাঢ় রঙের সুট পরা দীর্ঘদেহী যুবককে। তাদেরকে নিয়ে ওয়্যারহাউসের আবছা অন্ধকারে প্রবেশ করল যুবক। নিয়ে যাচ্ছে মাইকেল সেভারসের কাছে।

লম্বায় প্রিন্স হাসান সালে ছ'ফুটের বেশি হবে, কাঁধ দুটোয় পণ্ডিতসুলভ ঝুঁকে থাকা ভাব। গাঢ় মধু রঙের চামড়া, চকচকে চোখা নাক আর চিন্তামগ্ন বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকবার প্রবণতা সত্ত্বেও তার হাঁটবার ভঙ্গির মধ্যে একজন দক্ষ অসিযোদ্ধার সৌষ্ঠব আর মাধুর্য ফুটে বেরুল, হাসতে শুরু করায় গাঢ় চামড়ার মাঝখানে ঝিক্ করে উঠল সাদা দাঁত।

'খোদার কসম,' বলল হাসান সালে, তার ইংরেজি উচ্চারণ ভঙ্গি হুবহু মাইকেলের সঙ্গে মিলে যায়, গলার আওয়াজটাও একই রকম দরাজ, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি? উলঙ্গ সেভারস্ না?'

মাইকেলের অভিজাত গম্ভীর চেহারা থেকে মার্জিত ভাবভঙ্গি মোমের মত গলে পড়তে শুরু করল। তোতলাচ্ছে সে, যদিও শুধু ঠোঁটই নড়ছে, গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না, সেই সঙ্গে

মনে পড়ে গেছে শেষবার বিশ বছর আগে শোনা নিজের ডাকনাম। হোস্টেলের খালি কামরায় দিগম্বর সেজে যে-ই না পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতে যাবে মেয়েটাকে, জানালার বাইরে থেকে একদল ছাত্র অমনি শেয়াল-কুকুরের ডাক ছাড়তে শুরু করল, সেই সঙ্গে তুমুল হাততালি। কলেজ ছাড়বার পর গত বিশ বছরে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি সে ওই ডাকনাম আবার তাকে শুনতে হবে। শেয়াল-কুকুরের ডাকগুলো প্রচণ্ড ঘুসির মত আঘাত করেছিল তাকে, এতদিন পর আবার সেই একই ঘুসি খেলো সে।

প্রিন্স হাসান সালে উল্লাসে হেসে উঠল, হাত তুলে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল নেকটাইয়ের নট। এই প্রথম লক্ষ করল রানা, মাইকেলের গলাতেও হুবহু ওই জিনিস শোভা পাচ্ছে।

'ইটন, বিশ বছর আগে। হাউজের ক্যাপটেন ছিলাম আমি। ক্লাসে সিগারেট খাওয়ার অপরাধে সাজা দিয়েছিলাম তোমাকে, মনে নেই?'

'মাই গড,' হাঁপিয়ে উঠল মাইকেল। 'চকলেট সালে! মাই গড! আমি ভাষা হারিয়ে ফেলছি!'

'তা হলে সাংকেতিক ভাষায় চেষ্টা করে দেখো,' ফিসফিস করল রানা।

'শাট আপ, ড্যাম ইউ,' হিসহিস করে উঠল মাইকেল, তারপর অনেক কষ্টে চেহারায় ফুটিয়ে তুলল তার স্বভাবজাত ভুবনভোলানো হাসি, প্রায় অন্ধকার ওয়্যারহাউসে যেন নতুন সূর্য উঠল। 'ইওর এক্সেলেন্সি–চকলেট–মাই ডিয়ার ফেলো।' ছুটল সে, হাতটা সামনে বাড়ানো। 'কী পরম আনন্দ, কী অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য!'

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে করমর্দন করল ওরা, দুই পুরানো বন্ধুর

পুনর্মিলনের দৃশ্য চাক্ষুষ করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উপদেষ্টাদের ভাবগম্ভীর কালো চেহারাগুলো অকস্মাৎ ফুটিফাটা হয়ে উঠল।

'এসো, আমার পার্টনার, ভারতীয় মি. মাসুদ রানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। মি. রানা একজন এঞ্জিনিয়ার এবং ফাইন্যানসার—রানা, ইনি হিজ এক্সেলেন্সি হাসান সালে, শোয়ার ডেপুটি গভর্নর, এবং আমার প্রাচীন ইয়ার-বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়।'

প্রিন্সের হাত সরু, ঠাণ্ডা ও শক্ত। মাইকেলের দিকে ফিরবার আগে তার দৃষ্টি এক পলকে রানার অন্তরের অন্দরমহল পর্যন্ত যেন দেখে নিল। 'কবে যেন তোমাকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়?' জিজ্ঞেস করল সে। 'চুয়ান্ন, নাকি পঞ্চান্ন সালের গ্রীষ্মে? সেবারও একটা চাকরানীর ওপর চড়াও হয়েছিলে, এটুকু বেশ মনে করতে পারি...।'

'গুড লর্ড, নো!' মাইকেল আতংকিত। 'চাকরানীর ওপর ওই একবারই, হোস্টেল রুমে। তুমি আসলে হাউজ মাস্টারের মেয়ের কথা বলছ...'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, ঠিক। হোস্টেলের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাওয়াতেই তো নামটা দেয়া হলো তোমাকে...ছেলেরা বোধহয় তোমার কাপড়চোপড় সব সরিয়ে রেখেছিল, তাই না? ঘণ্টা কয়েক উলঙ্গ থাকতে হয়েছিল তোমাকে। তুমি চলে আসার পরও অনেক দিন ছেলেরা তোমার কথা ভোলেনি। শুনেছিলাম সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলে, সেখান থেকেও নাকি তোমাকে...।'

হঠাৎ ঝুঁকে প্রিন্স হাসান সালের গালে চুমো খেলো মাইকেল, কারও মুখ বন্ধ করতে হলে এরচেয়ে ভাল অস্ত্র আর হতে পারে না। 'তুমি আমার পরাণের দোস্ত...।'

প্রিন্স হাসান জানতে চাইল, 'তারপর থেকে কী করছ তুমি, ওল্ড চ্যাপ?'

মাইকেলের জন্য প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে বিব্রতকর। উদার ভঙ্গিতে হাতের চুরুটটা নাড়ল সে। 'এটা-সেটা, বোঝোই তো। একটা না একটা। ব্যবসা আর কী। আমদানী-রফতানী, বেচা-বিক্রি।'

'সেই সূত্রেই আমরা আবার মিলিত হলাম, তাই না?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল প্রিন্স।

'ঠিক তাই,' বলে প্রিন্সের একটা হাত ধরল মাইকেল। 'এখন যখন জানি কে আমার ক্রেতা, উন্নতমানের জিনিস সাপ্লাই দিতে পারছি বলে আনন্দের পরিমাণ বেড়ে গেল আমার।'

ওয়্যারহাউসের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে কাঠের বাক্সগুলো সুন্দর করে সাজানো রয়েছে।

'চোদ্দটা ভিকার্স মেশিনগান, বেশিরভাগ সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে আনা হয়েছে–বলতে পারো ব্যারেল থেকে এখনও কোন গুলি বেরোয়নি।'

বাক্সগুলোর সামনে দিয়ে এগোল ওরা, থামল সর্বশেষ বাক্সটার কাছে, ওটা খুলে বের করা হয়েছে একটা মেশিনগান, তেপায়ার উপর ফিট করে রাখা হয়েছে।

প্রিন্সের সঙ্গী পাঁচজন ইথিওপিয়ানই অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধা, মেশিনগানটার দিকে সবাই তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'দেখতেই পাচ্ছ, সবগুলো ফার্স্টক্লাস জিনিস।' রানার দিকে চট করে একবার তাকিয়ে একটা চোখ টিপল মাইকেল। 'একশো চুয়াল্লিশটা লী-এনফিল্ড রাইফেল–এখনও গ্রিজ লেগে রয়েছে–,' প্রদর্শনের জন্য মাত্র ছ'টা রাইফেল পরিষ্কার করা হয়েছে।

ওদের কাছে সাতরাজার গুপ্তধনে ঠাসা গুহা হয়ে উঠল চার

নম্বর ওয়্যারহাউস। বয়স্ক যোদ্ধারা ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা ভুলে পচা আবর্জনালোভী কাকের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্রগুলোর উপর, তেলমাখা ঠাণ্ডা ইস্পাতগুলোকে ব্যগ্রতার সঙ্গে হাতে তুলে নিয়ে আদর করতে শুরু করল, ভিজিয়ে দিল চুমোয় চুমোয়, অ্যামহারিক ভাষায় কিচিরমিচির করছে। তাদের একজন মেশিনগানের পিছনে দাঁড়াল, পরনের আলখাল্লা হাঁটুর উপর তোলা, হঠাৎ ঝুঁকে তেপায়ার উপর ঘোরাতে শুরু করল মেশিনগানটা, মুখ দিয়ে গুলিবর্ষণের আওয়াজ ছাড়ল, অবিরাম হাসছে।

এমনকী প্রিন্স হাসান সালেও ইটোনিয়ান ভব্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে ভিড়ে গেল, সত্তর বছরের এক যোদ্ধাকে কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে লী-এনফিল্ড তুলে গুলিবর্ষণ করবার কৃত্রিম মহড়া দিতে শুরু করল—কাল্পনিক শত্রুদের পাইকারী হাতে নিধন করছে। ঠিক সময়মত নাক গলাল মাইকেল।

'বলছিলাম কী, চকলেট, ওল্ড চ্যাপ—তোমার জন্যে এগুলোই আমার সব উপহার নয়। আসল জিনিস সবশেষে দেখাব বলে রেখে দিয়েছি।' আলখাল্লা পরা শ্মশ্রুমণ্ডিত উপদেষ্টাদের এক জায়গায় জড়ো করতে তাকে সাহায্য করল রানা, তারপর পথ দেখিয়ে ওয়্যারহাউস থেকে বের করে এনে সবাইকে তুলল খোলা গাড়ি দুটোয়।

মটর শোভাযাত্রা শহর ছেড়ে মেহগনি বনে ঢুকল, প্রথম গাড়িতে মাইকেল, রানা ও প্রিন্স রয়েছে। রানার ক্যাম্পের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় চাঁদোয়া আর রঙিন ছাতা টাঙানো হয়েছে, নীচে কাপড় ঢাকা দুটো টেবিল, টেবিলে সিটি হোটেলের প্রায় সব উপাদেয় খাবারই পরিবেশনের অপেক্ষায়। আরও আছে রূপালি বালতি ভরা বিয়ার ও শ্যাম্পেন। পরিবেশন শুরু করবার অপেক্ষায় মাথায় ফেজ টুপি আর সাদা আচকান পরা ওয়েটাররা অদূরে

দণ্ডায়মান।

খরচের প্রশ্ন তুলে এই আয়োজনে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল রানা, কিন্তু মাইকেল তার প্রতিবাদে কান দেয়নি। তার যুক্তি ছিল, 'বলতে পারো এক ধরনের জুয়া খেলছি। মুসলমান, মদ খায় না, কিন্তু যদি খায়–পেটভরে খাওয়াও। ভুলে যেয়ো না কয়েকশো গুণ দাম চাইব গাড়িগুলোর, মাতাল ছাড়া ওই দামে কে ওগুলো কিনতে চাইবে? তা ছাড়া, ওরা তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করে বলে ওদের সাথে আমরা তো আর বার্বারদের মত আচরণ করতে পারি না! সব কাজের একটা স্টাইল আছে। স্টাইল অ্যান্ড টাইমিং–জীবন তো এই দুটোর নির্যাস বৈ কিছু নয়, কী?'

অনুমতির ধার না ধেরে প্রিন্স আর তার সঙ্গীরা বালতি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল শ্যাম্পেনের বোতলগুলো। হাতে গ্লাস নিয়ে ছুটে এল ওয়েটাররা, কিন্তু বৃথাই, সরাসরি বোতল থেকে খেতেই পছন্দ করল তারা। বিশেষ করে প্রিন্সকে অনবরত উৎসাহ দিয়ে চলেছে মাইকেল।

আধ ঘণ্টা পর আস্ত রোস্ট করা একটা বাচ্চা ছাগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অতিথিরা। ভূরিভোজনের সঙ্গে এখনও মদ্যপান চলছে সমানে। রানা বা মাইকেল, দু'জনের কেউই খুব বেশি পান করেনি, তবু পরস্পরকে প্রায়ই সতর্ক করে দিচ্ছে ওরা, 'অ্যাই, মাত্রা ছাড়িয়ো না!'

হাতের বোতল মুখের কাছে তুলে প্রিন্স সালে চেঁচিয়ে বলল, 'সম্রাট হাইলে সেলাসির শুভবুদ্ধির উদ্দেশে!'

রানার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করল মাইকেল, 'শালাকে আরও খাওয়াতে হবে, দেখছ না নিজের সমস্যার কথা এখনও ভোলেনি!' সিধে হয়ে প্রিন্সের হাতে আরেকটা বোতল

ধরিয়ে দিল সে, নিজের হাতের গ্লাস উঁচু করে ঘোষণা করল, 'রানী এলিজাবেথের উদ্দেশে।'

এরপর রানার পালা, 'ব্রিটিশ দূতের মেয়ের উদ্দেশে।'

প্রতিটি ঘোষণার সঙ্গে এক দফা করে পানীয় পান করল অতিথিরা।

'উলঙ্গ সেভারস্,' ফিসফিস করল রানা, 'এবার থামাতে হয়, কী বলো?'

'শোনো, ওল্ড চ্যাপ,' গম্ভীর সুরে বলল মাইকেল, 'ওই নামটা উচ্চারণ না করলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব। ডিসটেস্টফুল, কী?' রানার কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারল, কিন্তু লাগল না–টলছে সে। রানার নিষেধ সত্ত্বেও যথেষ্ট গিলেছে।

'অনেক হয়েছে, মাইকেল, এবার ইতি করো!'

প্রিন্সের দিকে ফিরল মাইকেল। 'চকলেট, ওল্ড স্পোর্ট–এবার চলো, শেষ চমকটা দেয়া যাক তোমাকে।' তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিল সে, কব্জি ধরে টেনে নিয়ে চলল। 'এসো সবাই। এদিকে, ভায়েরা।'

বিশেষ করে যাদের পাকা দাড়ি তারাই পান-ভোজনের রমরমা আসর ছেড়ে নড়তে চাইল না, দলটাকে খেদিয়ে মেটে পথে নামিয়ে আনতে রানার সাহায্য লাগল মাইকেলের। তাকে হেই, হো ইত্যাদি ডাক ছাড়তে শুনে হাসি চেপে রাখা দায় হলো রানার। অবশেষে একশো গজের মত এগিয়ে ঝোপের পাঁচিল ভেদ করল ওরা, সামনে বেশ বড়সড় একটা খোলা মাঠ।

লৌহমানবীদের দিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ পাথর হয়ে গেল দলটা। নতুন ধূসর রঙ রোদ লেগে ঝলমল করছে, পোর্ট থেকে বেরিয়ে আছে ভয়াল-দর্শন ভিকার্স মেশিনগান, বুদ্ধি করে চারটে আর্মারড কারের মাথায় একটা করে ইথিওপিয়ান পতাকা উড়িয়ে

দিয়েছে মাইকেল।

ওদেরকে দেখে মনে হলো কেউ জেগে নেই, ঘুমের মধ্যে হাঁটছে। এগিয়ে গিয়ে ছাতার নীচে ফেলা চেয়ারগুলোয় বসল সবাই, কারও চোখে পলক নেই। স্কুল মাস্টারের মত তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল, যদিও এখনও সে একটু একটু টলছে।

'ভদ্রমহোদয়গণ, এখানে আমরা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের প্রদর্শনী দেখতে পাচ্ছি, নিঃসন্দেহে বলা যায় বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলোও এত উন্নতমানের আর্মারড ভেহিকেল ব্যবহারের সুযোগ পায়নি–,' প্রিন্স হাসান সালে তার বক্তব্য অনুবাদ করতে শুরু করল, এই ফাঁকে রানার দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল সে, বলল 'স্টার্ট দাও, ওল্ড বয়!'

প্রথম এঞ্জিন গর্জে উঠতেই বয়োবৃদ্ধ উপদেষ্টারা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল সবাই। তারপর তারা পালা করে পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল।

'একেকটা পনেরো হাজার পাউন্ড স্টার্লিং,' রানার কানে ফিসফিস করে বলল মাইকেল, ক্রেতাদের উৎসাহের মাত্রা লক্ষ করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সে, রানার সঙ্গে পরামর্শ না করেই। 'নেবে, ওরা নেবে!'

প্রিন্স হাসান সালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ডিনার খেতে এসেছে ওরা একের বুনে। একই সুট দ্বিতীয়বার পরে প্রিন্সের সামনে হাজির হওয়া ঠিক হবে না, তাতে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবার সম্ভাবনা, এই যুক্তিতে তাড়াহুড়ো করে রানাকে আরও একটা ডিনার জ্যাকেট বানিয়ে দিয়েছে মাইকেল, এবারও দুশো শিলিং ধার চাইতে ভুল

হয়নি তার।

রানার মন খুঁতখুঁত করছে, ভাল ফিট করেনি গায়ে।

ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাসল মাইকেল। 'জানো, তোমাকে একজন ডিউকের মত লাগছে দেখতে? এত দিনে তোমার মধ্যে একটা স্টাইল দেখতে পাচ্ছি আমি। স্টাইল, ওল্ড চ্যাপ, সব সময় মনে রাখবে। স্টাইল! দেখে যদি মনে হয় তুমি লোকটা গরীব, লোকজন তোমার সাথে নোংরা আচরণ করবে।'

প্রিন্স হাসান সালে সাদা আলখাল্লা পরেছে; তাতে সোনালি, বেগুনি আর কালো এমব্রয়ডারির কাজ করা, গলার কাছে গাঢ় লাল রঙের একটা পদ্মরাগমণি ঝুলছে। আলখাল্লার ভিতর পরেছে আঁটসাঁট ভেলভেট পা'জামা, পায়ে চব্বিশ ক্যারেট সোনার তার জড়ানো স্যান্ডেল। ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে তার নিজস্ব স্যুইটে। প্রচুর সময় নিয়ে খাওয়াদাওয়ার পালা চুকল। মস্ত একটা ঢেকুর তুলে মাইকেলের দিকে ফিরল সে।

'এবার, মাই ডিয়ার সেভারস্,' বলল প্রিন্স, ভব্যতার খাতিরেই মাইকেলের কষ্টার্জিত ডাকনামটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেনি সে। 'মেশিনগান আর অন্যান্য অস্ত্রের দাম কয়েক মাস আগেই ঠিক করা হয়েছে, কিন্তু চিঠিপত্রে কখনোই তুমি আর্মারড কারগুলোর কথা উল্লেখ করোনি। ওগুলোর দাম সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারো?'

'ইওর এক্সেলেন্সি, তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগে ন্যায্য একটা দাম আমি ভেবে রেখেছিলাম–,' প্রিন্সের একটা হাভানা চুরুটে কষে দম দিল মাইকেল। 'কিন্তু ক্রেতা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ায় কেনা দামে ওগুলো বিক্রি করতে হবে আমাকে।' ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে। 'না, অসম্ভব! বন্ধুর কাছ থেকে আমি কোন লাভ করতে পারব না।' রানার দিকে তাকাল সে। 'ওকে আমি বুঝিয়ে-

শুনিয়ে ম্যানেজ করব। তা নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

খুশি হয়ে হাসল প্রিন্স।

তাকে খুশি হতে দেখে দাম আরও বাড়িয়ে দিল মাইকেল। 'প্রতিটি বিশ হাজার পাউন্ড,' দ্রুত বলল সে, শব্দগুলো জড়িয়ে গিয়ে অর্থটা যাতে একটু দেরিতে বোধগম্য হয়। তারপরও হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলো রানা।

চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স। 'আচ্ছা,' বলল সে। 'দামটা সম্ভবত ন্যায্যমূল্যের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি চাইছ।'

মাইকেলের চেহারায় ব্যথা ও বিস্ময় ফুটে উঠল। 'ইওর এক্সেলেন্সি...'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল প্রিন্স। 'গত তিন মাস ধরে বিভিন্ন ধরনের সামরিক ইকুইপমেন্ট দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্লিজ, সেভারস্, প্রতিবাদ করে আমাদের দু'জনকেই অপমান কোরো না।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এল, গিটারের তারের মত উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশ।

অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিন্স। 'যেগুলো দেখে এসেছি তার দাম দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তবু আমি ওগুলো কিনতে পারি না। আমার মহামান্য সম্রাট গোত্রগুলোর জন্যে অস্ত্র কেনা নিষিদ্ধ করেছেন। মুশকিল হলো, ওরা বেচতে রাজি কিন্তু জায়গামত ডেলিভারি দিতে রাজি নয়।' তার চোখে বিষণ্ন ভাব। 'আপনারা জানেন, অস্ত্রগুলো যেখানে আমার দরকার সেখানে কোন সাগর নেই। ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার অংশ হলেও, সেখানে শিফটাদের শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অস্ত্র পরিবহন সম্ভব নয়, অন্তত আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সোমালিদের চোখকেও ফাঁকি দেয়া যাবে না।' আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের গ্লাসে মৃদু চুমুক দিল সে।

তার অজান্তে রানা আর মাইকেল মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। নতুন, এবং উৎকট একটা বিপদের আভাস পাচ্ছে ওরা।

'মেজর সেভারস্, তুমি আমাকে ভাঙাচোরা, বাতিল কিছু অস্ত্র কেনার প্রস্তাব দিচ্ছ, দাম চাইছ প্রকৃত মূল্যের পাঁচগুণ। এই মুহূর্তে আমি ভারি অসহায় বোধ করছি। মরিয়া না হয়ে আমার কোন উপায় নেই। তোমার প্রস্তাব এবং মূল্য আমাকে মেনে নিতে হবে।'

সামান্য স্বস্তি ফিরে পেয়ে রানার দিকে তাকাল মাইকেল।

'হ্যাঁ, ব্রিটিশ স্টার্লিঙেই পেমেন্ট করা হবে তোমাকে−তোমার এই শর্তটাও আমি মেনে নিচ্ছি।'

এতক্ষণে হাসল মাইকেল। 'মাই ডিয়ার ফেলো−,' শুরু করল সে, কিন্তু আবারও হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল প্রিন্স।

'তোমার অনেক শর্ত, কিন্তু আমার মাত্র একটা,' বলল হাসান সালে। 'এটার ওপরই নির্ভর করছে অস্ত্রগুলো আমি কিনব কিনা। ওগুলো ইথিওপিয়ায়, আমার এলাকায়, পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাদের। আমার কাছে বা আমার নির্বাচিত এজেন্টের কাছে অস্ত্রগুলো ডেলিভারি দেয়ার পর পেমেন্ট পাবে তোমরা।'

'গুড গড, ম্যান!' ফেটে পড়ল মাইকেল। 'কী বলছ তুমি নিজেও জানো না! কয়েকশো মাইল দুর্গম এলাকা, চারদিকে শত্রু গিজগিজ করছে, তার ভেতর দিয়ে আমরা ওগুলো স্মাগল করে নিয়ে যাব? এমন আস্ত উন্মাদ তো দেখিনি!'

'উন্মাদ, মেজর সেভারস্? ভেবে দেখো। ওগুলো এখানে ডেলিভারি নিলেই লোকে বরং আমাকে উন্মাদ বলবে, তাই না? আরও ভাবো। দার-এস-সালামে ওগুলো না আমার কোন কাজে আসবে, না তোমার। দুনিয়ায় এমন কোন বোকা নেই যে ওগুলো

কিনতে চাইবে তোমার কাছ থেকে। শত্রু এলাকার ভেতর দিয়ে ওগুলো আমি নিয়ে যেতে পারব না, কারণ শিফটাদের গুপ্তচররা আমার ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছে। জিবুতিতে নামার সাথে সাথে সার্চ করা হবে আমাকে। অপরদিকে, এখানে পড়ে থাকলে ওগুলোর কোন মূল্যই নেই।' থেমে মাইকেলের দিকে, তারপর রানার দিকে তাকাল সে।

চোয়ালে আঙুল বুলিয়ে রানা বলল, 'আপনার যুক্তি বুঝতে পারছি, মি. সালে।'

'আপনি বুদ্ধিমান, মি. রানা,' বলল প্রিন্স, আবার সে মাইকেলের দিকে তাকাল। 'ইথিওপিয়ায় পৌঁছে দাও, একেকটার জন্যে বিশ হাজার পাউন্ড পাবে তুমি। এখানে ফেলে রাখো, মরচে ধরে নষ্ট হবে। কী করবে সেটা তোমার ব্যাপার। কী বলো? না হয় পৌঁছেই দাও ইথিওপিয়ায়।'

চার

'লোকটাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম!' উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে মাইকেল রানার ক্যাম্পের সামনে। 'কল্পনাও করিনি পুরনো ইটোনিয়ান একজন বন্ধু এভাবে আমার সাথে বেঈমানী করবে! এ তো স্রেফ চুক্তিভঙ্গ!'

'তোমার বন্ধু তোমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে,' বলল রানা।

উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না মাইকেল। চুপচাপ খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'রানা, কী ঠিক করলে? কাল সকালে চকলেটকে কী বলব আমরা? চার চারটে আর্মারড কার কীভাবে আমরা শত্রু উপকূলে নিয়ে যাব, বলতে পারো? ওখানেই সমস্যার শেষ নয়। দুশো মাইল মরু পেরিয়ে পৌঁছে দিতে হবে ইথিওপিয়ায়...'

ভুরু কুঁচকে কী ভাবছে রানা, জবাব দিল না। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে মাটিতে বিছানো বড়সড় একখানা ম্যাপের দিকে।

'রানা,' বলল মাইকেল, 'একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, তাড়াতাড়ি। আমরা যাব, নাকি যাব না?' ম্যাপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে, তারপর দেখাল, হাজার মাইল লম্বা সুরক্ষিত কোস্ট লাইন, ম্যাপের গায়ে আঙুল বুলিয়ে উপকূল রেখা চিহ্নিত করল মাইকেল। 'জাহাজ ভেড়াতে হবে ইরিত্রিয়া উপকূলের কোথাও, ওখান থেকে ইথিওপিয়ায় অর্থাৎ রাসটাদের এলাকায় পৌঁছুতে হলে মরু পেরোতে হবে। মরু মানে ফাঁকা জায়গা, বহুদূর থেকে লোকে আমাদের দেখতে পাবে। তবে আশার কথা ওদিকে লোকবসতি নেহাতই কম।'

'পথে যাদের সাথে দেখা হবে বেশিরভাগ সম্ভাবনা, তারা মানুষখেকো না হলেও অসভ্য,' মন্তব্য করল রানা।

'তারমানে আমরা যাচ্ছি না, কী?'

‘তুমি জানো, যাচ্ছি।’

‘হ্যাঁ, জানি আমরা যাচ্ছি। আশি হাজার ব্রিটিশ স্টার্লিং সেই কথাই বলে।’

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল প্রিন্স হাসান সালে, জিজ্ঞেস করল, ‘কীভাবে যাওয়া হবে ঠিক করেছ? ইচ্ছে করলে আমার পরামর্শ নিতে পারো তোমরা। উপকূল, আর উপকূল থেকে ভেতর দিকের সবগুলো পথ সম্পর্কে জানি আমি।’ একজন উপদেষ্টাকে ইঙ্গিত করতে টেবিলের উপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে দিয়ে গেল।

‘আমরা দার-এস-সালামে একটা জাহাজ ভাড়া করব বলে ভেবেছি,’ বলল রানা। ‘জাহাজ আমাদেরকে,’ ম্যাপের গায়ে এক জায়গায় আঙুল রাখল ও, ‘এখানে কোথাও নামিয়ে দেবে। আর্মারড কারে বাক্সগুলো ভরা হবে, ট্যাংকে থাকবে যথেষ্ট গ্যাসোলিন, সরাসরি ইনল্যান্ডের দিকে যাব আমরা, সামনে কোথাও আপনার লোকদের সাথে মিলিত হব–জায়গাটা আগেই ঠিক করা থাকবে।’

‘গুড,’ বলল প্রিন্স। ‘বেসিক আইডিয়াটা ঠিক আছে। লোহিত সাগরে পৌঁছে কোথায় নোঙর ফেলবেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। সোমালি প্রজাতন্ত্র এড়িয়ে যেতে পারলে সব দিক থেকে ভাল, ওদের উপকূলে কড়া পাহারা আছে। ফ্রেঞ্চ জিবুতির কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলতে হবে।’

অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হলো। রানা এবং মাইকেল দু’জনেই উপলব্ধি করল, বাধাগুলোকে হালকাভাবে নিয়েছিল ওরা, প্রিন্সের পরামর্শ খুব কাজে এল ওদের।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে জাহাজ ভেড়ানোর জন্য একটা জায়গা বাছল প্রিন্স। 'ওদিকের উপকূলে নোঙর ফেলতে হলে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই, ঢেউগুলো এককেটা বিশ ফুট উঁচু, পানির নীচে পাথুরে স্তরগুলোও অনুকূল নয়।' ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখল সে। 'এখানে, জিবুতি থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, প্রাচীন একটা হারবার আছে, নাম মণ্ডি। না, চার্টে মার্ক করা নেই। জাঞ্জিবার আর মোজাম্বিক দ্বীপের মত মণ্ডিও এককালে ক্রীতদাস ব্যবসার একটা কেন্দ্র ছিল।'

'হারবারটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না?'

'না। কারণ বিশুদ্ধ পানির অভাব। যদিও গভীর একটা ওয়াটার চ্যানেল আছে, তীরে পৌঁছুনোর পথটাও বেশ নিরাপদ–পানির নীচে পাথর কম। তবে জাহাজ থেকে কার্গোগুলো নামাবার জন্যে ক্রেন ইত্যাদির সাহায্য পাবেন না।'

একের বুনের একটা নোটবুকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো টুকে নিচ্ছে মাইকেল, রানা ঝুঁকে আছে ম্যাপের উপর। 'পুলিস পেট্রল এদিকটায় কী রকম?' জিজ্ঞেস করল ও।

কাঁধ ঝাঁকাল প্রিন্স। 'জিবুতি সরকার উট ব্যবহার করে, মাঝে মধ্যে উপকূল এলাকায় দেখা যায় ওগুলোকে। দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে খুবই কম।'

'এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে আমার না খুব ভাল লাগে,' মাইকেলের কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরল।

'তীরে নামলাম, তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ম্যাপে চোখ রাখল প্রিন্স। 'আপনারা তারপর সাবেক ইটালিয়ান ইরিত্রিয়া সীমান্ত ধরে এগোবেন, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এক সময় জলাভূমি দেখতে পাবেন, যেখানে অ্যাওয়াস নদী মরুভূমিতে শুকিয়ে গেছে। ওখান থেকে সরাসরি পশ্চিম দিকে মুখ

করে এগোবেন, পেরিয়ে আসবেন সোমালি সীমান্ত, সেই সাথে ঢুকে পড়বেন ইথিওপিয়ার ডানাকিল প্রদেশে। আমার লোকেরা আপনাদের সাথে দেখা করবে এখানে–,' বয়স্ক উপদেষ্টাদের দিকে ফিরে কিছু প্রশ্ন করল সে। উচ্চস্বরে আলোচনা চলল বেশ কিছুক্ষণ অ্যামহারিক ভাষায়। তারপর ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে আবার রানার দিকে ফিরল সে।

'আমরা একমত হয়েছি, সাক্ষাৎটা হবে ওয়েলস অভ চাল্ডি-তে–এখানে।' ম্যাপটা আবার সে দেখাল ওদের। 'দেখতেই পাচ্ছেন, জায়গাটা ইথিওপিয়ার বেশ খানিকটা ভেতরে। আমার গোত্রের জন্যে এই ডেলিভারি পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কারগুলো সারডি গিরিপথ আর ডেসিগামী পথটার প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করা হবে।' উপদেষ্টাদের একজন প্রিন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আবার ওদের দিকে ফিরল হাসান সালে। 'আমার উপদেষ্টা জানালেন, মণ্ডি থেকে ওয়েলস অভ চাল্ডি পর্যন্ত আপনাদের যাত্রা মরুর ওপর দিয়ে হবে, ওখানে কোন পথ চিহ্ন নেই। কোথাও কোথাও গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। এলাকাটা সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এমন একজন গাইড পেলে সুবিধে হবে আপনাদের...।'

'খুব ভাল হয়,' বলল রানা। 'তেমন কেউ আছে?'

'চুক্তিভঙ্গ করলেও, লোক তুমি খারাপ নও,' বিড়বিড় করে উঠল মাইকেল।

'যাকে আপনাদের সাথে পাঠাব বলে ভাবছি সে আমার আত্মীয়–ভাইপো। তিন বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়েছে, ভাল ইংরেজি জানে। আপনাদের পথটাও চেনে সে, ওদিকে অনেকবার সিংহ শিকার করতে গেছে।' একজন উপদেষ্টাকে অ্যামহারিক ভাষায়

কিছু বলল সে। উপদেষ্টা কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। 'আমার ভাইপো আসছে। ওর নাম আব্বাস খায়ের।'

আব্বাস খায়েরের বয়স হবে আঠারো কি উনিশ, যদিও এরই মধ্যে সে তার চাচার মতই লম্বা হয়ে উঠেছে, চেহারায় আদিবাসী যোদ্ধার ছাপ থাকা সত্ত্বেও আচরণে অত্যন্ত মার্জিত। পরেও আছে পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক, চোখ দুটো মায়া ভরা, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় জ্বলজ্বল করছে। নিজেদের ভাষায় কিছু কথা বলল চাচা-ভাতিজা, তারপর ভাতিজা ওদের দিকে ফিরল।

'আমাকে কী করতে হবে চাচার কাছ থেকে শুনলাম,' তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং আগ্রহে ভরপুর। 'আপনাদের কাজে লাগার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।'

'গাড়ি চালাতে জানো?' ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসল আব্বাস খায়ের। 'জানি, স্যার। আদ্দিস আবাবায় আমার নিজের একটা স্পোর্টস কার আছে।'

তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'দ্যাটস গ্রেট। তবে আর্মারড কার চালানো একটু কঠিন।'

'আব্বাস ওর ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করবে,' বলল প্রিন্স। 'মনে আছে তো, জাহাজ রওনা হবে দুপুরে।' চাচার উদ্দেশে বাউ করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল আব্বাস খায়ের।

'উপকারের বিনিময়ে উপকার, এটাই দুনিয়ার নীতি,' বলল প্রিন্স, গম্ভীর দৃষ্টিতে মাইকেলের দিকে তাকাল সে। 'এইমাত্র তোমার একটা উপকার করেছি আমি, সেভারস্। বিনিময়ে আমার একটা পাওনা হয়েছে।'

দর কষাকষিতে প্রিন্সের সঙ্গে হেরে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে মাইকেলের, তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করল সে, 'দেখো

চকলেট, ওল্ড চ্যাপ...।’

কিন্তু প্রিন্স নিজের কথা বলে চলল, যেন কেউ তাকে বাধা দেয়নি, ‘তোমাকে আমি আগেই বলেছি, আমার গোত্রের জন্যে যে-সব অস্ত্র দরকার তার মধ্যে বিশ্ব-বিবেকও একটা।’

‘কিন্তু সমস্যার আকৃতি-প্রকৃতি ক্ষুদ্র হলে বিশ্ব-বিবেক কান্নাকাটি করে না,’ মন্তব্য করল রানা। ‘আবার কান্নাকাটি করলেও তাতে সাধারণত কোন কাজ হয় না।’

‘না, তা হয় না, জানি,’ একমত হলো প্রিন্স। ‘তাই বলে আমরা তো আর চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। আমাদের সমস্যার কথা দুনিয়াকে আমরা জানাতে চাই। আশা করি তাতে খানিকটা হলেও চাপ সৃষ্টি হবে সম্রাটের ওপর। সে-কথা ভেবেই আমেরিকার সেই নামকরা সাংবাদিককে সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি। তিনি যে পত্রিকায় কাজ করেন, সারা দুনিয়ায় তার অজস্র পাঠক আছে। তিনি নিজে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর একজন শুভানুধ্যায়ী, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তিনি আমার বন্ধুও বটেন।’

‘কে তিনি?’ উত্তেজিত হয়ে উঠল মাইকেল। ‘সংক্ষেপে ব্যাপারটা কী? অস্ত্রের চোরাচালান সম্পর্কে কতটুকু কী জানেন? চকলেট সালে, তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমাদের জেল খাটাতে চাও?’

‘বললাম না, তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?’ হাসল প্রিন্স, তারপরই তার চেহারা গম্ভীর হলো। ‘আদ্দিস আবাবায় সম্রাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাড়তে থাকায় কর্তৃপক্ষ বিদেশী সাংবাদিকদের ইথিওপিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমি যে উপকারটা চাইছি...’

‘জানি কী চাইছ,’ তাকে বাধা দিয়ে বলল মাইকেল। ‘কিন্তু না,

সম্ভব নয়। এমনিতেই হাজারটা বিপদ মাথায় করে যেতে হবে, তার ওপর উটকো আরেকটা ঝামেলা কাঁধে নিতে পারব না…।'

'সে কি গাড়ি চালাতে পারে, আর্মারড কার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শেষ গাড়িটার জন্যে একজন ড্রাইভার লাগবে আমাদের।'

'তাই তো!' মাইকেলের রাগ খানিকটা পড়ল।

'তাকেই জিজ্ঞেস করা যাক,' বলল প্রিন্স, তার ইঙ্গিতে একজন উপদেষ্টা কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

আলোচনার বিরতিতে সুযোগটা নিল মাইকেল, প্রিন্সের কনুই খামচে ধরে দল থেকে সরিয়ে আনল একপাশে। 'অতিরিক্ত যে খরচ হবে তার একটা হিসেব করেছি আমি–জাহাজ ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি খাতে। পুঁজির ওপর অপ্রত্যাশিত চাপ পড়ছে কি না, তাই ভাবছিলাম তোমাকে বিশ্বস্ততা প্রমাণের সুযোগ দেয়ার জন্যে অল্প কিছু টাকা অগ্রিম চাইব কিনা…।'

'মেজর সেভারস্, আমার ভাইপোকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে তা আমি এরইমধ্যে প্রমাণ করেছি…।'

'সেটা যে আমি বুঝতে পারছি না তা নয়…,' তর্কটাকে টেনে লম্বা করতে যাচ্ছিল মাইকেল, কিন্তু কেবিনের দরজা খুলে যাওয়ায় বাধা পেল সে, দেখল সাংবাদিক ভিতরে ঢুকছে। টান টান হলো মাইকেল, টাইয়ের নটটা স্পর্শ করল। ভোরের প্রথম সূর্যের মত ঝলমলে হাসি ফুটল তার মুখে।

চার্ট টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে নেতিয়ে ছিল রানা, চুরুট ধরাবার জন্য দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলেছে, কিন্তু ধরানো আর হলো না। জ্বলন্ত কাঠির কথা ভুলে আগন্তুকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ও।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' বলল প্রিন্স। 'মিস অ্যানি উইসপারের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।

অ্যানি উইসপার, আমেরিকান প্রেসের স্বনামখ্যাত একজন সদস্যা, এবং আমাদের গোত্রের একজন সদয় বন্ধু।'

অ্যানি উইসপারের বয়স এখনও পঁচিশ পেরোয়নি। আশ্চর্য আকর্ষণীয় তার চেহারা, এই পেশায় ঠিক যেন মানায় না। অবশ্য অনেক আগেই উপলব্ধি করেছে সে, অল্প বয়স আর নারীসুলভ সৌন্দর্য তার বেছে নেওয়া পেশায় কোন সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না, কাজেই এ-দুটোই সে গোপন করবার চেষ্টা করে, যদিও সাফল্যের পরিমাণ সামান্যই।

পুরুষদের মত শার্ট পরে আছে সে, হালকা খাকী সামরিক রঙ, এখানে সেখানে অনেক পকেট। দু'দিকে দুটো বোতাম লাগানো বুক পকেট, সুগঠিত স্তনের উঁচু রেখা গোপন করা যায়নি তাতে। পরনের ট্রাউজারেও অনেক পকেট, সেটাও একই রঙের, সরু কোমর জড়িয়ে আছে চওড়া চামড়ার বেল্ট। পায়ে হালকা বুট। চুলগুলো টেনে তোলা হয়েছে মাথার উপর দিকে, ফলে লম্বা ঘাড় নগ্ন হয়ে পড়েছে। রেশমি কোমল চুল, হালকা সোনালি, পাকা গমের মত গায়ের রঙের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গেছে।

ধাক্কাটা প্রথম সামলে উঠল মাইকেল। 'মিস অ্যানি উইসপার, অফকোর্স! তোমার কিছু কিছু লেখা আমি পড়েছি। অবজারভারে কিছুদিন নিয়মিত কলাম লিখতে তুমি।' তার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল অ্যানি উইসপার, ভুবনভোলানো সেভারস্-হাসি মেয়েটার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। তার চোখ, মাইকেল লক্ষ করল, ম্লান সবুজ—বড়বড় চোখে সিরিয়াস দৃষ্টি, সরাসরি তাকানোর প্রবণতা।

দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা আঙুলের ডগা পুড়িয়ে দিল, ব্যথায় উফ্ করে উঠল রানা। অ্যানি উইসপার দ্রুত ফিরল ওর দিকে।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি কোন মেয়ে আশা করিনি।'

'মেয়ে তুমি পছন্দ করো না?' শুকনো পাতার সঙ্গে পাতার ঘষা লাগলে যে খসখসে শব্দ হয়, গলার আওয়াজ অনেকটা সেরকম; রানার গা শিরশির করে উঠল।

'রানা? মেয়ে পছন্দ করে কিনা?' দরাজ গলায় হাসল মাইকেল। 'আরে, ও তো একটা ছেলেমানুষ! টানা-হ্যাঁচড়া করেও কোথাও নিয়ে যেতে পারি না...।' হঠাৎ উপলব্ধি করল মাইকেল, হিতে বিপরীত ঘটে যাচ্ছে, মেয়েটার কাছে নিজের চরিত্র তুলে ধরছে সে। চুপ করে গেল, ইচ্ছে হলো নিজের গালে চড় মারে।

'পছন্দ করি,' শান্তভাবে জবাব দিল রানা, 'পছন্দ করার মত হলে।' লক্ষ করল, মেয়েটা বেশ লম্বা, প্রায় ওর কাঁধ পর্যন্ত। দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে অ্যাথলেটিক ভাবটুকু ভাল লাগল ওর। চিবুক উঁচু হয়ে আছে, মুখ আর চোয়ালের রেখাগুলোয় আলাদা ধরনের সৌষ্ঠব দৃষ্টি কাড়ে, ঠিক ধারাল নয়—স্পষ্ট। 'সত্যি কথা বললে কেউ যদি কিছু মনে না করে, তোমাকে অপছন্দ করবে এমন পুরুষ খুব কমই আছে।'

এই প্রথম হাসল মেয়েটা। স্বতঃস্ফূর্ত, উষ্ণ হাসি। রানা দেখতে পেল, অ্যানি উইসপারের সামনের সারির একটা দাঁত অসমান, লাইন থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। হতভম্ব হয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে ছিল ও, হঠাৎ খেয়াল হতে একটু অপ্রতিভ হলো, দৃষ্টি রাখল সবুজ চোখে।

সবুজ চোখে সোনালি একটু আভাও দেখতে পেল ও। 'তুমি গাড়ি চালাতে জানো?' সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করল ও।

'জানি,' আবার শব্দ করে হাসল অ্যানি উইসপার। 'সেই সাথে আমি ঘোড়া আর সাইকেলেও চড়তে পারি, স্কি করতে পারি, প্লেন

চালাতে জানি, কার আর ব্রিজ খেলতে জানি, গান গাই, নাচি, পিয়ানো বাজাই।’

‘চলবে,’ তার সঙ্গে রানাও যোগ দিল হাসিতে। ‘তাতেই আমার চলবে।’

প্রিন্সের দিকে ফিরল অ্যানি উইসপার। ‘ব্যাপারটা কী বলো তো, সালে?’ জিজ্ঞেস করল সে। ‘আমার অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এই দুই ভদ্রলোকের কী সম্পর্ক?’

একেরবুন তার নোঙর তুলল। আপার ডেকে দীর্ঘদেহী প্রিন্স দাঁড়িয়ে আছে, দু’পাশে সাদা আলখাল্লা পরা উপদেষ্টারা। জাহাজের গতি বাড়তে শুরু করল, একটা হাত তুলে বিদায় জানাল হাসান সালে।

ধীরে ধীরে দিগন্তরেখায় অদৃশ্য হয়ে গেল একেরবুন। প্রথম কথা বলল রানা, ‘অ্যানি উইসপারের জন্যে একটা ঠাঁই খুঁজে বের করতে হবে।’ চিন্তাটা জাগতেই, ওরা দু’জনেই, রানা ও মাইকেল, একযোগে হাত বাড়াল অ্যানি উইসপারের ব্যাগ আর টাইপরাইটার কেসের দিকে।

‘টস করি এসো,’ প্রস্তাব দিল মাইকেল, ভোজবাজির মত তার হাতে একটা তাঞ্জানিয়ান শিলিং বেরিয়ে এল।

‘টেইলস,’ বলল রানা।

শিলিংটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তালি মারবার ভঙ্গিতে দুই তালুর মাঝখানে সশব্দে গ্রহণ করল সেটা মাইকেল, হাত খুলল। ‘ব্যাড লাক, ওল্ড চ্যাপ,’ সহানুভূতি জানাল মাইকেল, পকেটে চালান করে দিল শিলিংটা। ‘মিস অ্যানি উইসপারের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি ওর একটা জুতসই ব্যবস্থা করে জাহাজের খোঁজে বেরুব।

ইতিমধ্যে তুমি আবার মন খারাপ করে বসে থেকো না, বরং গাড়িগুলো আরেকবার চেক করে নাও।' কথা বলবার ফাঁকে হাতছানি দিয়ে একটা রিকশা ডাকল সে। 'মনে রেখো, রানা, শক্ত রাস্তায় চালিয়ে ওগুলোকে হারবারে আনা এক কথা, আর দুশো মাইল মরু পাড়ি দেয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা।' অ্যানি উইসপারের হাত ধরে মার্জিত ভঙ্গিতে বাউ করল সে, তাকে রিকশায় উঠতে সাহায্য করল। 'ড্রাইভার, অ্যাডভান্স।' বিজয়ীর হাসি হেসে রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল।

'মনে হচ্ছে আমরা একা হয়ে গেলাম, স্যার,' আব্বাস খায়ের বলল।

'হুম!' এখনও রানা দ্রুত অপসৃয়মান রিকশার দিকে তাকিয়ে আছে।

'যাই, আমাকেও একটা ঠাঁই খুঁজে নিতে হবে...।'

'আমার সাথে চলো, আব্বাস। এই ক'টা দিন তাঁবুতে থাকতে পারবে।' হঠাৎ হাসল রানা, 'যদি বলি তোমার বদলে তাঁবুতে অ্যানি উইসপারকে পেলে খুশি হতাম, আশা করি দুঃখ পাবে না?'

হেসে ফেলল ছেলেটা। 'আপনার মনের কথা বুঝতে পারি...কিন্তু অ্যানি সম্ভবত নাক ডাকে, স্যার।'

'যে মেয়ে দেখতে অত সুন্দর সে নাক ডাকতে পারে না,' জ্ঞানদানের সুরে বলল রানা। 'আরেকটা কথা, আমাকে তুমি স্যার স্যার করবে না, নার্ভাস বোধ করি। আমার নাম মাসুদ রানা, নাম ধরে ডাকতে না পারলে মাসুদ ভাই বলতে পারো।' আব্বাসের একটা ব্যাগ তুলে নিল ও। 'চলো হাঁটি।'

মেহগনি বনে ঢুকবার মুখে রানা জিজ্ঞেস করল, 'বলছিলে তোমার একটা স্পোর্টস কার আছে।'

'আছে, মাসুদ ভাই।'

‘জানো, কী ওটাকে চালায়?’

‘ইন্টারন্যাল কমবাসশন এঞ্জিন।’

আব্বাসের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। ‘এইমাত্র তোমাকে সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হলো—আস্তিন গুটাও।’

নিজের ফাঁদে মেয়েদের ধরবার জন্য মেজর মাইকেল সেভারসের রয়েছে নিজস্ব একটা কৌশল, যা গত বিশ বছরে একবারও পরিবর্তন বা সংশোধন করবার কারণ দেখেনি সে। মেয়ে মাত্রই অভিজাত পুরুষের সঙ্গলোভী, তারা শক্তের ভক্ত, বাস্তবতা এবং দারিদ্র্য তাদের দুচোখের বিষ, মিষ্টি কথা আর বড়লোকি চালচলন দিয়ে তাদেরকে সহজেই কাবু করা যায়। একটা মেয়ে যতই কিনা কঠোরভাবে নিজেকে গার্ড দিয়ে রাখুক, এই সব অস্ত্রশস্ত্র ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে দুর্গ অরক্ষিত হয়ে পড়তে বাধ্য, বিজয় কেতন উড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া তখন পানির মত সহজই শুধু নয়, আনন্দময় অভিজ্ঞতাও বটে। গদি মোড়া রিকশায় উঠে আর দেরি করল না মাইকেল, সে তার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সবটুকু হাসি আর মার্জিত আচরণের মায়াজাল বিস্তার করবার কাজে নেমে পড়ল।

কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কণ্টকাকীর্ণ সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক বৃত্তে যে মেয়ে পঁচিশে পা দেওয়ার আগেই নাম কিনেছে, লক্ষণ দেখে পরিস্থিতি আঁচ করতে পারা তার জন্য কঠিন কিছু নয়, এবং এমনও নয় যে দুনিয়ার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ। পরিচয় হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে মাইকেল সেভারস্ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা পেয়ে গেছে অ্যানি উইসপার। পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা, মার্জিত হাস্যরস, দরাজ কণ্ঠস্বর, উদার ভাবভঙ্গি,

আভিজাত্যের গর্ব, চোখে ইস্পাতের মত চকচকে দৃষ্টি—এ-সব বহু পুরুষের মধ্যেই দেখেছে সে। পাজি এবং দুর্বৃত্ত হিসাবেই তাদেরকে চেনে অ্যানি উইসপার। মাইকেলের সঙ্গলাভ করবার পর প্রতিটি মুহূর্ত তার সন্দেহ দৃঢ় হতে লাগল, এ-ও তাদেরই দলে, হয়তো সবার মধ্যে সেরা একজন, পাজিদের শিরোমণি। তবে পাজি হলেও, সুদর্শন পাজি। তাকে মুগ্ধ করবার জন্য বক বক করে চলেছে মাইকেল, অ্যানি ভাবছে শতকরা কত ভাগ গাল-গল্প আর কত ভাগ সত্যি। শুনছে আর কৌতুক বোধ করছে সে।

'কর্নেলের কথা বলছি, আমার বাবা...,' বলল মাইকেল। সত্যি কর্নেল হয়েই মারা গেছেন ভদ্রলোক, তবে তিনি কর্নেল ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিস বাহিনীতে।

'হুঁ-হুঁ,' প্রতিটি নতুন বিষয়ে কথা শুরু করলেই মাইকেলকে উৎসাহ দিচ্ছে অ্যানি উইসপার।

'বলাই বাহুল্য, পারিবারিক বিশাল জমিদারী আর সম্পত্তি আমার হাতে আসে মায়ের তরফ থেকে...,' মাইকেলের মা ছিল ব্যর্থ এক মুদির মেয়ে।

'হুঁ-হুঁ।'

'আমি যে ইটনে পড়াশোনা করব সে তো জানা কথা—পারিবারিক ঐতিহ্য, বুঝতেই পারছ!' মাইকেলের চোদ্দপুরুষের কেউ ইটনে কেন, কোন কলেজেই পড়াশোনা করেনি। তাকে ইটনে ভর্তি করা হয়েছিল পরিবারের খুদ-কুঁড়ো যা ছিল সব বিক্রি করে, বখাটে ছেলেকে মানুষ করবার জন্য সেটাই ছিল মা-বাবার সর্বশেষ ব্যর্থ চেষ্টা।

'ফরেন সার্ভিসে ছিলেন বাবা, ভারি রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। বীরত্ব আর আদর্শ তাঁর রক্তের প্রধান উপাদান ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছ থেকেই ওগুলো পেয়েছি আমি। বিশ্বাস করবে,

ভদ্রলোক ডুয়েল লড়ে জীবনের ইতি ঘটান?' আসলে ভারত ভাগ হওয়ার আগে আত্মহত্যা করেন ভদ্রলোক, কারণ ঘুষ খেয়ে ধরা পড়বার পর বিচারের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন।

'তাই?'

'ইটন ছাড়তে হলো আমাকে, স্বভাবতই–বিশাল সম্পত্তি আর জমিদারী দেখাশোনা করার জন্যে।' ইটন ছাড়তে হয়েছিল হাউজ মাস্টারের মেয়ের সঙ্গে কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়ায়।

'তারপর সেনাবাহিনীতে নাম লেখালাম। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ট্রেনিং শেষ করার পর বড় কোন যুদ্ধে ব্রিটেন নামল না, তাই তেমন বীরত্ব দেখানোর সুযোগও আমার ঘটেনি। কবে যুদ্ধ বাধবে সেই আশায় বসে না থেকে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করলাম।' অনিয়ম, বিশৃংখলা, গাফিলতি ইত্যাদির দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, এই খবর পেয়ে অসুস্থতার অজুহাতে চাকরি ছেড়ে দেয় সে।

'তারপর থেকে আমি স্বাধীন, নিজের ব্যবসা করছি,' বলে চলল মাইকেল। 'পারিবারিক সম্পত্তি নিইনি, তুমিও স্বীকার করবে একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের জন্যে তা নেয়া অসম্মানজনক, তাই না? তবে আছে, সবই আমার ফিরে যাবার অপেক্ষায় সাজানো গোছানো আছে। ভাল একটা মেয়ে পেলে সুস্থির হয়ে ঘর-সংসার করব না, এমন কথা জোর গলায় বলতে পারি না। মধ্যপ্রাচ্যে আমার রয়েছে ব্যবসায়িক সুনাম,' কয়েকটা দেশে ওর নামে হুলিয়া আছে। 'আফ্রিকাতে রয়েছে বিরাট স্বার্থ।' এই মুহূর্তে প্রায় কপর্দকহীন সে। 'আর রক্তে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।' এতক্ষণে একটা সত্যি কথা বলল বটে।

সতর্ক থাকা সত্ত্বেও, খানিকটা মুগ্ধ হলো অ্যানি উইসপার।

তার জানা আছে, এ হলো মুরগির সামনে কেউটের নৃত্য, ছোবল দেওয়ার আগের মুহূর্ত। তার পেশাই তাকে দুনিয়ার সংকটবহুল এলাকাগুলোয় নিয়ে গেছে, সে-সব জায়গায় এ-ধরনের লোক ভূরি ভূরি দেখেছে সে। এরা উত্তেজনা আর বিপদ ভালবাসে, জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করতে চায়, কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের শেষ পরিণতি হয় বেদনামলিন।

কিন্তু হুঁ-হুঁ করা ছাড়া সাড়া দিল না অ্যানি উইসপার। জানে, এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামবে মাইকেল সেভারস্, কোন আশা নেই বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র মাইকেল সেভারস্ নয়। সিটি হোটেলের সামনে রিকশা যখন থামল, তখনও পুরোদমে বক বক করে চলেছে সে। শুনতে শুনতে হাসি চেপে রাখা দায় হলো অ্যানি উইসপারের। রিকশা থেকে নামবার সময় নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। খিলখিল করে হেসে ফেলল, মাথাটা ঝাঁকি খাওয়ায় তার সোনালি চুল উড়তে শুরু করল বাতাসে।

মেয়েদের হাসির মাপ নিতে জানে মাইকেল সেভারস্। হাসি যদি মিষ্টি, গভীর আর দীর্ঘস্থায়ী হয়, বুঝতে পারে অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে গেছে। রিকশা থেকে নেমে অ্যানি উইসপারের কব্জি চেপে ধরল সে, যেন মহামূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজের হেফাজতে নিয়ে এল।

'সিটি হোটেলে একটাই মাত্র স্যুইট। আমারই দখলে, স্বভাবতই। ঝুল-বারান্দা থেকে বাগান দেখা যায়, সন্ধ্যের দিকে সাগরের বাতাস পাবে। আর বিছানাটা এত নরম, মনে হবে তুমি মেঘের ওপর শুয়ে আছ। একা শোয়ার অভিজ্ঞতা এক রকম, কাউকে নিয়ে শোয়ার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে।'

'আমাকে কি এখানেই থাকতে হবে?' ছোট্ট খুকির সরলতা

নিয়ে প্রশ্ন করল অ্যানি উইসপার।

'ভাবছি দু'জনেরই যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে নেয়া কঠিন হবে না,' বলল মাইকেল। 'ও-সব তুমি ভেবো না, আয়োজনটা কী হবে আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

অ্যানির মনে কোন সন্দেহ নেই, কী ধরনের আয়োজন করবার কথা ভাবছে মাইকেল। 'তোমার খুব দয়া, মেজর,' বিড়বিড় করে বলল সে, ধীর পায়ে টেলিফোনটার দিকে এগোল। রিসিভার তুলে বলল, 'অ্যানি উইসপার বলছি। মেজর সেভারস্ তাঁর স্যুইট খালি করছেন। রুম-সার্ভিস পাঠিয়ে তার জিনিস-পত্র অন্য কোথাও সরাবার ব্যবস্থা করুন, প্লিজ।'

'বলছিলাম কী...,' মুখের হাঁ তাড়াতাড়ি বন্ধ করে শুরু করল মাইকেল।

মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে মিষ্টি করে হাসল অ্যানি উইসপার। 'সত্যি তুমি মহৎ পুরুষ, মেজর। মেয়েদের জন্যে ক'জন আজকাল এমন আত্মত্যাগ করতে জানে?' তারপর সে মুখ ফিরিয়ে টেলিফোনে কথা বলল, 'কী বললেন? আর কোন ভাল কামরা নেই? খালি বলতে শুধু সিঁড়ির তলাটা? কী আর করা, একটা কাপড় টাঙিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করুন...কী বললেন? ভাঙা একটা চৌকি ছাড়া বিছানা করার মত কিছু নেই? ঠিক আছে, ঠিক আছে–মি. সেভারস্ কিছু মনে করবেন না–ধারণা করি, আমার জন্যে উনি কষ্টটুকু সানন্দে মেনে নেবেন।'

সিঁড়ির তলায় ওটা কামরা নয়, কবুতরের খোপের চেয়েও খারাপ। চৌকির উপর শুয়ে আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল মাইকেল, 'সানন্দে মেনে নিতে পারছি কই!'

পাঁচ

পরবর্তী তিন দিন বন্দরে কাটাল মাইকেল, হারবার মাস্টারের অফিসে বসে চা খেলো, প্রতিটি সদ্য নোঙর ফেলা জাহাজের পাইলটের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করল। সারা দিন ঘর্মাক্ত কলেবরে কাজে ব্যস্ত থাকলেও, সন্ধ্যার দিকে ফিটফাট বাবু সেজে অ্যানি উইসপারকে সঙ্গ দিতে ভুল হয় না তার। সহজে ডাল গলবে না উপলব্ধি করবার পর কাজটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে সে, মেয়েদের মন জয় করবার সম্ভাব্য সবগুলো কৌশল এক এক করে প্রয়োগ করছে। প্রথমে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দিয়ে শুরু করল, অ্যানি উইসপারের মত সুন্দরী মেয়ে নাকি সে তার জীবনে দেখেনি। ডিনারের সময় সিটি হোটেলের সবচেয়ে দামী খাবার আর শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল সে। দেখা গেল, প্রায় নির্লিপ্তভাবে সমস্ত কিছু হজম করে নেওয়ার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা রয়েছে অ্যানি উইসপারের। মাইকেল তার প্রশংসা করলে মৃদু হাসির সঙ্গে গ্রহণ করে সে, বিনয় বা ভদ্রতা দেখিয়ে মৃদু প্রতিবাদও করে না। সহজ সরল হাসির সঙ্গে মাইকেলের কথা শোনে, আগ্রহের সঙ্গে শ্যাম্পেনের স্বাদ নেয়, আস্তেধীরে খালি করে ফেলে প্লেটগুলো। কিন্তু মাঝরাতের দিকে মাইকেল যখন তার সঙ্গে স্যুইটে ঢুকতে চেষ্টা করে, অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে মুখের উপর বন্ধ করে দেয় দরজা, তার আগে কোমল স্বরে জানিয়ে দিতে ভোলে না যে রঙিন স্বপ্ন দেখবার জন্য সিঁড়ির তলায় ভাঙা চৌকিটা রয়েছে।

চার দিনের দিন সকালে, সঙ্গত কারণেই বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়ল মাইকেল। তার ইচ্ছে হলো এক বালতি বিয়ার নিয়ে

রানার ক্যাম্পে যায়, বন্ধুর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বললে মনটা হয়তো হালকা হবে। কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, নিজের পরাজয়ের কথা রানার কাছে স্বীকার করা উচিত হবে না, কাজেই ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল সে, রিকশায় চেপে রওনা হলো বন্দরের দিকে।

রাতে নতুন একটা জাহাজ বহির্নোঙ্গরে ভিড়েছে, চোখে বিনকিউলার তুলে সেটাকে খুঁটিয়ে দেখল মাইকেল। কিনারায় আর গায়ে লবণ জমে আছে, অত্যন্ত পুরানো, কোথাও কোথাও তোবড়ানো আর ভাঙা, এমনকী ক্রুদের চেহারাও বিশেষ সুবিধের নয়, তবে মাইকেলের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ল জাহাজটার রিগিং-এ কোন খুঁত নেই। মাস্তুল দেখে বোঝা যায় বিশাল ক্যানভাস পাল ওড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে, অর্থাৎ প্রথম জীবনে পালতোলা জাহাজই ছিল, পরে ডিজেল এঞ্জিন ফিট করা হয়েছে। হারবারে এ-পর্যন্ত যত জাহাজ দেখেছে সে, সেগুলোর মধ্যে এটাকেই তার মনে ধরল। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে ফেরিতে চড়ল সে, ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে এক শিলিং বেশি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল মাঝিকে।

কাছ থেকে আরও করুণ দেখাল জাহাজটাকে। রঙের ভিতর অন্য রঙ দেখা যাচ্ছে, খোলের গায়ে কাদাটে হলুদ বর্জ্য পদার্থের সচল ধারা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না স্যানিটারি ব্যবস্থা মান্ধাতা আমলের।

আরও কাছ থেকে জানা গেল রঙ চটা হলেও, প্ল্যাঙ্কিং-এ কোন খুঁত নেই। স্বচ্ছ পানির নীচে খোলের তলাটাও পরিষ্কার দেখা গেল—নিখাদ কপারের তৈরি, কোথাও জলজ সবুজ আগাছা জড়িয়ে নেই। জাহাজটার নাম পাপাগোয়া, গ্রীসে রেজিস্টার করা। দেখে মনে হয় ভাঙাচোরা, বাতিল জিনিস, কিন্তু কাজের সময় ওটা একটা বুনো ঘোড়ার মতই শক্তিশালী। এ-ধরনের জাহাজ সোনা,

ড্রাগস, আদম-সন্তান ইত্যাদি পাচার করবার কাজেই সাধারণত ব্যবহার করা হয়, জানা আছে মাইকেলের। তার মন বলছে, ঠিক জাহাজটি খুঁজে পেয়েছে সে। অবৈধ মালামাল পাচার করে এমন একজন ক্যাপ্টেনই তার দরকার। হাত তুলে নাড়ল সে, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চিৎকার করল, 'আহয়্, পাপাগোয়া!'

ক্রুরা রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কোন সাড়া দিল না। চোখে বিদ্বেষ, হাবভাব মারমুখো, তাকিয়ে আছে ফেরির দিকেই। ক্রুদের মধ্যে চীনা, ভারতীয়, নিগ্রো রয়েছে, দু'একজন আরবও আছে।

হাত দুটোকে মুখের চারপাশে চোঙ বানাল মাইকেল, ইংরেজিতে বলল, 'ভয় নেই, আমি কাস্টমস অফিসার নই—পারস্পরিক স্বার্থ নিয়ে তোমাদের ক্যাপটেনের সাথে কথা বলতে চাই।'

ক্রুদের মধ্যে সামান্য নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। খানিক পর তাদের মাঝখানে একজন শ্বেতাঙ্গ উদয় হলো। রোদে পোড়া গ্রীক চেহারা, এত বেঁটে যে কোন রকমে ক্রুদের কাঁধ পর্যন্ত পৌঁচেছে মাথাটা। নীচের দিকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি? পুলিস?'

লোকটার এক চোখে কালো একটা পট্টি বাঁধা, ফলে অপর চোখটা অত্যন্ত উজ্জ্বল আর চকচকে লাগল। 'আরে না, পুলিস হতে যাব কেন!' বলল মাইকেল। কোটের পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে দেখাল সে। 'বন্ধু!'

রেলিঙের উপর ঝুঁকে আরও কিছুক্ষণ মাইকেলকে খুঁটিয়ে দেখল ক্যাপটেন। কে জানে, সে হয়তো ওর চোখে দুষ্টামির ঝিলিক আর ঠোঁটের কোণে লুটেরার হাসি দেখে থাকবে। রতনে রতন চেনে, কথাটা তো মিছে নয়। তার ভাব দেখে মনে হলো

খুশি হয়েছে সে। গ্রীক নাকি আরবী ভাষায় কী যেন বলল, ক্রুরা রশির সিঁড়ি নামিয়ে দিল নীচে।

'উঠে আসুন,' আমন্ত্রণ জানাল ক্যাপটেন। কিছুই তার লুকোবার নেই। এবারের যাত্রায় পাপাগোয়া শুধু তুলো বয়ে নিয়ে এসেছে বোম্বে থেকে। অবশ্য দার-এস-সালামে তুলো খালাস করবার পর, আশপাশ কোথাও থেকে কিছু অবৈধ কার্গো তোলা হবে জাহাজে, তা না হলে খরচায় পোষাবে না। গালা গোত্রের কিছু মেয়ে পাচার করতে পারলে মোটা টাকা আয় হবে। গালা মেয়েদের বাজারদর খুব ভাল।

জাহাজে পা দিয়েই মাইকেল ঘোষণা করল, 'সামান্য হুইস্কির সাথে টাকা আয় করার পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা। আমার নাম মেজর সেভারস।'

'আমি কোস্টাস অ্যারোনিকাস।' এই প্রথম হাসল ক্যাপটেন। 'টাকা পয়সার আলাপ আমার কাছে মিষ্টি সঙ্গীতের মত—ভারি পছন্দ করি।' সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল।

রানার জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে মেহগনি বনের ক্যাম্পে পৌঁছুল মাইকেল সেভারস্, সঙ্গে অ্যানি উইসপার।

'সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ।' ব্যঙ্গাত্মক সুরে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল রানা, ওয়েল্ডিং সেট হাতে নিয়ে সিধে হলো সে, টর্চটা থেকে এখনও হিস হিস করে নীলচে আগুন বেরুচ্ছে। 'আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা দু'জন পালিয়েছ।'

'আগে কাজ, তারপর ফুর্তি।' অ্যানির হাত ধরে রিকশা থেকে তাকে নামাল মাইকেল। 'বুঝলে, ওল্ড চ্যাপ, এই ক'দিন কঠিন ধকল গেছে আমাদের ওপর দিয়ে।'

'দেখতেই তো পাচ্ছি। প্রচণ্ড পরিশ্রমে শুকিয়ে তুমি অর্ধেক হয়ে গেছ।' টর্চ নিভিয়ে বিয়ারের বালতিটা নিল রানা। বোতলের ছিপি খুলে একটা করে ওদের হাতে ধরিয়ে দিল, নিজেও একটা মুখে তুলল। কালি মাখা খাকী শর্টস পরে আছে ও, ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই।

কয়েক ঢোক বিয়ার খেয়ে বোতলটা নামাল, বলল, 'তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কাজেই তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম।'

'আপনারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, মেজর সেভারস্ ও মিস অ্যানি উইসপার,' বলে ওদেরকে স্যালুট করল আব্বাস খায়ের। বিয়ারের একটা বোতল তার কপালেও জুটেছে।

'কী ব্যাপার? কী বলছে ও?' ঘাড় ফিরিয়ে বড়সড় কাঠামোটার দিকে তাকাল মাইকেল, ওটাকে নিয়েই রানা আর আব্বাস কাজ করছিল।

জিনিসটার গায়ে হাত বুলাল রানা। 'এটা একটা ভেলা।' বাঁশ আর খালি ড্রাম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ভেলাটা। 'আর্মারড কার ভাসতে বা সাঁতার কাটতে জানে না অথচ আমাদেরকে জাহাজ থেকে নামতে হবে তীরে পৌঁছুনোর আগেই। উপকূলের যা অবস্থা, জাহাজ সৈকতের কাছাকাছি যেতে পারবে না, আমরা ওগুলোকে ভেলায় চড়িয়ে তীরে নিয়ে যাব।'

অ্যানি উইসপার রানার কাঁধ আর বাহুর পেশীগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ বুলাল ওর সমতল পেট আর বুক ঢেকে থাকা ঘন কালো লোমগুলোর উপর।

মাইকেলের দৃষ্টি এখনও ভোঁতা চেহারার ভেলার দিকে নিবদ্ধ। 'ল্যান্ডিঙের সমস্যা নিয়ে আমিও ভাবছিলাম,' বলল সে। 'ঠিক এ-ধরনের একটা পরামর্শই তোমাকে আমি দিতে যাচ্ছিলাম।'

রানার তির্যক দৃষ্টিতে ক্ষীণ অবিশ্বাস। 'দেখতে হবে

জাহাজটায় যথেষ্ট শক্তিশালী ডেরিক আছে কিনা, সেটা ভেলা পর্যন্ত কারগুলোকে পৌঁছে দিতে পারবে কিনা।'

'ওগুলোর ওজন কত?'

'একেকটা পাঁচ টন।'

'কোন সমস্যা হবে না, পাপাগোয়া সামলাতে পারবে।'

'পাপাগোয়া?'

'ওই জাহাজেই যাচ্ছি আমরা।'

'তারমানে সত্যি তুমি কাজ করছিলে!' হেসে উঠল রানা। 'অবিশ্বাস্য! দেখা যাচ্ছে তোমার ভেতর পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'পরশু সকালে। কার্গো লোড করব রাতে, চাই না কেউ দেখে ফেলুক।'

'তা হলে তো বেশি সময় নেই, মিস উইসপার,' বলে এবার অ্যানি উইসপারের দিকে ফিরল রানা। 'মনে আছে, একটা আর্মারড কার চালাতে হবে? গাড়ি চালাতে জানলেও, আরও কিছু শিখতে হবে তোমাকে।'

'আপাতত আমার সবটুকু সময় নিতে পারো তুমি, আর শেখার ব্যাপারে আমার আগ্রহেরও কোন শেষ নেই।' দার-এস-সালামে অ্যানি উইসপারের এই যাত্রাবিরতি ক্লান্ত আর উত্তেজিত নার্ভগুলোকে বিশ্রাম পাবার সুযোগ এনে দিয়েছে, এর আগের জেনেভা অ্যাসাইনমেন্টটায় সাংঘাতিক ছুটোছুটি করতে হয়েছিল তাকে। গত ক'টা দিন দার-এস-সালামের প্রাচীন বন্দরে ঘোরাফেরা করেছে সে, বন্দরের জন্ম আর ইতিহাস সম্পর্কে দু'হাজার শব্দের একটা ছোট্ট ফিচার লিখেছে। সেই সঙ্গে তার প্রতি মাইকেল সেভারসের গভীর মনোযোগও উপভোগ করেছে

সে, সংকটময় মুহূর্তগুলোয় ছলনা আর চাতুরির সাহায্যে লোকটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও তার কাছে কৌতুককর একটা খেলা বিশেষ ছিল। এই মুহূর্তে মাসুদ রানার মুগ্ধ দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন মেয়েটা। দুই কঠিন পাত্র, বিপজ্জনক এবং প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর, নিজেদের সমস্ত পৌরুষ নিয়ে যদি কোন মেয়ের পিছু নেয় বা মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে, মেয়েটির জন্য এরচেয়ে আনন্দময় অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারে? বিদূষী—হ্যাঁ, সৎ—হ্যাঁ, বুদ্ধিমতী—হ্যাঁ, কিন্তু তারমানে তো এই নয় যে পুরুষকে নিয়ে খেলবার জন্মগত অধিকার ও নারীসুলভ প্রবণতাটুকু বিসর্জন দিতে হবে। কথাটা ভেবে, রানার চোখে চোখ রেখে হাসল অ্যানি—রানা সাড়া দিতে উপভোগ করল মুহূর্তটি, উপভোগের মাত্রা বেড়ে গেল হতাশায় ভেঙে পড়তে পড়তে বাধা দেওয়ার জন্য মাইকেলকে ছুটে আসতে দেখে।

'তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করার দরকার কী,' রানাকে বলল মাইকেল। 'তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছ, ওটা থেকে তোমাকে সরাতে চাই না। অ্যানিকে যা শেখাবার আমিই শেখাব।'

অ্যানি উইসপার মাথা ঘোরাল না, রানার দিকে তাকিয়ে হাসতেই লাগল। 'কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, ডিপার্টমেন্টটা মি. মাসুদ রানার।'

'রানা,' বলল রানা।

'অ্যানি,' বলল অ্যানি।

গোটা ব্যাপারটা, কোন সন্দেহ নেই, চমৎকার উতরে যাচ্ছে। নির্জলা সত্য হলো, এটা একটা পিছু ধাওয়ার কাহিনী, দু'জন পুরুষের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, আর সেই সঙ্গে বহু কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত অ্যানি উইসপারের চারিত্রিক সুনাম আরেকটু বাড়িয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। অ্যানি উইসপারের জানা

আছে, তার পেশায় নিয়োজিত আর কোন মেয়ে একটা রিপোর্ট তৈরির খাতিরে দু'জন অস্ত্র চোরাচালানীর সঙ্গে মেলামেশা করবে না, বা অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোবে না—অত সাহস তাদের কারও নেই। এখন দেখবার বিষয়, সতেজপ্রাণ ষাঁড় দুটোকে ঠিক মত সে সামলাতে পারে কিনা। তার নিজের ভাবাবেগেরও লাগাম টেনে রাখবার দরকার আছে। আর বিপদ, সে তো ঘটতেই পারে। বিপদ আছে বলেই না জীবন এত রোমাঞ্চকর!

মেহগনি বনের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া সরু পথ ধরে হাঁটছে ওরা। রানা আর মাইকেলকে তার পাশে জায়গা পাবার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে দেখে গোপনে হাসল অ্যানি উইসপার। তবে ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মাইকেল।

'এ-সব কী?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নতুন রঙ। আব্বাসের আইডিয়া,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'গুলি ছোঁড়ার আগে প্রতিপক্ষকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হবে।'

দুধ-সাদা চকচকে চেহারা পেয়েছে আর্মারড কারগুলো, টারিটে আগুন রঙা ক্রস চিহ্ন।

'জিবুতি বা সোমালিয়ানরা যদি থামতে বলে আমাদের, নিজেদের পরিচয় দেব ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রসের সদস্য বলে—ওগুলো আর্মারড অ্যাম্বুলেন্স। তুমি, আব্বাস আর আমি ডাক্তার; অ্যানি সিস্টার।'

'মাই গড, আমার প্রমোশন হয়েছে!' হেসে উঠল অ্যানি।

'সাদা রঙ গাড়ির ভেতরটাও ঠাণ্ডা রাখবে,' বলল আব্বাস।

'র‍্যাকের ডিজাইন আমি তৈরি করেছি,' বলল রানা। 'টারিটের

পিছনে প্রতিটি গাড়িতে থাকবে চল্লিশ গ্যালন গ্যাসোলিনের দুটো ড্রাম, পানির একট ড্রাম। অস্ত্র আর গোলাবারুদের বাক্সগুলো সমান চার ভাগে ভাগ করে চারটে গাড়িতে রাখা হবে।' আর্মারড কারের গায়ে রশি দিয়ে বাঁধা র‍্যাকগুলো এই মুহূর্তে খালি।

'ভেবেছ রেড ক্রস বললেই পার পেয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল। 'বাক্সগুলো দেখামাত্র ফাঁস হয়ে যাবে সব, প্রত্যেকটার গায়ে লেবেল সাঁটা আছে...।'

'সব ছিঁড়ে ফেলে মেডিকেল সাপ্লাইয়ের নতুন লেবেল লাগানো হবে,' বলে অ্যানির দিকে ফিরল রানা। 'তোমার জন্যে একটা গাড়ি আলাদা করে রেখেছি, দেখবে এসো। চারটের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বাধ্য আর...আর লক্ষ্মী।'

'ওমা, সেকী! ওগুলোর আবার নিজস্ব চরিত্রও আছে নাকি?' হালকা গলায় বিদ্রূপ করল অ্যানি।

'ঠিক মেয়েদের মতই ওরা, লৌহমানবী।' কাছের একটা আর্মারড কারে মৃদু চাপড় দিল রানা। 'এটা সবচেয়ে শান্ত, সুবোধ বালিকা–শুধু ওর সাসপেনশনটা একটু বাঁকা হয়ে আছে, গতি খুব দ্রুত হলে নিতম্ব ঝাঁকায়, এই যা। তবে সিরিয়াস কিছু নয়, যদিও এ-কারণেই ওর নাম দেয়া হয়েছে নিতম্বিনী। ওটা তোমার। দেখবে, ভাল না বেসে পারবে না।' এগিয়ে পাশের গাড়ির সামনে দাঁড়াল রানা, লাথি কষল টায়ারে। 'এটা যেমন অস্থির তেমনি পাজি, প্রথম বার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতেই আরেকটু হলে আমার কব্জি ভেঙে দিয়েছিল। ওর পরিচয়, চঞ্চলা। একমাত্র আমার পক্ষেই ওকে সামলানো সম্ভব। আমাকে ও ভালবাসে না, তবে শ্রদ্ধা করে।' সামনে এগোল ও। 'নিজের জন্যে এটা বেছে নিয়েছে আব্বাস, নাম ভাগ্যদেবী। ভবিষ্যতেই জানা যাবে ভাগ্যদেবী কী বর দেয় আমাদের। আর মাইকেল, এটা তোমার জন্যে–এতে

রয়েছে আনকোরা নতুন একটা কারবুরেটর। আমার ধারণা, এটাকে ভোগ দখল করার অধিকার একা তুমি সংরক্ষণ করো, কারণ কারবুরেটরটা সংগ্রহ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমাকে।'

'তাই?' গল্পের গন্ধ পেয়ে অ্যানির চোখ দুটো আগ্রহে জ্বলজ্বল করে উঠল। 'কী ঘটেছিল?'

'সে এক লম্বা কাহিনী,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'উটের পিঠে চড়ে দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার দুঃসাহসিক অভিযান।' চুরুটের ধোঁয়া গলায় আটকে যাওয়ায় খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করল মাইকেল, তবু বলে চলল রানা, 'কাজেই ওটার নাম দেয়া হয়েছে বিপদতারিণী।'

'হাউ ভেরি কিউট!' অ্যানির কণ্ঠনিঃসৃত হাসি মর্মরধ্বনির মত বাজল রানার কানে।

মাঝরাতের খানিক পর ঘুমন্ত শহরের নির্জন রাস্তায় উঠে এল চারটে আর্মারড কার। হেডলাইটের সামনে ইস্পাতের শাটার নামানো রয়েছে, ফলে আলোর সরু একটা ফালি শুধু নীচের দিকে সামনেটা আলোকিত করেছে। গতি খুব মন্থর, সামান্যই শব্দ করছে এঞ্জিন। রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি, মাথার উপর ডালপালা আর পাতা আড়াল করে রেখেছে তারাগুলোকে।

গায়ে-মাথায় একাধিক বোঝা থাকায় গাড়িগুলোর আকৃতি বদলে গেছে। ড্রাম, কাঠের বাক্স, রশির কুণ্ডলী, ট্রেঞ্চিং টুল, আর ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট—ওগুলোর ভিড়ে আর্মারড কার চেনাই দায়।

কনভয়ের সামনে রয়েছে মেজর সেভারস্, সদ্য দাড়ি কামিয়ে ধূসর রঙের প্যান্টের উপর সাদা জ্যাকেট চড়িয়েছে সে। দার-এস-

সালাম ত্যাগ করবার এই বিশেষ মুহূর্তটিতে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন মাইকেল। সিটি হোটেলের মালিক কোনভাবে যদি টের পেয়ে যায়! বেশি না, দিন সাতেকের স্যুইট ভাড়া আর সাত দিন তিনবেলা করে আহার গ্রহণ ও মদ্যপানের বিল বাকি পড়েছে তার। সন্দেহ নেই একবার সাগরে পৌঁছুতে পারলে হয়, সিটি হোটেলে কবে কী খেয়েছে বা ক'দিন কোথায় শুয়েছে সব ভুলে যাবে সে। অনেক দিন আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছে মাইকেল সেভারস্, জীবনটাকে আনন্দময় করে তুলতে হলে নিজের ব্যর্থতাগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করতে হয়।

মাইকেলের পিছনে রয়েছে আব্বাস খায়ের। নিজের গোত্রে তার একটা সামরিক পদ আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, বাম শাখার কমান্ডার। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে রয়েছে সে, তবু নিজেকে নিয়ে তার গর্বের পরিসীমা নেই, কারণ এরই মধ্যে ছোটখাট যুদ্ধে এবং শিকারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে–আহত করেছে একাধিক শিফটাকে, গেছে দু'একটা সিংহ শিকারে, রাইফেলে তার হাত সম-বয়েসীদের ঈর্ষার কারণ। শহরের ভিতর দিয়ে কনভয় নিয়ে যাওয়ার সময় চোখ দুটো বিপুল উত্তেজনায় চকচক করছে তার, দেশ তথা গোত্রপ্রেমে উজ্জীবিত, জানে নিজের এলাকায় পৌঁছুনোর আগে একের পর এক বহু বিপদ পেরোতে হবে তাদের, নিতে হবে মৃত্যুর অথবা দীর্ঘ কারাভোগের ঝুঁকি। বলাই বাহুল্য, যুদ্ধের মত নোংরা ও অকারণ রক্তঝরা ব্যাপারটা তার কাছে এখনও গৌরবের এবং পুরুষোচিত বীরত্বের কাজ।

তার পিছনে রয়েছে অ্যানি উইসপার, নিতম্বিনীকে সতর্ক দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছে। এঞ্জিনের ভাষা ঠিক মত বুঝতে পারছে মেয়েটা, হালকা ছোঁয়ায় ক্লাচ, স্টিক আর মান্ধাতা আমলের গিয়ার

যেভাবে অপারেট করছে, মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না রানা। অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাবার লোভে সে-ও উত্তেজিত হয়ে আছে, অভিজ্ঞতার ঝুলিতে নতুন একটা কিছু যোগ হবে। কাল বিকেলে প্রাথমিক রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে সে আমেরিকায়, এয়ার মেইল যোগে তার সম্পাদকের ডেস্কে পৌঁছুতে তিন-চার দিন লাগবে। পরিস্থিতির নেপথ্যকাহিনী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছে সে। অজ্ঞাত পরিচয় কোন এক বৃহৎ শক্তি নিজস্ব এজেন্ট পাঠিয়ে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী গোত্রগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছে, সাহায্য করছে শিফটা তথা দুষ্কৃতকারীদের; উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা, তারা যাতে আলোচ্য বৃহৎ শক্তির প্রভাববলয়ের ভিতর দ্রুত ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়। জিবুতি, সোমালি আর ইথিওপিয়ান সীমান্ত এলাকায় ইটালিয়ানদের ভূমিকাও অত্যন্ত নিন্দনীয়। বহুকাল আগেই তাদের সরকার এলাকা থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু অনেকেই তারা রয়ে গেছে, বেশিরভাগ প্রাক্তন যোদ্ধা, বর্তমানে দুষ্কৃতকারীদের সামরিক উপদেষ্টা এবং মাথার মুকুট। ইথিওপিয়ান সম্রাট হাইলে সেলাসির পতন এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র, তবে সব একনায়কের মত তিনিও গদি আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করছেন। সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর ব্যাপারে কোনদিনই তেমন একটা মাথা ঘামাননি, এখন তো প্রশ্নই উঠে না। সবশেষে অ্যানি লিখেছে, 'বাধ্য হয়েই নির্যাতিত গোত্রগুলো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অস্ত্র সংগ্রহের প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না, কারণ এটা তাদের জন্যে জীবন-মরণ সমস্যা। রাসটাফারিয়ান গোত্রের জন্যে একটা অস্ত্রের চালান ইথিওপিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে কাল, সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওদের সঙ্গেই যাব আমি।

কিন্তু পাঠক যখন আমার এই রিপোর্ট পড়বেন, তার আগেই অস্ত্রপাচারের এই অভিযান ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, আর সবার সঙ্গে মারা যেতে পারি আমি। জাহাজ থেকে তীরে নামার পর একজন রাসটাফারিয়ান প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করার জন্যে কয়েকশো মাইল মরু পেরোতে হবে আমদের। যদি বেঁচে থাকি, পরবর্তী রিপোর্টে অভিযানের কথা লিখব।' প্রথম রিপোর্টটা আসলে ভূমিকার কাজ করবে, অ্যানি জানে। সিরিজটা যে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং সুপাঠ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। নিজের লিখবার স্টাইলের উপর আস্থা আছে তার, আর অভিযান শেষ হওয়ার আগে চমকপ্রদ ঘটনা যে ভূরি ভূরি ঘটবে তাতে আর সন্দেহ কী!

তার পিছনে রয়েছে মাসুদ রানা। ওর অর্ধেক মন জুড়ে রয়েছে চঞ্চলার এঞ্জিন সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা। কোন প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই, যাত্রার শুরুতে স্টার্ট নিচ্ছিল না কারটা। ভবিষ্যতে এঞ্জিনটার কাছ থেকে কী আশা করতে পারে ও, সেটাই কি আভাসে জানিয়ে দেওয়া হলো ওকে? অবিরাম ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে ঘোরাতে হাত অসাড় হয়ে পড়েছিল, লাভ হয়নি কোন। অগত্যা নতুন করে ফুয়েল সিস্টেম পরীক্ষা করেছে ও, চেক করেছে প্লাগ, ম্যাগনিটো সহ সচল সবগুলো পার্ট। কোথাও কোন ত্রুটি দেখতে পায়নি। আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর, এটাসেটা নাড়াচাড়া করে রানা যখন শেষ চেষ্টা হিসাবে আবার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাল, প্রথমবারই স্টার্ট নিল এঞ্জিন, তারপর থেকে ছন্দ বজায় রেখে চমৎকার চালু রয়েছে, আগে কেন স্টার্ট নেয়নি সে-সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

রানার বাকি অর্ধেক মন ব্যস্ত রয়েছে ইতিমধ্যে গ্রহণ করা প্রস্তুতির মধ্যে কোথাও কোন ত্রুটি বা ফাঁক আছে কিনা খুঁজে বের করবার কাজে। মণ্ডি থেকে ওয়েলস অভ চাল্ডি দীর্ঘ পথ, মাঝখানে কোন সার্ভিস স্টেশন আশা করা বৃথা। ড্রাম আর বাঁশ দিয়ে তৈরি

ভেলাটা আগেই পাপাগোয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সচল থাকবার জন্য যা যা দরকার সব তোলা হয়েছে প্রতিটি গাড়িতে।

দুই কাজে মনটা দুই ভাগ হয়ে গেলেও, মাঝে মধ্যে অ্যানি উইসপারের কথাও ভাবছে রানা। নারীসঙ্গ কার না ভাল লাগে। সুন্দরী নারী দেহ-মনে আলোড়ন তুলবে এ আর নতুন কথা কী! কিন্তু তবু ওর মনে হয়েছে, অ্যানি উইসপার একটা ব্যতিক্রম, আর কারও সঙ্গে তার তুলনা চলে না। বহু বছর পর এ-ধরনের মেয়ে এই প্রথম দেখছে রানা, যে কি না যে-কোন পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে, হতে পারে তার সমকক্ষ, তথা পার্টনার। একটা কথা পরিষ্কার, গৃহবধূ হয়ে স্বামীর নির্যাতন সহ্য করবার জন্য জন্ম হয়নি অ্যানি উইসপারের। ইউরোপ বা পশ্চিমা জগতে এ-ধরনের স্বাধীনচেতা স্বাবলম্বী মেয়ে অনেক আছে। রানার মন খারাপ হয়ে গেল নিজের দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়ে যাওয়ায়। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, কেনা-বাঁদীর মত জীবন-যাপন করছে তারা। কুসংস্কারের বাঁধন ছিঁড়ে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটা জাতির এত বেশি সময় লাগে—অসহ্য!

মাঝে মধ্যে মাইকেল সেভারসের কথাও ভাবছে রানা। যতবারই তার কথা মনে পড়ছে, আপনমনে না হেসে পারছে না। সিটি হোটেলের সামনে দিয়ে আসা উচিত ছিল ওদের, ওটাই সরল পথ, কিন্তু মাইকেল জেদ ধরায় ঘুর পথ ধরে আসতে হয়েছে ওদেরকে। তখনই রানা যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে—হোটেলের বিল বাকি রেখে যাচ্ছে সে। ভয় পাবার আরেকটা কারণ আছে তার, কিন্তু সে-ব্যাপারে রানা তাকে কিছু বলেনি। ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরের মেয়েটা ক'দিন থেকেই গরুখোঁজা করছে

মাইকেলকে। সে যদি জানে মাইকেল চিরকালের জন্য দার-এস-সালাম ছেড়ে যাচ্ছে, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

জেটি থেকে খানিক দূরে, জাহাজঘাটায় অপেক্ষা করছিল কোস্টাস অ্যারোনিকাস, পরনে হাঁটু ঢাকা ওভারকোট, হাতে ল্যাম্প। ল্যাম্প নেড়ে সংকেত দিল সে, সামনে এগোতে বলল কনভয়টাকে। পাথুরে জাহাজঘাটায় পাপাগোয়ার ক্রুরাও দাঁড়িয়ে রয়েছে রুক্ষকঠিন চেহারা নিয়ে। হাবভাব আর কাজের দক্ষতা দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, রাত দুপুরে সন্দেহজনক কার্গো লোড করতে তারা অভ্যস্ত।

একটা করে গাড়ি সামনে এগিয়ে থামল, গা থেকে খুলে নেওয়া হলো ড্রাম আর বাক্সগুলো। ওগুলো তোলা হলো কার্গো নেটে, ডেরিকের সাহায্যে জাহাজে উঠে গেল নেট। এরপর গাড়িটার তলায় কাঠের তক্তা ঢোকানো হলো, মোটা রশি দিয়ে তক্তার সঙ্গে বাঁধা হলো চেসিস, কোস্টাস অ্যারোনিকাসের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে উইঞ্চ-এর এঞ্জিন চালু হলো, ধীরে ধীরে ভারি বোঝা নিয়ে শূন্যে উঠে গেল ডেরিক।

কাজটা শেষ হলো প্রায় নিঃশব্দে, অপ্রয়োজনীয় একটা কথাও বলল না কেউ। 'ব্যাটারা নিজেদের কাজ বোঝে,' ফিসফিস করল মাইকেল, রানার কাঁধে টোকা দিল। 'আমি যাই, হারবার মাস্টারের কাছ থেকে কাগজ-পত্র নিয়ে আসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা হব।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে ডেকে উঠে এল রানা, অ্যানি উইসপারের একটা হাত ধরে আছে। 'চলো, থাকার কী ব্যবস্থা হয়েছে দেখে আসি।'

'হ্যাঁ, চলো,' হাসি চেপে বলল অ্যানি। 'তুমি কী ধরনের

ব্যবস্থা পছন্দ করবে দেখার খুব ইচ্ছে আমার।'

'মানে?'

হেসে উঠে অ্যানি বলল, 'সে এক লম্বা কাহিনী। ফোমের বিছানা থেকে ভাঙা চৌকিতে অধঃপতনের করুণ ইতিহাস।'

ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অতিরিক্ত কেবিন মাত্র একটাই আছে, ওদের সবাইকে সেখানে মাথা গুঁজতে হবে।

খানিক পর হারবার মাস্টারকে দুশো শিলিং ঘুষ দিয়ে কাগজ-পত্র নিয়ে ফিরে এল মাইকেল। কাগজে দেখা গেল, আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে চারটে আর্মারড অ্যাম্বুলেন্স আর মেডিকেল সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছে ওরা, আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের তরফ থেকে। 'পাঁচশো শিলিং ঘুষ দিতে হয়েছে,' রানাকে জানাল সে।

কেবিন সম্পর্কে তাকে বলা হলো, কোন রকম ইতস্তত না করে জবাব দিল সে, 'কার সাথে কে থাকে সে তো আগেই ঠিক হয়ে আছে, বদলানোর কী কারণ ঘটল? অ্যানি উইসপার আর আমি কেবিনে থাকব, আর তোমরা ডেকে কোথাও...নাকি আবার টস করতে চাও?'

রেলিঙের সামনে সবাই ওরা দাঁড়িয়ে আছে। অ্যানি উইসপার চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ও কী বলে শুনতে চায়, আগ্রহে চকচক করছে তার চোখ। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়বার লোভ সামলাতে পারল না রানা। 'পাপাগোয়ায় শুধু কেবিন আর বাঙ্ক আছে, মাইকেল। তুমি ভাঙা চৌকি কোথায় পাবে যে...' কথা শেষ করতে পারল না, খিলখিল করে হেসে উঠল অ্যানি।

মাইকেলের হাঁ করা মুখে তাড়াতাড়ি একটা চুরুট গুঁজে দিল

রানা, মাইকেলেরই চুরুট ওটা। তারপর আবার বলল, 'মাত্র ক'টা দিনেরই তো ব্যাপার, অ্যানি বাদে সবাই আমরা ডেকে কাটিয়ে দিতে পারব। আর যদি বৃষ্টি আসে, গাড়িতে ঢুকে পড়লেই হবে।'

একটু পর সবার কানকে বাঁচিয়ে আব্বাস খায়ের রানাকে বলল, 'ভেবেছিলাম মেয়েটা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে কি না মেজরের কাছ থেকে জানা যাবে, কিন্তু এখন দেখছি আমার হিসেবে ভুল হয়েছিল।'

মৃদু হেসে আব্বাসের মাথার চুল এলোমেলো করে দিল রানা।

চোখে-মুখে নক্ষত্রের কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে ঘুম ভাঙল অ্যানি উইসপারের, চোখ মেলেই তারা ভরা মুক্ত আকাশ দেখে কী এক আনন্দে মনটা ভরে গেল তার, পুব আকাশ থেকে সবে মাত্র পালাতে শুরু করেছে অন্ধকার। মনে পড়ে গেল, কেবিনের ভিতর গরম লাগায় সবার সঙ্গে ডেকে এসে শুয়েছিল সে, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। গা থেকে চাদরটা সরিয়ে দাঁড়াল সে, পা টিপে টিপে রেলিঙের দিকে এগিয়ে গেল।

নানা রঙের আলো মেখে বিচিত্র চেহারা পেয়েছে সাগর। প্রতিটি ঢেউ যেন নিরেট ও মহামূল্যবান কোন ধাতু থেকে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে, নক্ষত্রের আলোকচ্ছটা অলংকার হিসাবে ছড়িয়ে রয়েছে গায়ে। জাহাজের পিছনে আলোড়িত পানি যেন সবুজ আগুন। হাত আর চুলে, মুখ আর গলায় প্রেমিকের আদরমাখা স্পর্শের মত সাগরের বাতাস, মাথার উপর বিশাল পালটা ফিসফিস করছে। রাতের এই রূপ দেখতে দেখতে হাঁপ ধরে গেল অ্যানি উইসপারের, অদ্ভুত একটা পুলকে অবশ হয়ে এল সারা শরীর।

নিঃশব্দ পায়ে মাইকেল যখন এগিয়ে এল, দাঁড়াল তার

পিছনে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার কোমর, সে এমনকী ঘাড় ফিরিয়ে তাকালও না, বরং হেলান দিল ওর গায়ে। তর্ক বা ব্যঙ্গ করবার কোন ইচ্ছাই তার হলো না। কথাটা তো আর মিথ্যে লেখেনি সে, দু'চার দিনের মধ্যে মারা যেতে পারে। অথচ এত সুন্দর রাত জীবনে আর হয়তো না-ও আসতে পারে।

কেউ ওরা কথা বলল না, তবে মাইকেলের হাত চোরের মত সন্তর্পণে ব্লাউজের ভিতর ঢুকছে বুঝতে পেরে কেঁপে উঠল অ্যানি উইসপার। ওর ছোঁয়া, বাতাসের মতই, কোমল আর আদরমাখা।

পাতলা কাপড় ভেদ করে মাইকেলের গরম শরীরের আঁচ অ্যানির চামড়া যেন পুড়িয়ে দিল। বুঝতে পারছে অ্যানি, অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছে মাইকেল।

আলিঙ্গনের ভিতর থেকেই ধীরে ধীরে ঘুরে গেল অ্যানি, মুখ তুলে তাকাল মাইকেলের চোখে। সামনের দিকে চাপ দিয়ে অ্যানির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হলো মাইকেল, সাড়া দিল অ্যানিও—দুটো শরীর জোড়া লেগে এক হয়ে গেল। মাইকেল চুমো খেতেই পুরুষালি গন্ধে নেশা ধরে গেল অ্যানির, বুঝতে পারল এখুনি যদি সাবধান না হয় পরে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।

মনের সমস্ত দৃঢ়তা আর সংযম একত্রিত করতে হলো, মুখ নামিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল অ্যানি। খানিকটা জোর খাটাতে চেষ্টা করলেও, মাইকেল তাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হলো। ঘুরে দাঁড়াল অ্যানি, দ্রুত ফিরে এল নিজের চাদরের কাছে। কাঁপা হাতে সেটা তুলল সে।

রানা আর আব্বাসের মাঝখানে সাবধানে চাদরটা বিছাল অ্যানি, কোন শব্দ না করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এখনও হাঁপাচ্ছে

সে, চেষ্টা করছে নিজেকে শান্ত করতে। আর ঠিক এই সময় টের পেল, মাসুদ রানা জেগে আছে।

চোখ বুজে রয়েছে রানা, নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে অ্যানি জানে, জেগে আছে ও।

ছয়

পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে আসমারা শহরের দিকে তাকিয়ে আছে বিশালবপু আবদেল কাদের ফাদ। পরনে নিজের খেয়ালি ডিজাইনে তৈরি সামরিক ইউনিফর্ম—কালচে সবুজ মোটা কাপড় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে অসংখ্য সোনার বোতাম আর পদকে, রঙচঙে ফিতে আর ব্যাজে। কোমরে খোপ বসানো মোটা একটা বেল্ট, প্রতিটি খোপে রাইফেলের বুলেট, যদিও রাইফেলটা বহন করছে তার সহকারী মোরেট টিউরেলাস। স্বঘোষিত জেনারেল আবদেল কাদের ফাদের কোমরে দ্বিতীয় আরেকটা বেল্ট রয়েছে, হোলস্টার বলা যায়, সেটা থেকে নিতম্বের দু'পাশে দুটো রিভলভার ঝুলছে। শিফটা নেতৃত্বের প্রতীকচিহ্ন হিসাবে খাপে ভরা একটা তরোয়ালও বহন করছে সে। তিন মন ওজনের জেনারেল জামা-কাপড় ও পদক ছাড়াও আরও আধ মন-টাক বোঝা বহন করছে অবলীলায়। তার ভুঁড়িটা মস্ত ড্রামের মত, উপর দিকে ঘাড়ে-গর্দানে সমান। চোখ দুটো স্বাভাবিক অবস্থায় এত বড় দেখায় যেন বিস্ফারিত হয়ে আছে, জ্বলন্ত দু'টুকরো কয়লার মত লাল। দাড়ি নেই, চওড়া আর ঘন জুলফি চিবুক বাদে মুখ প্রায় সবটাই ঢেকে রেখেছে, ঠোঁটের কোণ থেকে বাঁকা হয়ে জুলফির সঙ্গে মিলিত হয়েছে গোঁফ জোড়া, মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। চেহারা বা পোশাকে

কিম্ভূতকিমাকার ভাঁড় বলে মনে হলেও, গোটা পুব আফ্রিকায় আবদেল কাদের ফাদই সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং ক্ষমতাধর অপরাধী—পাহাড়ী দুষ্কৃতকারী শিফটাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা।

শিফটারা এতদিন সাধারণ ডাকাত ছিল, যদিও তাদের দুঃসাহস আর নৃশংসতার ছাপ গোটা পুব আফ্রিকার সবখানে ছড়িয়ে আছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা, মা-বাবার চোখের সামনে ধর্ষণ করেছে কিশোরী মেয়েদের, যুবকদের ধরে পুরুষত্বহীন করেছে, শিশুদের নিক্ষেপ করেছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে—সবই নগ্ন উল্লাস আর অট্টহাসির সঙ্গে, সঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই। তবে এতদিন ওরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, প্রতিটি দলের ছিল গোপন আস্তানা, তারা স্বাধীনভাবে লুঠপাট করত, ফলে দলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই ছিল, খুনোখুনি আর হানাহানি ছিল রোজকার ব্যাপার। শিফটাদের সবচেয়ে বড় দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদেল কাদের ফাদ, সে-ই সবগুলো দলকে এক করে সুশৃংখল ও অজেয় একটা শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। তার পক্ষে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে মি. এক্স-এর পরামর্শ আর আর্থিক সাহায্য পাওয়ায়। মি. এক্স রুশ, ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর ইটালিয়ান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, তবে নিজের পরিচয় সম্পর্কে কখনোই মুখ খোলে না। শিফটারা একত্রিত হতে পারলে, তাদের সম্মিলিত শক্তি সংশ্লিষ্ট এলাকার যে কোন সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এই চেতনা তার দ্বারাই শিফটা নেতাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। জোট বাঁধবার কাজটা একদিনে হয়নি, প্রায় বছর দেড়েক সময় লেগেছে। শিফটারা এখন সুসংবদ্ধ, শক্তির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় এখন আর তাদেরকে গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকতে হয় না। ইরিত্রিয়ার বুকে স্বাধীন একটা

সরকার পরিচালনা করছে আবদেল কাদের ফাদ। স্থানীয় আমলা থেকে শুরু করে পুলিস আর পুঁজিপতিরাও শিফটাদের মান্য করে, নিয়মিত খাজনা দিয়ে তুষ্ট রাখে। সাধারণ মানুষ যেখানে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেও দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, শিফটারা সেখানে প্রায় কোন কাজ না করেই রাজার হালে আছে। এত দিন পুঁজিপতিদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় এবং দূর-দূরান্তের জনপদে ডাকাতি করেই সন্তুষ্ট ছিল শিফটারা। এখন তাদেরকে নতুন ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মি. এক্সের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে আবদেল কাদের ফাদ। শিফটাদের সামরিক উপদেষ্টা, বেশিরভাগই ইটালিয়ান, তাদেরকে এবার কাজে লাগানোর জন্য চাপ দিচ্ছে সে।

ইরিত্রিয়া ইটালির দখলে থাকবার সময়, এই ইটালিয়ানরা ছিল বিশাল সব ভূ-সম্পত্তির মালিক। ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার পর অনেকেই তারা ইটালিতে ফিরে যায়নি, অথচ সবাই তাদের ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছে। চোরজোচ্চোর, দাংগাবাজ-প্রতারকরাই অসভ্য অশিক্ষিত আদিবাসীদের বোকা বানিয়ে, বন্দুকের জোরে ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। সেগুলো হাতছাড়া হবার পর মরিয়া হয়ে উঠল তারা। ভূ-সম্পত্তি দখল ও রক্ষার জন্য বন্দুকযুদ্ধ করতে হত তাদের, কারও কারও আনুষ্ঠানিক সামরিক ট্রেনিংও নেওয়া ছিল, সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা ছোট ছোট ডাকাতদল গঠন করে, পাহাড়ী দুষ্কৃতকারীদের নেতা হয়ে বসে। সেই নেতাদেরই একত্রিত করেছে আবদেল কাদের ফাদ। মি. এক্সের পরামর্শে সে এখন তাদেরকে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলছে। ছ'জন শিফটা নেতাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, ম্যাপ দেখিয়ে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট একটা এলাকা নিজেদের দখলে আনতে হবে। দখল করবার পর এলাকায় শান্তি

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারপর খাজনা আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা চাই। এলাকা দখলের কাজটা পানির মত সহজ, প্রায় বিনা যুদ্ধেই অর্জিত হবে সাফল্য, কারণ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর উপর সরকারের কোন নজর নেই। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা নিজেদের পদ আর ক্ষমতা ধরে রাখবার জন্য শুধু রাজধানী আর শহরগুলোতেই তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে। আর আদিবাসীরা কোন সমস্যা নয়, কারণ তাদের কাছে তীর ও বর্শা ছাড়া আধুনিক কোন অস্ত্র নেই বললেই চলে।

পাহাড়চূড়া থেকে দূর দিগন্তে চোখ রেখে সাম্রাজ্য গড়বার স্বপ্ন দেখছে আবদেল কাদের ফাদ। তার পায়ের নীচে, পাহাড়ের গোড়ায়, অস্ত্র আর গোলাবারুদ সহ ট্রাক বহর অপেক্ষা করছে। কয়েকশো শিফটা ট্রেনিং নিচ্ছে খোলা মাঠে। প্রায় সবার পরনেই সামরিক ইউনিফর্ম। ওরা সবাই কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক-এর সৈনিক। অস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সামরিক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হয়েছে, বেশিরভাগই চোরাবাজার থেকে কেনা। টাকা এসেছে শিফটা নেতা কর্নেল ডেকানডিয়া লেকরেকের কাছ থেকে, মি. এক্সও উদার হাতে দান করেছে। মেজর লুইগি রাকার অধীনে ছয় হপ্তার ট্রেনিং আজ শেষ হতে যাচ্ছে।

খবর দেওয়া হয়েছে কাউন্টকে, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে সে।

পাহাড়চূড়া থেকে হেডকোয়ার্টারে নিজের অফিসে নামবার সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল আবদেল কাদের ফাদ। 'খবর তো দিয়েছি, কিন্তু কাজটা কি করতে পারবে কর্নেল ডিকানডিয়া, মোরেট?'

ফাদ যেমন স্বঘোষিত জেনারেল, মোরেট তেমনি স্বঘোষিত মেজর। ইটালিয়ান হলেও, কাউন্ট ডিকানডিয়াকে দুচোখে দেখতে পারে না সে। 'একটা ভাঁড়!' সংক্ষেপে মন্তব্য করল মোরেট।

কাজটা হলো সারডি গিরিসঙ্কট দখল করা। সারডি গিরিসংকট–বিশাল মরুভূমির মাঝখানে সরু একটা ফাটল, আরও বিস্তৃত হয়ে দুর্গম পাহাড়শ্রেণীকে দু'ভাগ করেছে। সমতল মরু থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে মালভূমি, ওখানে পৌঁছুতে হলে এই গিরিপথ ব্যবহার করা ছাড়া আর কোন সহজ পথ নেই। সামরিক দিক থেকে সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে এই গিরিপথের। ওটা দখলে থাকলে ইথিওপিয়ার সেনাবাহিনী ফাদ সাম্রাজ্যের ভিতর ঢুকতেই পারবে না। আর এই সারডি গিরিসংকট দখল করতে হলে প্রথমে দখল করতে হবে গিরিসংকটে পৌঁছুনোর রাস্তাটা।

মেজর মোরেট মিথ্যে বলেনি, কাউন্ট ডিকানডিয়া খানিকটা ভাঁড়ই বটে। যোদ্ধা হিসাবেও তার তেমন কোন খ্যাতি নেই। তবে কাউন্টের রয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাহিনী, দলে ট্রেনিং পাওয়া দু'চারজন ইটালিয়ান সৈনিকও আছে। তা ছাড়া, ফাদের ধারণা, ওই এলাকায় আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করবে কাউন্ট, কারণ এক সময় ওদিকেই তার বিশাল ভূ-সম্পত্তি ছিল।

'কাউন্টের ওপর অবিচার করছ তুমি, মোরেট,' ভারি গলায় বলল জেনারেল ফাদ। 'ভুলে যেয়ো না, ইটালিতে প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজন রয়েছে তাঁর। তা ছাড়া, তিনি সত্যিকার একজন কাউন্ট, স্বঘোষিত নন।'

'তা হতে পারেন,' মুখ ভার করে বলল মোরেট। 'কিন্তু তিনি যে কর্নেল নন এ আমি হলপ করে বলতে পারি।'

'তাতে কী হলো?' হেসে উঠল বিশালবপু জেনারেল ফাদ। 'তুমিও তো মেজর নও, আমিও তো জেনারেল নই। ভেবে দেখো

না, উনি যে দয়া করে নিজেকে জেনারেল বলে ঘোষণা করেননি সেটাই কি আশ্চর্য নয়? এ থেকে ওনার পরিমিতি বোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না?'

হেডকোয়ার্টার পৌঁছুনোর পরপরই খবর এল, কাউন্ট আসছেন। কাউন্টকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসবার জন্য মেজর মোরেটকে নীচে পাঠিয়ে দিল ফাদ।

উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে এল কাউন্ট ডিকানডিয়ার রোলস-রয়েস। সন্ধ্যার আবছা আলোয় গাড়িটার হেডলাইট রাক্ষসের বিস্ফারিত চোখের মত লাগল, আকাশ-নীল বডিতে মিহি ধুলোর প্রলেপ লেগে রয়েছে। পাঁচ বছর রোজগারের টাকা এক করলেও এ-ধরনের একটা গাড়ি কিনতে পারবে না মেজর মোরেট, কাউন্টের প্রতি তার বিদ্বেষের সেটাও একটা অন্যতম কারণ।

ডিকানডিয়া লেকরেক, তিন হাজার দক্ষ-অদক্ষ শিফটার অবিসম্বাদিত নেতা, জবরদখল করা বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক, প্রচার লালায়িত কাউন্ট, স্বঘোষিত কর্নেল, কোথাও দু'পা যেতে হলেও রোলস-রয়েস ছাড়া তার চলে না। প্রস্তুতকারকরা তার রুচিমাফিক তৈরি করে দিয়েছে গাড়িটা। মডেলটা ১৯৩০ সালের।

মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে মান্ধাতা আমলের পাথরের তৈরি দালানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস-রয়েস। মোরেট লক্ষ করল, গাড়ির গায়ে ক্ষতচিহ্নের মত অসংখ্য স্টিকার সাঁটা রয়েছে, সবচেয়ে বড়টি দরজার গায়ে, তাতে লেখা—'সাহসই আমার অস্ত্র এবং ভূষণ'।

গাড়ি থামতেই বানরতুল্য ছোটখাট একজন মানুষ, পরনে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম, লাফ দিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। সে নিজেই

পড়ল, নাকি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো বলা কঠিন। একটা গড়ান দিয়েই সিধে হলো, পরমুহূর্তে কাঁকরের উপর একটা হাঁটু গেড়ে বেঢপ আকৃতির ক্যামেরাটা চোখে তুলল সে, ভয়ানক অস্থির এবং সতর্ক—জানে, জেনারেল ফাদের সঙ্গে কাউন্টের দেখা করতে আসবার এই দুর্লভ মুহূর্তটির ছবি ঠিকমত তুলতে না পারলে তার নিতম্বের দফারফা হয়ে যাবে।

ড্রাইভার দরজা খুলে অপেক্ষা করছে, ভিতরে বসে গাড়ি থেকে নামবার প্রস্তুতি নিচ্ছে কাউন্ট ডিকানডিয়া। প্রথমে সে দেখে নিল, তার নিত্যসঙ্গী ক্যামেরাম্যান তথা এইড বানানটো সাতা ঠিক জায়গাটিতে পজিশন নিয়েছে কি না। তারপর নাকের ভিতর পাকানো কাগজের সরু দিকটা ঢুকিয়ে হ্যাঁচ্চো করল। বড়সড় একটা রুমাল দিয়ে প্রথমে ঘাড়, তারপর ভুরু, সবশেষে নাক মুছল। সতর্কতার সঙ্গে ঠিকঠাক করে নিল কালো বেরেটা। বড় করে শ্বাস টানল। তারপর হাসল, আয়নায় তাকিয়ে দেখে নিল হাসিটা। এরপর গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হলো সে।

তার চোখ ঘুমকাতুরে মেয়েদের মত, সারাক্ষণ যেন রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর। গায়ের চামড়া নরম আর রক্তশূন্য সাদাটে। কালো বেরের নীচে বেরিয়ে থাকা চুলগুলো কোঁকড়ানো। পঁয়তাল্লিশের মত বয়স হলেও, চুলে কোন পাক ধরেনি। তুমি যে কলপ লাগিয়েছ সে আমার জানা আছে, ভাবল মোরেট।

লোকটা অস্বাভাবিক লম্বা, ফলে ভিড়ের মধ্যে তাকে টাওয়ারের মত লাগে। ইটালিয়ান কাউন্টদের আনুষ্ঠানিক ড্রেস পরে আছে সে, তাতে বহুবর্ণ পদক আর ফিতের ছড়াছড়ি। গুজব আছে, ঘুমোতে যাবার সময় বা প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে যাওয়ার সময়ও এই পোশাকে থাকে সে। কোমরের খাপে রয়েছে মস্ত একটা ছোরা, হীরে আর মুক্তো বসানো হাতল। নিতম্বের আরেক

পাশে রয়েছে বেরেটা পিস্তল, হাতির দাঁতের বাঁটটা হাতে তৈরি করা। কোমর পেঁচিয়ে থাকা হোলস্টারটা ভুঁড়ির বিদ্রোহ ভাব সাফল্যের সঙ্গে দমিয়ে রেখেছে।

গাড়ির দরজায় পোজ নিল কাউন্ট, খাটো সার্জেন্টের দিকে চোখ গরম করে তাকাল। 'ঠিক আছে, সাতা?' জিজ্ঞেস করল সে। বানানটো সাতাকে যেমন শাসন করে কাউন্ট, তেমনি আদরও করে। তবে কখন যে লাথি মারবে আর কখন চুমো খাবে কেউ তা বলতে পারে না, তার অস্থির মর্জি আর মেজাজের উপর নির্ভর করে সেটা।

'আরেকটু, মাই কাউন্ট!' বিনীত অনুরোধ জানাল বানানটো সাতা। 'আর সামান্য একটু উঁচু করুন চিবুকটা।' জীবনে কে যে কী থেকে বেঁচে থাকবার রসদ আহরণ করে, বলা কঠিন—আদর বা লাঞ্ছনা কখন কপালে জুটবে জানা না থাকায় সারাক্ষণ অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে সে। আদর পেলে আনন্দে গলে গিয়ে কাউন্টের পা চাটে, মার খেলে বুক ভরা আশা আর মুখ ভরা হাসি নিয়ে অপেক্ষা করে কখন আদর জুটবে। এমন প্রভুভক্তি মানবকুলে দুর্লভ।

কাউন্টের চিবুকটা ওদের দু'জনের জন্যই উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ একটা কোণ থেকে তাকালে মনে হয় চিবুক একটা নয় দু'টো।

মুখ প্রায় আকাশের দিকে তুলে চিবুক টান টান করল কাউন্ট। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল বানানটো সাতা, 'হয়েছে! হয়েছে!' ক্যামেরার শাটার টিপে দিল সে।

দরজা থেকে নেমে সিধে হলো কাউন্ট, তার নড়াচড়ায় সোনা-রুপো-পিতলের পদকগুলো একযোগে বেজে উঠল। তার সামনে

দাঁড়িয়ে স্যালুট করল মেজর মোরেট। এরপর কাউন্টের নিজস্ব বাহিনী তাকে গার্ড অভ অনার দিল। স্যালুট গ্রহণ করে মেজরের দিকে তাকাল কাউন্ট।

থেমে থেমে সামরিকসুলভ হাঁক ছাড়ল মোরেট, 'জেনারেল আবদেল কাদের ফাদ মহামান্য কাউন্টের জন্যে অপেক্ষা করছেন!'

'খবর পেয়ে প্রথমে আমি আমার বাহিনীকে পাঠিয়েছি,' সার বেঁধে সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের সৈনিকদের দিকে তাকাল কাউন্ট, গর্বে তার ছাতি কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল। 'জেনারেল ফাদ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে ইচ্ছে করলে গোটা ইথিওপিয়া দখল করে নিতে পারি আমি?'

ভাঁড়, মনে মনে বলল মোরেট, কী বলছে নিজেও জানে না! ইথিওপিয়া দখল করতে হবে না, ওয়েলস অভ চান্ডিতে গিয়ে উটের মুত খাও গে। 'এদিকে,' পথ দেখিয়ে সবিনয়ে বলল সে, 'মহামান্য কাউন্ট!'

জেনারেল ফাদের অফিসে ঢুকেই কাউন্ট ঘোষণা করল, 'যুদ্ধযাত্রার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি।' নাটকীয় ভঙ্গিতে দ্রুত পায়চারি শুরু করল। 'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ এবং ধন্য। বলুন, জেনারেল, কোথায় শত্রু? কোথায় তারা? আমি তাদের বংশ ধ্বংস করে দেব! আমি তাদের...' চমৎকার ভাষা, পরে আবার ব্যবহারের জন্য মনে গেঁথে রাখা দরকার, নিজেকে পরামর্শ দিল সে।

শান্তভাবে, মৃদু হেসে, জেনারেল ফাদ বাধা দিল তাকে, 'আলোচনার আগে দুঢোক হুইস্কি খেলে হত না, মাই ডিয়ার কাউন্ট ডিকানডিয়া?'

জেনারেলের সামনে থামল কাউন্ট, তার হাতে চুমো খেলো। 'আওয়ারস ইজ দ্য ভিক্টরি! আপনি আমাকে যে কোন রণাঙ্গনে

পাঠাতে পারেন, কথা দিচ্ছি রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে বিজয় আমি ছিনিয়ে আনবই। তবে, হ্যাঁ, নির্দেশ পাবার আগে খানিকটা হুইস্কি খেয়ে নেয়া দরকার বটে।'

কাউন্টকে প্রায় গোটা একটা বোতল হুইস্কি খাইয়ে আলোচনা শুরু করল জেনারেল ফাদ। আলোচনা মানে, নির্দেশটা উচ্চারণ করল।

'ওয়েলস অভ চাল্ডি,' পুনরাবৃত্তি করল কাউন্ট, হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। লাফ দিল সে, টেবিলের কোনায় কোমরের ধাক্কা লাগায় হুইস্কির বোতল আর গ্লাস মেঝেতে পড়ে গেল। উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করল সে, উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে তার চিবুক, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে মুখের রঙ। 'সম্মান হারানোর আগে মৃত্যুও শ্রেয়!' গর্জে উঠল সে, মদ তাকে ভালভাবেই ধরেছে।

'উত্তেজিত হবেন না, কাউন্ট,' অভয়দানের সুরে বলল জেনারেল ফাদ। 'আপনাকে আমি শুধু একটা অরক্ষিত ওয়াটার-হোল-এ পজিশন নিয়ে পাহারায় থাকতে বলছি, তার বেশি কিছু না।'

কিন্তু কাউন্ট তার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। 'আপনি আমাকে বীরত্ব প্রদর্শনের এই বিরাট সুযোগ দেয়ায় আমি ধন্য! এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার বিকল্প যদি মৃত্যুও হয়, তা-ও আমি বরণ করে নেব।' নতুন একটা চিন্তা মাথায় ঢুকতে পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'আপনি অবশ্যই আমাকে আর্মার আর এয়ার ক্রাফট দিয়ে সাহায্য করবেন, জেনারেল?'

'ওসবের কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না,' মৃদুকণ্ঠে বলল ফাদ, বীরত্ব আর মৃত্যুর প্রসঙ্গ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে

দিয়েছে তাকে। প্রতিপক্ষ যেখানে নগণ্য, সম্রাট হাইলে সেলাসি যেখানে সেনাবাহিনী পাঠাবেন না, সেখানে যুদ্ধ করার সুযোগ কোথায়? কিন্তু এমন কিছু সে বলবে না যাতে আহত হয় কাউন্ট। মি. এক্সের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এই লোক। 'ওখানে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।'

'কিন্তু শত্রুকে ছোট করে দেখা উচিত নয়,' বলল কাউন্ট। 'যদি বাধা পাই?'

চেয়ার ছেড়ে কাউন্টের সামনে দাঁড়াল জেনারেল ফাদ, তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'আপনার কাছে তো রেডিও আছেই, সাহায্য দরকার হলে জানাবেন আমাকে। আর হ্যাঁ, সাবধান থাকবেন, আপনার বাহিনী যেন সারডি গিরিসংকট

দখল করার আগে লুঠপাঠ শুরু না করে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো কাউন্ট। 'আওয়ারস ইজ দ্য ভিক্টরি,' হুংকার ছাড়ল সে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলল ফাদ। অকস্মাৎ চরকির মত আধপাক ঘুরে গিয়ে দরজার দিকে ছুটল কাউন্ট, হাঁক ছাড়ল, 'সাতা!'

গলায় মস্ত ক্যামেরা ঝুলিয়ে দরজার আড়ালে এই ডাকের আশাতেই লুকিয়ে ছিল বানানটো সাতা, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে উদয় হলো সে, ব্যস্ত হাতে ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করছে।

জেনারেল ফাদের কব্জি ধরে জানালার দিকে টেনে নিয়ে চলল কাউন্ট। 'আশা করি, জেনারেল কিছু মনে করবেন না? ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে জানালাটা আমার পছন্দ।' ফ্রেমটা কারুকাজ করা। জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে পোজ নিল সে।

'দু'জন আরও ঘনিষ্ঠ হোন, প্লিজ। একটু পিছিয়ে যান, জেনারেল, প্লিজ–মহামান্য কাউন্টকে আপনি আড়াল করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। চিবুকটা, মাই কাউন্ট, একটু উঁচু

করুন। বাহ্, চমৎকার!' হতচকিত জেনারেলের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, শাটার টিপে দিল সাতা।

ডিকানডিয়া বাহিনীতে একমাত্র সত্যিকার যোদ্ধা হলো লুইগি রাকা। বাহিনীর কমান্ডার কাউন্ট হলেও, যুদ্ধের তেমন কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই, এবং সে একটা কাপুরুষও বটে। ইটালিয়ান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর রাকা, একটা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ মাথায় নিয়ে বছর পনেরো আগে ইরিত্রিয়ায় পালিয়ে এসেছিল, ভাগ্য তাকে কাউন্ট ডিকানডিয়া বাহিনীর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। বলতে গেলে তার একক প্রচেষ্টায় ভোর পাঁচটার দিকে যুদ্ধযাত্রার জন্য সৈনিক বাছাইয়ের কাজটা শেষ হলো। ছয়শো নব্বুইজনের একটা দল, নাম দেওয়া হলো থার্ড ব্যাটালিয়ান। আসমারার পাহাড়ী রাস্তায় ট্রাক বহর দাঁড়িয়ে আছে, গ্রেটকোট পরা সশস্ত্র সৈনিকরা চড়ছে তাতে। রোলস-রয়েসের সামনে এবং পিছনে মটরসাইকেল আউটরাইডাররা সবাই যে-যার আসনে বসে অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে ডিকানডিয়া বাহিনীর শিফটাদের মধ্যে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা মিশনে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে, প্রতিপক্ষরা সংখ্যায় তাদের চারগুণ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মেস সার্জেন্ট নাকি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কান্নাকাটি করেছেন কাউন্ট ডিকানডিয়া, জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে মদ্যপানের সময় তিনি নাকি তাঁর ভাবাবেগ চেপে রাখতে পারেননি। ওই মদ্যপানের আসরেই ব্যাটালিয়ানের স্লোগান নির্বাচিত হয়েছে–'সম্মান হারানোর আগে মৃত্যুও শ্রেয়'।

রোদ উঠবার পর গ্রেটকোট খুলে ফেলতে হলো, সৈনিকদের

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়বার অবস্থা, অথচ এখনও যাত্রা শুরুর আদেশ আসছে না। কে যেন একবার বলেছিল, যুদ্ধ হলো শতকরা নিরানব্বুই ভাগ একঘেয়েমি, এক ভাগ চরম আতংক। থার্ড ব্যাটালিয়ান নিরানব্বুই ভাগের যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

সময় গড়িয়ে চলল। দুপুরের দিকে তৃতীয় বারের মত কর্নেলের কোয়ার্টারে মেসেঞ্জার পাঠাল মেজর রাকা। এবারই প্রথম একটা উত্তর পেল সে–কাউন্ট নাকি সত্যি সত্যি বিছানা ত্যাগ করেছেন, এবং প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার অবশ্যপালনীয় কাজটি প্রায় শেষ করে এনেছেন। একটু পরই তিনি থার্ড ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে যোগ দেবেন।

অবশেষে উদিত সূর্যের মত কাউন্টের আগমন ঘটল–চেহারা উত্তেজনায় উদ্ভাসিত, বুক ফুলে আছে গর্বে। তার দু'পাশে দু'জন ক্যাপটেন, সামনে একজন রাইফেলধারী সৈনিক। জুনিয়র অফিসারদের আলিঙ্গন করল কাউন্ট ডিকানডিয়া, চটপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল সাতা। সিনিয়র নন কমিশনড অফিসারদের আলিঙ্গন নয়, তাদের শুধু পিঠ চাপড়ে দিল কাউন্ট, আর সাধারণ শিফটা সৈনিকদের দিকে ফিরে উপহার দিল উষ্ণ হাসি। সবশেষে মেজরের দিকে ফিরে বলল, 'সুশৃংখল বীর যোদ্ধাদের দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।'

আঁতকে উঠল মেজর রাকা। কাউন্টের প্রায়ই গান গাইতে ইচ্ছে করে। ইটালির বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা তাকে গান শিখিয়েছেন, পঁচিশ কি ত্রিশ বছর আগে, শিশু কাউন্টের তখন ভারি ইচ্ছে হত অপেরায় যোগ দেবে। চর্চা না থাকায় তার গলা আর ভেড়ার ডাকে এখন আর তেমন কোন পার্থক্য নেই।

সম্মান হারানোর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়, এই শিরোনামে একটা গানও লিখে ফেলেছে কাউন্ট। বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী সে,

রণক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতির বিশাল অঙ্গন, সবখানে তার অনায়াস পদচারণা। সে গাইল, তার সঙ্গে অফিসারসহ ছশো নব্বুইজন শিফটাও গাইল।

গান থামবার সঙ্গে সঙ্গে খাপে ভরা ছোরার হাতলে হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠল কাউন্ট, 'যথেষ্ট হয়েছে! যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। ম্যাপটা কোথায়?' ম্যাপ কেস নিয়ে ছুটে এল একজন অধস্তন।

'কর্নেল, স্যার,' লুইগি রাকা কৌশলে বাধা দিল, 'রাস্তা আমাদের সবারই চেনা, সাইনপোস্টও আছে...।' সৈনিকরা বেশিরভাগ হয় ইরিত্রিয়া নয়তো ইথিওপিয়ায় জন্মেছে, চোখ বুজে চিনে নিতে পারবে পথ।

মেজরকে পাত্তা না দিয়ে রোলস-রয়েসের বনেটের উপর সদ্য ভাঁজ খোলা ম্যাপের দিকে ঝুঁকে পড়ল কাউন্ট। কয়েক সেকেন্ড পর মুখ তুলল সে, ক্যাপটেন দুজনের দিকে তাকাল। 'তোমরা দুজন আমার দু'দিকে দাঁড়াও। মেজর রাকা, তুমি এখানে। চেহারায় এমন ভাব ফোটাও যাতে দেখে মনে হয় তুমি একটা নির্দয় গোঁয়ার। কিন্তু খবরদার, ক্যামেরার দিকে তাকাবে না! সাতা!'

বানানটো সাতা ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। ফটো তুলবার পর রওনা হলো ট্রাক বহর। কলামের সামনে রোলস-রয়েস, দু'পাশে মটরসাইকেল আউটরাইডার।

কিন্তু দেড় মাইল এগোবার পর কাউন্টের নির্দেশে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস-রয়েস। কারণ আর কিছুই নয়, রাস্তার ধারে ক্যাসিনোর উপর চোখ পড়েছে তার। রোলস-রয়েসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনের ট্রাক বহরও।

সবাই জানে কয়েকজন ইটালিয়ান চালায় ক্যাসিনোটা, কিন্তু

খুব কম লোকই জানে ওটার মালিক আসলে আবদেল কাদের ফাদ। ছ'মাসের চুক্তিতে ইটালি থেকে যুবতী মেয়েদের নিয়ে আসা হয়, অতি ব্যবহারে বিধ্বস্ত মেয়েগুলোর মধ্যে থেকে খুব কম সংখ্যকই চুক্তি নবায়নে রাজি হয়। তবে এই ছ'মাসে যৌতুক দেওয়ার মত যথেষ্ট টাকা জমা হয় তাদের হাতে, দেশে ফিরে স্বামী খুঁজবার জন্য অস্থির হয়ে থাকে।

ক্যাসিনোয় ঢুকে বার-এ আসন গ্রহণ করল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ম্যানেজার। বারকয়েক গোঁফ মুচড়ে কাউন্ট তাকে বলল, 'তুমি জানো আমি কি চাই।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিজেদের কামরা থেকে বেরিয়ে এল মেয়েগুলো। খানিক পর দেখা গেল তাদের মাঝখানে অদৃশ্য হয়েছে ডিকানডিয়া, নারীদেহের কোমল স্তূপে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে সে।

এক ঘণ্টা পর ক্যাসিনো থেকে কাউন্টের একটা মেসেজ পেল মেজর লুইগি রাকা। আঁকাবাঁকা হরফে কাউন্ট লিখেছে, 'এই মুহূর্তে আমি ভয়ানক ব্যস্ত। কাল ভোরে আবার আমরা অগ্রসর হব।'

পরদিন সকাল দশটায় আবার থার্ড ব্যাটালিয়ান যাত্রা শুরু করল। কাউন্ট স্বকণ্ঠে কোন নির্দেশ দিতে পারছে না, কারণ কাল রাতে দীর্ঘ সময় গান গাওয়ায় তার গলা ভেঙে গেছে, কথা বলতে চেষ্টা করলে ইঁদুরের ডাক ছাড়া কিছুই বেরুচ্ছে না। আকার-ইঙ্গিতে কাজ সারছে সে। এই মুহূর্তে তাকে খানিকটা অপ্রকৃতিস্থও বলা যায়, কারণ গান গাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাতভর মদ্যপান করেছে সে। তা ছাড়া, শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বলও হয়ে পড়েছে—দুটো মেয়েকে দু'পাশে নিয়ে শুলে যা হয়, তাও আবার ইটালিয়ান মেয়ে!

খানিকটা মাতাল হলেও, অতীত বিস্মৃত হয়নি কাউন্ট। শিফটাদের নেতা হলে কী হবে, সম্মুখসমরে কখনও অংশগ্রহণ করেনি সে। ডাকাতি করতে গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে লড়েছে তার বাহিনী, সে পিছনে থেকে ওদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছে। তবে যারা লড়ে তাদের অবস্থা কী হতে পারে সে-সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা আছে। আদিবাসী গালা বা রাসটাফারিয়ানরা শিফটাদের একবার বন্দী করতে পারলে হয়, প্রচুর সময় নিয়ে তারা ওদের টেসটিক্‌ল্‌ কাটে, তারপর ছেড়ে দেয়।

দ্বিতীয়বার রওনা হবার দু'ঘণ্টা পর নিজের কণ্ঠস্বর খানিকটা ফিরে পেল কাউন্ট ডিকানডিয়া। 'স্টপ!' চিৎকার করল সে। 'এই মুহূর্তে থামো!'

ট্রাক বহর দাঁড়িয়ে পড়ল। জুনিয়র অফিসাররা হৈ-চৈ শুরু করল। তাদেরকে পিছনে ফেলে রোলস-রয়েসের দিকে ছুটে এল মেজর লুইগি রাকা। কাউন্টের তরফ থেকে তাকে জানানো হলো, যুদ্ধযাত্রার কৌশলে টেকনিক্যাল পরিবর্তন আনবার জন্য নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কাউন্ট এখন আর থার্ড ব্যাটালিয়ানের সামনে থাকবে না, ট্রাক বহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করবে সে, রোলস-রয়েসের দু'পাশে থাকবে ছ'জন মটরসাইকেল আউটরাইডার।

নতুন আয়োজন সম্পূর্ণ হতে এক ঘণ্টার মত লাগল। আবার অগ্রসর হলো থার্ড ব্যাটালিয়ান। রোলস-রয়েসের নরম আসনে গা এলিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কাউন্ট ডিকানডিয়া। তার তলপেটের কাছে এখন আর কোন রকম অস্বস্তিকর অনুভূতি নেই।

পরদিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে ডিকানডিয়া বাহিনী ধু-ধু মরুভূমির

কিনারা থেকে আবার যাত্রা শুরু করল। সামনের মাটি পাথরের মত শক্ত আর অসমান, এখানে সেখানে কিছু বিবর্ণ শুকনো ঘাস ছাড়া গাছপালার কোন চিহ্ন নেই। মরুভূমির দূর প্রান্ত ক্রমশ উঁচু হয়ে দিগন্তরেখার সঙ্গে মিশেছে, ফলে কাউন্টের মনে হলো তারা যেন বিশাল একটা পিরিচের মাঝখানে রয়েছে। লালচে পাথুরে মাটিতে মস্ত কোন থাবার আঁচড় যেন পথটা, এতই গভীর যে মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা অংশের সঙ্গে রোলস-রয়েসের চেসিস খানিক পরপরই ঘষা খাচ্ছে। কনভয়টা পিছনে ফেলে আসছে লালচে ধুলোর বিশাল মেঘ।

ধু-ধু মরুপ্রান্তরে বিপদের কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে সাহস ফিরে এল কাউন্টের মনে। 'কলামের মাথায় চলো,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে। কলামের মাঝখান থেকে বেরিয়ে ট্রাক বহরকে পাশ কাটাতে শুরু করল দ্রুতগতি রোলস-রয়েস। খানিক পর সামনে দেখা গেল মেজর রাকাকে, রোলস-রয়েস তাকে তীরবেগে পাশ কাটাল, স্যালুটের জবাবে মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট। তার জানার কথা নয়, মনে মনে তাকে গাল দিচ্ছে মেজর, 'বানচোত!'

আবার কাউন্টের কাছে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগল মেজরের। সে দেখল, রোলস-রয়েসের বনেটে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছ কাউন্ট, চোখে বিনকিউলার, আক্ষরিক অর্থেই বনেটের উপর ধেই ধেই করে নাচছে সে, বানানটো সাতার উদ্দেশে চিৎকার করছে, 'রাইফেল, আমার রাইফেল!'

লেদার কেস থেকে ম্যানকিলার নাইন পয়েন্ট থ্রি এম এম স্পোর্টিং রাইফেলটা বের করল সাতা, ওটার বাঁট ও স্টক সীজন করা ওয়ালনাটের তৈরি, আর নীল ইস্পাতের গায়ে চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে রচিত হয়েছে শিকারের কিছু খুদে দৃশ্য—ঘোড়সওয়ার

শিকারী, শিকারী কুকুর ধাওয়া করছে হিংস্র সিংহকে। চোখ থেকে বিনকিউলার না নামিয়েই মেজর রাকাকে নির্দেশ দিল কাউন্ট। 'রেডিওর এরিয়াল লম্বা করো, জেনারেল ফাদকে মেসেজ পাঠাও। সারডি গিরিসংকটে পৌঁছুনোর সব ক'টা পথ অচিরেই আমরা দখল করে নেব।' মেজরকে আরও একটা কাজ করতে হবে। ক্যাসিনো থেকে কাঠের মিহি গুঁড়োয় মুড়ে কয়েক মণ বরফ নিয়ে আসা হয়েছে, তা থেকে খানিকটা বের করে এক বালতি পানি ঠাণ্ডা করা হোক। কাউন্টের ধারণা, পরবর্তী পদক্ষেপ যেটা সে নিতে যাচ্ছে, তাতে বেশ খানিকটা ঘাম ঝরবে তার, ফলে পিপাসা মেটানোর জন্য ঠাণ্ডা পানির দরকার হবে।

মেটে রঙের একদল মরু হরিণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কাউন্ট। এক মাইল দূরে ওগুলো, তাপ-তরঙ্গের ভিতর ঝাপসা দেখাচ্ছে, শান্ত ভঙ্গিতে ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে ঝাঁকটা। দূর আকাশের গায়ে খাড়া শিংগুলোই শুধু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কাউন্ট।

কাউন্টকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রোলস-রয়েস, ইতিমধ্যে তার হাতে রাইলেটা ধরিয়ে দিয়েছে সাতা। দূরত্ব কমে সিকি মাইলটাক দাঁড়াল, তবে ধাওয়া করা হচ্ছে বুঝতে পেরে হরিণের দলটাও ছুটতে শুরু করেছে। ড্রাইভারকে ফাঁসিতে লটকানো হবে, বারবার ঘোষণা করল কাউন্ট, মৃত্যুদণ্ড পেয়েও আরও জোরে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করল লোকটা। কাউন্ট ভীষণ উত্তেজিত, আফ্রিকায় আসবার পর এই প্রথম সে বড় একটা কিছু শিকার করবার সুযোগ পেয়েছে। মোট আটটা হরিণ, ঝাঁকের সামনে রয়েছে দুটো মর্দা, মাদী আর বাচ্চারা রয়েছে পিছনে। দূরত্ব ক্রমশ কমে এল। সামনের একটা ধাড়ি কে জানে কেন পিছিয়ে পড়েছে দল থেকে,

সেটাকেই ধাওয়া করবার জন্য বেছে নিল কাউন্ট। হরিণটার বিশ গজ পাশে চলে এল গাড়ি। ওদের দিকে ওটা একবারও তাকাল না, তবে প্রাণপণে ছুটছে।

'হল্ট!' গর্জে উঠল কাউন্ট, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল ড্রাইভার ডিনো। ধুলোর পাহাড় তুলল রোলস-রয়েস, ঢাকা পড়ে গেল গাড়ি। ধুলো সরে যাবার পর দেখা গেল ধাড়ি হরিণটা প্রায় তিনশো গজ দূরে সরে গেছে, এখনও দলের অনেক পিছনে ওটা, তবে আগের মতই ছুটছে। শক্ত মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল কাউন্ট ডিকানডিয়া, রাইফেলটা হাত থেকে ছিটকে পড়ছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, রাইফেলের খোঁজে চরকির মত ঘুরল বার কয়েক। সেটা তুলে যখন সে গুলি করবার জন্য তৈরি হলো, হরিণটা তখন চারশো গজ দূরে—রেঞ্জের প্রায় বাইরেই বলা যায়। তবু গর্বিত ভঙ্গিতে গুলি করল কাউন্ট, সঙ্গে সঙ্গে রিকয়েলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল সে।

ছিটকে পড়ল হরিণটাও। পড়েই লাফ দিল ওটা, শুকনো একটা নালা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল উঁচু পাড়ের ওদিকে। পেলভিসের কয়েক ইঞ্চি সামনের স্পাইনাল কলাম গুঁড়ো হয়ে গেছে ওটার, শরীরের পিছনের দিকটায় কোন সাড়া নেই, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

নালা পেরিয়ে উঁচু পাড়ের কিনারা দিয়ে উঁকি দিতেই হরিণটাকে পড়ে থাকতে দেখল কাউন্ট। তাড়াতাড়ি সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, দাঁতে দাঁত চেপে তাড়া লাগাল সাতাকে। ডিকানডিয়ার হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল, নাটকীয় ভঙ্গিতে শিংসহ মাথার দিকে সেটা তাক করে পোজ নিল সে। ছবি তুলবার জন্য মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল সাতা।

ঠিক এই সংকটময় মুহূর্তে নড়ে উঠল হরিণটা, বসবার ভঙ্গিতে

উঁচু হলো, ঘোলাটে দৃষ্টি তুলে তাকাল কাউন্টের দিকে। স্থানীয়ভাবে ওগুলোকে বেইসা বলা হয়, আফ্রিকার হিংস্রতম প্রজাতির অন্যতম, লম্বা শিং দিয়ে এমনকী প্রাপ্তবয়স্ক সিংহকেও বধ করতে পারে। এই ধাড়িটার ওজন চারশো পঞ্চাশ পাউন্ড, কাঁধ পর্যন্ত চার ফুট লম্বা, তার উপর আরও তিন ফুট লম্বা তার শিং।

আহত হরিণটা নাক টানল, পোজ দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ডাইভ দিল কাউন্ট, মাটিতে পড়ে ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে ছুটল গাড়ির দিকে। তাকে ধাওয়া করল হরিণটা।

দৌড় প্রতিযোগিতায় ছ'ইঞ্চি এগিয়ে থাকল কাউন্ট, রোলস-রয়েসের ব্যাকসিটে উঠে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল সে, দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল, চোখ বন্ধ। গাড়ির গায়ে গুঁতো মারল হরিণ, ভিতর দিকে তুবড়ে গেল একটা দরজা, শিঙের খোঁচায় গা থেকে রঙ উঠে গেল।

শুধু শরীরের চাপ দিয়ে ধরণীর ভিতর সেঁধিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বানানটো সাতা, হুবহু সাইরেনের মত ওঁয়া-ওঁয়া আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার, কিন্তু পরবর্তী ধাক্কায় উইন্ডশীল্ডে লেগে তার মাথা কেটে গেল। রক্তাক্ত ড্রাইভার কাঁদো কাঁদো সুরে অনুনয় করল, 'ওটাকে মারুন, মাই কাউন্ট! গুলি করুন, প্লিজ! দানবটাকে হত্যা করুন!'

কাউন্টের ঊর্ধ্বাঙ্গ আকাশমুখী হয়ে রয়েছে। গাড়ির পিছনের সিটের উপর তার শুধু ওইটুকু অংশই দেখা যাচ্ছে। তবে তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সবাই, 'রাইফেল, আমার রাইফেল!'

বুলেটটা মেরুদণ্ড গুঁড়ো করে দিয়ে ফুসফুসটাকেও ফুটো করেছে, ছুটোছুটি করায় হঠাৎ ওটার একটা বড় শিরা ছিঁড়ে গেল। যন্ত্রণায় কাতর একটা শব্দ করে কাত হয়ে পড়ে গেল ওটা, নাকের

ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুল।

নির্জন মরুপ্রান্তরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর পিছনের দরজার পাদানির কাছে কাউন্টের ফ্যাকাসে মুখ দেখা গেল, চোখে আতংক নিয়ে মৃত হরিণটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা নড়ছে না দেখে আশ্বস্ত হলো সে। সতর্কতার সঙ্গে রাইফেলটার খোঁজে এদিক ওদিক হাত বাড়াল। এতই কাঁপছে তার হাত, এত কাছে থেকেও ছ'টার মধ্যে দুটো গুলি লাগাতে পারল না। তার মাথায় এই চিন্তাটা একবারও ঢুকল না যে মরাটাকে মারছে সে। লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট দুটো একটুর জন্য মাটিতে পড়ে থাকা সাতার গায়ে লাগল না।

রাইফেল ফেলে দিয়ে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক কী যেন খুঁজল কাউন্ট। খানিকটা সামনে ছোট একটা ঝোপ দেখতে পেয়ে সেদিকে হাঁটা ধরল সে। হাঁটছে দু'পা ফাঁক করে, ভঙ্গিটা ভারি আড়ষ্ট। অবশ্য তার একটা কারণ আছে। মরে গেলেও কথাটা কারও কাছে স্বীকার করবে না কাউন্ট ডিকানডিয়া। মনোগ্রাম করা তার সিল্ক আন্ডারওয়্যার নোংরা হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে ওটাকে বিসর্জন না দিলেই নয়।

সাত

পাপাগোয়াকে সামলানোর দায়িত্ব মুসলিম নাবিকদের উপর ছেড়ে দিয়ে ক্যাপটেন কোস্টাস অ্যারোনিকাস পরপর পাঁচদিন তার কেবিন থেকে প্রায় বেরুলোই না, মেজর মাইকেল সেভারসের সঙ্গে রামি খেলায় মশগুল হয়ে থাকল। 'জীবনে আর আছে কী,' প্রস্তাবটা মাইকেলই তাকে দেয়, 'এসো, সমুদ্রভ্রমণের একঘেয়েমি

দূর করার জন্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা যাক।' এক পাটি তাস সব সময় তার পকেটেই থাকে।

পাঁচ দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় অ্যারোনিকাসের মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। ভাল কার্ড বারবার শুধু মেজরই পাবে কেন? কিন্তু সর্বনাশ যা ঘটবার তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, আর কিছু করবার নেই। এমনও নয় যে চৌর্যকর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে, কীসের উপর ভিত্তি করে প্রতিবাদ জানাবে সে?

ঠিক হয়েছিল কার্গো ও আরোহীদের ভাড়া বাবদ ক্যাপটেনকে এক হাজার তিনশো স্টার্লিং দিতে হবে। পুরোপুরি এক হাজার তিনশো স্টার্লিং জিতবার পর ক্যাপটেনের মুখের উপর গাল ভরা বিজয়ীর হাসি ছুঁড়ে দিয়ে মাইকেল বলল, 'তুমি কী বলো, কোস্ট, ওল্ড স্পোর্ট, সাময়িক বিরতি দিলে হত না? ডেকে গিয়ে একটু হাত-পা নাড়া যেত?'

খেলতে বসবার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ায় খোলা ডেকে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে আছে মাইকেল, ওখানে অ্যানি উইসপার আর মাসুদ রানার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার মাত্রা তার মানসিক প্রশান্তির জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য যতবারই ক্যাপটেনের কেবিন থেকে সে খোলা ডেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, প্রতিবার ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে। শুধু একসঙ্গে দেখেনি, হো-হো হি-হি করে হাসতেও শুনেছে–আরও খারাপ লক্ষণ হলো, রানার চেয়ে বেশি হেসেছে অ্যানি, শরীর কাঁপানো স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। রানাকে বেশিরভাগ সময় কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছে মাইকেল। হয়তো আর্মারড কারগুলো স্টার্ট দিয়ে পরীক্ষা করছে, না চাইতেই সাহায্যের জন্য ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে অ্যানি, যন্ত্রপাতি এগিয়ে

দিচ্ছে। আবার কখনও নেই কাজ তো খই ভাজ, মাঝখানে আব্বাসকে নিয়ে ডেকের উপর বসেছে দু'জন, গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে অ্যামহারিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা চলেছে। সন্দেহের কাঁটা খচ খচ করে বিঁধছে মাইকেলের মনে, না জানি আরও কত কী করছে ওরা!

তবে কোন্ কাজটা কতটুকু জরুরী মাইকেল জানে, জানে কোনটা আগে সারতে হবে। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল কোস্টাস অ্যারোনিকাসের কাছ থেকে ভাড়ার টাকাগুলো উদ্ধার করা। সেটাতে সফল হওয়ায় এখন সে অ্যানি উইসপারের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে। রানার কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনা তার জন্য কোন সমস্যাই নয়। অবশ্য মেয়েটা খুব কঠিন পাত্রী, নিজের ফাঁদে ঠিকমত ফেলতে হলে আদাজল খেয়ে লাগতে হবে। কাজটায় খাটনি আছে, তবে পুরস্কারের কথাটাও ভাবো একবার–গাছ ভর্তি ডাঁসা পেয়ারা।

'তোমার সাথে খেলে সত্যি ভারি মজা পেলাম, কোস্টা,' চেয়ার ছেড়ে উঠল মাইকেল, পুরোপুরি সিধে হতে সময় নিচ্ছে সে–নোটগুলো তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে দু'পকেটে ভরছে।

ক্যাপটেনও তার ঢোলা জোব্বার নীচে হাত গলিয়ে দিল। হঠাৎ বেরিয়ে এল অলংকৃত হাতলসহ লম্বা একটা ছুরি, মাথার দিকটা বিপজ্জনক আকৃতি নিয়ে বাঁকানো। হাতের তালুতে ছুরিটা নিয়ে একচোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফেলল মাইকেলের দিকে। 'তাস বাঁটো,' হিসহিস করে উঠল সে।

নির্ভয়ে হাসল মাইকেল, তবে ধপ্ করে আবার বসে পড়ল চেয়ারটায়। তাস তুলে নিয়ে সশব্দে ফাঁটতে শুরু করল সে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ছুরিটা, যদিও মাইকেলের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে অ্যারোনিকাস।

'সত্যি কথা বলতে কি, আরও দু'চার হাত খেলার ইচ্ছে রয়েছে আমার,' বিড়বিড় করল মাইকেল। 'তুমি বোধহয় সামান্য উত্তেজিত হয়ে আছ, কী?'

কোর্স বদলে গালফ অভ এডেনে ঢুকছে পাপাগোয়া। আরও পাঁচশো মাইল যেতে হবে ওদেরকে।

চেহারায় সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ভিতরে ঢুকল হিন্দু একজন মেট, ক্যাপটেনের কানে ফিসফিস করল সে।

'ওর সমস্যাটা কী?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

'ওর ভয়, আমরা না নৌ-টহলের সামনে পড়ে যাই।'

'সে ভয়ে আমিও তো কাঁপছি,' বলল মাইকেল। 'আমাদের বোধহয় ডেকে যাওয়া উচিত।'

'বাঁটো!' চাপা গলায় গর্জে উঠল অ্যারোনিকাস।

হঠাৎ করে এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেল, থরথর করে কাঁপতে শুরু করল জাহাজ। ফুলস্পীডে ছুটছে ওরা। সবগুলো পালও তোলা হয়েছে, গালফ অভ এডেন ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি লোহিত সাগরে ঢুকে পড়তে চায় মেট। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, পশ্চিম আকাশে মেঘের ভেলাগুলো টকটকে লাল। বুদ্ধি করে গালফের ঠিক মাঝখান দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছে মেট, ডান দিক থেকে আরব জাহান ওদেরকে দেখতে পাবে না, বাম দিক থেকে আফ্রিকাও দেখতে পাবে না। আশাতীত অনুকূল বাতাস পাওয়ায় পাপাগোয়ার গতি এখন পঁচিশ নট। তার সেরা একজন লোককে টেলিস্কোপ ধরিয়ে দিয়ে মাস্তুলের মাথায় তুলে দিল মেট। মেয়ে পাচারের অভিজ্ঞতা আছে তার, জানে নৌ-টহলের হাতে ধরা পড়লে কীভাবে ছাড়া পেতে হয় বা ছাড়া না পেলে কী শাস্তি ভোগ করতে

হয়। কিন্তু অস্ত্র পাচার সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। ধরা পড়লে আইনে কী শাস্তির কথা লেখা আছে তাও তার অজানা। কাজেই সাবধানের মার নেই ভেবে মাস্তুলের মাথায় একজনকে পাহারায় বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

প্রায় নাক বরাবর সামনে সূর্য, ডুবতে যন্ত্রণাকর দীর্ঘ সময় নিচ্ছে। বাতাসের গতিবেগও বাড়তির দিকে, ঢেউয়ের মাথা থেকে পাপাগোয়াকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে নীচের গভীর গহ্বরে।

হামাগুড়ি দিয়ে নিতম্বিনীর এঞ্জিন হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এল রানা, অ্যানি উইসপারের চোখে চোখ রেখে হাসল। আর্মারড কারের মাথায় বসে আছে সে, ঝুলে থাকা পা দুটো দোল খাচ্ছে অলসভঙ্গিতে, টানা বাতাসে পতাকার মত উড়ছে সোনালি চুল। গত ক'দিনের রোদে তার গায়ের রঙ আরও গাঢ় হয়েছে, চেহারার ম্লান ভাবটুকুও এখন আর নেই। কিশোরী স্কুলছাত্রীর মত লাগছে তাকে, হাসিখুশি আর ছটফটে, দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ এখনও যাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

'সাধ্যমত করলাম,' বলল রানা, অ্যামোনিয়ায় ভেজানো বুরুশ দিয়ে হাত থেকে গ্রিজ পরিষ্কার করল। 'ভবিষ্যতের কথা জানি না, এখন তো বেশ ভালই চলছে এঞ্জিনটা।' অ্যানির হাঁটু রানার চোখের সঙ্গে একই সরলরেখায় রয়েছে, দুধ-আলতা রঙের উরুর অনেকটা উপরে উঠে গেছে তার স্কার্ট। সেদিকে চোখ পড়তে, দম বন্ধ হয়ে এল রানার। ওর দৃষ্টি কোন্ দিকে টের পেয়ে গেল অ্যানি, ঝট্ করে দুই হাঁটু এক করল সে, যদিও ক্ষীণ একটু হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। হালকা লাফ দিয়ে ডেকে নামল সে, কাত হতে শুরু করা ডেকে স্থিরভাবে দাঁড়ানোর জন্য রানার হাতের শক্ত পেশীতে আঙুল পেঁচাল।

সুদর্শন একজন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি দারুণ উপভোগ করছে

অ্যানি উইসপার, একটানা পাঁচ দিন মাইকেল সেভারসের অনুপস্থিতিতে একঘেয়েমির শিকার হতে হয়নি তাকে। ধীর ভঙ্গিতে ঘাড় একটু বাঁকা করে রানার দিকে ফিরে হাসল সে। রানা লম্বা, তা সত্ত্বেও মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল কান দুটো প্রায় ঢেকে রাখায় চেহারায় বালকসুলভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। সুগঠিত পুরুষালি চোয়াল, চোখের কোণে সূক্ষ্ম কুঞ্চনের সমষ্টি অবশ্য সে-ভাবটুকু ম্লান করে দেয়।

একেবারে হঠাৎ করেই বুঝতে পারল অ্যানি, চুমো খাওয়ার জন্য ওর দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছে রানা। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করল সে। তার জানা আছে, ক্ষীণতম উৎসাহ পেলে মাইকেল সেভারসের সঙ্গে ঘোরতর সংঘর্ষের পথে ধাবিত হবে রানা, ফলে গোটা অভিযান এমনকী ভণ্ডুলও হয়ে যেতে পারে, প্রাণ হারাতে হতে পারে দু'জনের একজনকে, কিংবা দু'জনকেই, সেই সঙ্গে এত ঝুঁকি নিয়ে এদের সঙ্গে অভিযানে তার অংশগ্রহণের আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে রানার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তার চোখে ধরা পড়ল। সুদর্শন জানা ছিল, কিন্তু জানা ছিল না কাছ থেকে ওর চোখ জোড়া এমন মায়াজাল বিস্তার করতে পারে। ঠোঁটের এমন নিখুঁত আকৃতি আর কোন পুরুষের মধ্যে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না সে। একদিন না কামানোতেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে সারা মুখে, দাড়ির গোড়াগুলো তামাটে চামড়ার গায়ে সবুজ হয়ে আছে। তার কোমল মসৃণ মুখে ওই দাড়িগুলোর প্রথম স্পর্শ কর্কশ আর বৈদ্যুতিক ধাক্কার মত লাগবে, সারা শরীরে শিরশিরে একটা অনুভূতি নিয়ে উপলব্ধি করল সে। আচমকা তার ইচ্ছে হলো, ওই স্পর্শটুকু তার চাই। সামান্য চিবুক তুলল সে, জানে তার চোখে

জ্বলতে থাকা বাসনার অস্থির আলোর ভিতর ইচ্ছেটা পড়তে পারবে রানা।

মাস্তুলের মাথা থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল, পরমুহূর্তে পাপাগোয়ার চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেল। মাস্তুলের মাথায় প্রহরী লোকটা মুসলমান, প্রথমে সে আল্লাহকে ডাকল, তারপর আরবী ভাষায় হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল। কালো খুলির নীচে তার চোখ দুটো অক্ষিকোটরের ভিতর ঘুরছে, এত বড় হাঁ করে আছে যে নীচে থেকেও তার আলাজিভ পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। ডেক থেকে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল হিন্দু মেট।

'কী ব্যাপার, রানা? কী হয়েছে?' জানতে চাইল অ্যানি, এখনও তার একটা হাত রানার বাহুতে।

'বিপদ।' রানা গম্ভীর। পূপ কেবিনের দরজা দড়াম করে খুলবার শব্দে দু'জনেই ওরা ঘাড় ফেরাল সেদিকে। একটা মাত্র চোখ ঘন ঘন পিটপিট করছে ক্যাপটেনের, ডান হাতে এখনও শক্ত করে ধরে আছে কার্ডগুলো, ছিটকে বেরিয়ে এল খোলা ডেকে।

'আর একটা মাত্র কার্ড পেলে অল থ্রি মারতাম,' তিক্ত কণ্ঠে হতাশা প্রকাশ করল অ্যারোনিকাস, বাতাসে ছুঁড়ে দিল কার্ডগুলো। হিন্দু মেটের বুকের কাছে শার্টটা খপ্ করে খামচে ধরে ঝাঁকি দিল সে, স্তব্ধ কিন্তু এখনও হাঁ করা লোকটার মুখের সামনে দুর্বোধ্য গ্রীক ভাষায় চিৎকার জুড়ে দিল।

হিন্দু মেট আঙুল তুলে মাস্তুলের মাথাটা দেখিয়ে দিল ক্যাপটেনকে। তাকে ছেড়ে মুসলমান মেটের দিকে মুখ তুলল অ্যারোনিকাস, আরবীতে চেঁচামেচি শুরু করল। দ্রুত কথা বলল ওরা, মন দিয়ে শুনবার চেষ্টা করল রানা।

'পুরনো একটা ডেস্ট্রয়ার! ওমানের পতাকা চিনতে পেরেছে

মেট,' বিড়বিড় করে বলল ও।

'তুমি আরবী বোঝো?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

মৃদু একটু হাসল রানা, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। মন দিয়ে শুনছে ও।

খানিক পর অ্যানির দিকে ফিরল রানা। 'ডেস্ট্রয়ার থেকে ওরা দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে। কোর্স বদলে বাধা দিতে আসছে।' চট করে দিগন্তরেখার কাছাকাছি সূর্যের দিকে তাকাল ও, চিন্তার রেখা ফুটে উঠল কপালে।

'তোমরা দু'জন খুব মজা লুঠছ, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল সেভারস। হাসছে বটে, কিন্তু রানার বাহুতে অ্যানির হাত লেগে রয়েছে দেখে দৃষ্টিতে ঠাণ্ডা একটা ভাব ফুটে উঠল। সাপের মত নিঃশব্দে পূপ ডেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

যেন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে অ্যানি, স্যাৎ করে হাতটা নামিয়ে নিল সে, বোকামি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে পরমুহূর্তে তিরস্কার করল নিজেকে। মাইকেল সেভারসের প্রতি কোনভাবেই ঋণী নয় সে, ওর সঙ্গে তার কোন বিশেষ সম্পর্কও নেই। রানার দিকে আবার ফিরবার আগে মাইকেলের ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে-ও ফিরিয়ে দিল। ফিরে দেখল, চলে গেছে রানা।

'কী ব্যাপার, কোস্টা?' পূপ ডেক থেকে হাঁক ছাড়ল মাইকেল।

'তোমাদের কার্গো আমার সর্বনাশ ডেকে আনছে!' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাপটেন, উত্তর দিগন্ত লক্ষ্য করে ঘুসি তুলল সে। 'ওমানের একটা ডেস্ট্রয়ার, অ্যারোহেড, এদিকেই ছুটে আসছে। এখন উপায়?'

'উপায় একটা তোমাকেই খুঁজে পেতে হবে,' নির্বিকারচিত্তে বলল মাইকেল। 'নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার শর্তে টাকা

নিয়েছ তুমি। ডেস্ট্রয়ার? ঠিক জানো? এদিকে ওটা কী করছে?'

'ডেস্ট্রয়ার, ঠিক জানি। মান্ধাতা আমলের অচল মাল, নিলামে কিনেছিল, মেরামত করে চালাচ্ছে। এদিকে টহল দেয়, কেন আমি তার কী জানি।'

মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল মাইকেল। 'জানো-জানো, ভাল করেই জানো। নারী-পাচারকারীদের ধরার জন্যে টহল দেয় ওরা, তাই না? ওই কাজের ওস্তাদ তুমি, জানবে না কেন! কোথায় ওটা?'

'এখনও দিগন্তরেখার ওদিকে, শুধু মাস্টহেড দেখতে পাচ্ছে। একেবারে ধেয়ে আসছে, যে-কোন মুহূর্তে ডেক থেকেও দেখতে পাব আমরা।' মাইকেলের দিকে পিছন ফিরল অ্যারোনিকাস, তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দেশ দিল কয়েকটা, সঙ্গে সঙ্গে মেইন ডেকের দিকে ছুটল তার ক্রুরা, ঘিরে দাঁড়াল প্রথম আর্মারড কার অর্থাৎ চঞ্চলাকে।

'মানে!' মাইকেল বিস্মিত। 'কী করতে চাও তুমি?'

'অস্ত্রসহ ধরতে পারলে ওরা আমাকে বাঁশ দেবে,' ব্যাখ্যা করল অ্যারোনিকাস। 'নো আর্মস, নো ট্রাবল।' সাদা রঙ করা গাড়িটাকে মোটা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, বাঁধনগুলো খুলতে শুরু করল ক্রুরা। 'বিপদের সময় মেয়েগুলোকে নিয়েও এই করি আমরা, লোহার চেইন থাকায় ভারি পাথরের মত ডুবে যায় তারা।'

'এক মিনিট, এক মিনিট! কার কার্গো ওগুলো যে ফেলে দিতে চাইছ পানিতে? এর জন্যে ভাড়া দেয়া হয়েছে তোমাকে!'

'ভাড়ার টাকাটা এই মুহূর্তে কার কাছে, মেজর?' তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করল অ্যারোনিকাস। 'আমার পকেটে কিছুই নেই—তোমার পকেট কী বলে?' নিজের লোকদের দিকে ফিরে তাড়া লাগাল সে।

ভারি ধাতব শব্দের সঙ্গে হঠাৎ খুলে গেল চঞ্চলার টারিট,

ভিতর থেকে খাড়া হলো রানার মাথা আর কাঁধ, ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে, দু'হাতে একটা ভিকার্স মেশিনগান। টারিটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে নিজেকে স্থির করল ও, ভিকার্সটাকে বাঁ হাতের ভাঁজে নিল, অপর হাতে শক্ত করে ধরল পিস্তল গ্রিপ। অ্যামুনিশনের ভারি বেল্টটা কাঁধ থেকে ঝুলছে।

এক পশলা গুলি ছুঁড়ল রানা, বুলেটগুলো সাদা অগ্নিশিখার মত অ্যারোনিকাসের মাথার দশ ইঞ্চি উপর দিয়ে সরলরেখা তৈরি করে ছুটে গেল। ডাইভ দিয়ে ডেকের উপর পড়ল ক্যাপটেন, আতংকে গোঙাচ্ছে, তার ক্রুরা সন্ত্রস্ত মুরগিছানার মত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সবার উপর একবার চোখ বুলাল রানা, একচোখো ক্যাপটেনের দিকে স্থির হলো দৃষ্টি। 'পরস্পরকে এবার বোধহয় চিনতে পারছি আমরা, কী বলো, ক্যাপটেন? গাড়িগুলোকে ভুলেও কেউ ছুঁতে যেয়ো না। বিপদ এড়াতে হলে একটাই পথ খোলা আছে তোমার সামনে–লেজ তুলে দৌড় দাও, ডেস্ট্রয়ার যেন ধরতে না পারে।'

'কিন্তু কীভাবে!' ডেকের উপর বসল অ্যারোনিকাস। 'ডেস্ট্রয়ারের স্পীড ত্রিশ নট!'

'কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না, কাজে নেমে পড়ো,' পরামর্শ দিল রানা। 'আর বিশ মিনিট পর সন্ধ্যা। কোর্স বদলাও, অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাও খেলাটা–লুকোচুরি তুমি ভালই খেলতে জানো।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল অ্যারোনিকাস, চোখটা পিট পিট করছে, হাত কচলাচ্ছে ঘন ঘন।

'ধরতে পারলে ওরা তোমাকে কী যেন দেবে বলছিলে?' হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল রানা। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে–বাঁশ।' ক্যাপটেনের

মাথার উপর দিয়ে আরও এক পশলা গুলি ছুঁড়ল ও। 'কিন্তু ধরা পড়ে তুমি যদি আমাদের ডোবাও, আমি কি দেব বুঝতে পারছ?'

আবার ডেকে শুয়ে পড়েছে ক্যাপটেন, শুয়ে শুয়েই তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল সে, কোর্স বদল করবার নির্দেশ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল নাবিকরা। ডেস্ট্রয়ার আর পাপাগোয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। পাপাগোয়া কোর্স বদলানোর পর দুটো জলযান একই দিকে ছুটছে এখন।

হাতছানি দিয়ে মাইকেলকে কাছে ডাকল রানা, মেশিনগানটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'শয়তান গ্রীকটার ওপর নজর রাখছি আমি, তুমি বাকিগুলোকে কাভার দাও। অ্যানি আর আব্বাসকে বলো, ক্ল্যাম্প লাগিয়ে সব ক'টা গাড়ির হ্যাচ কাভার বন্ধ করতে হবে।'

'এটা তুমি পেলে কোথায়?' হাতের মেশিনগানটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মাইকেল। 'সবগুলোই তো বাক্সের ভেতর ছিল বলে আমার ধারণা।'

'বাক্স থেকে বেরিয়ে তোমার হাতেও চলে আসত একটা, তুমিও যদি আমার মত বীমার ভক্ত হতে।'

কেস থেকে দুটো চুরুট বেছে নিল মাইকেল, দুটোই ধরাল, একটা গুঁজে দিল রানার ঠোঁটে। 'ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে,' বলল সে। 'তোমাকে পার্টনার হিসেবে নিয়েছিলাম বলে সত্যি নিজেকে আমার গুণী লোক বলে মনে হচ্ছে।'

ঠোঁটের কোণে চুরুট নিয়ে টান দিল রানা, নীল ধোঁয়া ছেড়ে নিঃশব্দে হাসল। মুখ তুলে মেইন মাস্টহেডের দিকে তাকাল ও। 'আমার আরও কাজ আছে। নীচে থাকো তোমরা, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। ডেস্ট্রয়ারটা যদি ধরেই ফেলে আমাদের, ওদের সাথে ক্যাপটেনকেই কথা বলতে দিয়ো, তবে আড়াল থেকে

মেশিনগানটা তাক করে রেখো তার মাথার দিকে—তাকে জানিয়ো। আর, হ্যাঁ, অ্যানির দিকে লক্ষ রেখো।'

'তোমার শেষ কথাটা স্রেফ শব্দের অপচয়,' মুচকি হেসে বলল মাইকেল। 'এমন একটা মুহূর্তের কথা বলতে পারো, যখন ওর উপর আমার নজর নেই?'

'এতটা আবার বাড়াবাড়ি,' মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করল রানা। 'সবারই কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে, বিশেষ করে মেয়েদের—সেদিকেও যদি কেউ নজর দেয়, তাকে আমরা কী বলি?'

'পীপিং টম,' হাসিমুখে বলল মাইকেল। 'কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে কি যে তুমিও ওর ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছ না?'

'যদি রেখেও থাকি, সেটা আমার মুদ্রাদোষ নয়,' বলল রানা। 'ওর নিরাপত্তার জন্যে আমার দৃষ্টি পাহারাদার হিসেবে কাজ করে।'

'বাহ, দু'জনের উপলব্ধি দেখছি একইরকম—আমার দৃষ্টির পাহারাও ওর নিরাপত্তার জন্যে দরকার। অ্যানি আমার নয়, কিন্তু অ্যানি তোমারও নয়, কী? তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো এসো টস করি…।'

'যারা মেয়ে বেচাকেনা করে, তুমি আমাকে তাদের পর্যায়ে নামতে বলো? তারচেয়ে সিদ্ধান্তটা ওকেই নিতে দাও না কেন?'

'ইতিমধ্যে ওর মন জয় করার জন্যে যার যেমন যোগ্যতা আর ক্ষমতা, চেষ্টা চালিয়ে যাব আমরা, কী?'

'চেষ্টা বলতে তুমি যা বোঝো আমি হয়তো তা বুঝি না। তুমি চেষ্টা করো, তাতে আমার কী। আমি কী করব, সেটা আমার ব্যাপার।'

‘ভয় পাচ্ছ, ওল্ড চ্যাপ? প্রতিযোগিতায় নামতে ডরাও?’ হাসছে মাইকেল।

‘হ্যাঁ। কারণ জানি, আমি হেরে গেলে কার হাতে পড়বে বেচারি।’ মাইকেলের দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল রানা।

‘ভাল হয়ে যাব,’ বলল মাইকেল। ‘অ্যানিকে পেলে আমি ভাল হয়ে যাব।’

ঝট্ করে ঘুরল রানা। ‘কী বললে?’

‘বিলিভ মি.,’ মাইকেল গম্ভীর।

‘অনেস্ট?’

‘অনেস্ট।’ কী ভেবে কে জানে হাসি গোপন করছে মাইকেল।

‘তোমার জন্যে এটুকু অন্তত করতে পারি আমি,’ বলল রানা। ‘তোমাদের দু’জনের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিলাম নিজেকে। চেষ্টা করে দেখো।’

‘উঁহুঁ-উঁহুঁ।’ মাথা নাড়ল মাইকেল। একজন অনিষ্টকারীর ধূর্ত হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠেই দ্রুত মিলিয়ে গেল। ‘কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারলে, সে জিনিস আমার ভাল লাগে না। তুমি যদি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াও, অ্যানি উইসপার আমাকে এক বিন্দু আনন্দ দিতে পারবে না। মনে হবে অ্যানিকে আমি জয় করিনি, তোমার দয়ার দান হিসেবে পেয়েছি।’

‘তারমানে ওকে তুমি ভালবাস না।’

‘বাসি, ওল্ড চ্যাপ। তবে আমার ভালবাসা একটু অন্যরকম, আর কারও সাথে মেলে না। শেষ কথাটা বলি শোনো–শেষ পর্যন্ত অ্যানিকে আমিই জয় করব। চ্যালেঞ্জটা দিয়ে রাখলাম, গ্রহণ করা না করা তোমার ব্যাপার। চেষ্টা করে দেখতে পারো আমার কাছ থেকে ওকে তুমি ছিনিয়ে নিতে পারো কিনা।’

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কী বোঝাতে চাইল ও-ই জানে, ঘুরে

দাঁড়িয়ে চলে গেল নিজের কাজে। ঠোঁটের কোণে চুরুট নিয়ে ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মাইকেল সেভারস, চোখে কৌতুক ভরা দৃষ্টি।

মেইন মাস্টের ডগার কাছাকাছি ক্রসট্রি-তে রয়েছে রানা, পেটের ভিতর শিরশিরে অনুভূতি নিয়ে জাহাজ আর মাস্তুলের সঙ্গে দোল খাচ্ছে। চোখে টেলিস্কোপ, গাঢ় রঙের কাঠামোটাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখছে ও। যুদ্ধজাহাজ, মাত্র দশ মাইল দূরে হলেও, সন্ধ্যার ঘনায়মান কালিমায় ক্রমশ আকৃতি হারাচ্ছে সেটা, এরইমধ্যে আবছা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ আবছা আকৃতিটা থেকে উজ্জ্বল আলোর একটা রেখা বেরিয়ে এল, সংকেতের মাধ্যমে পরিচয় জিজ্ঞেস করছে ডেস্ট্রয়ার।

'আর্মস স্মাগলার!' আপনমনে হাসল রানা, ডেস্ট্রয়ার থেকে পাপাগোয়াকে কেমন দেখাচ্ছে কল্পনা করবার চেষ্টা করল।

আবার সংকেত দিল ডেস্ট্রয়ার। 'জাহাজ থামাও, তা না হলে গুলি করব।'

'করবেই তো!' ব্যঙ্গ করল রানা। মুখের সামনে হাত দিয়ে চোঙ তৈরি করল, চেঁচিয়ে বলল, 'পাল নামাও!' অনেক নীচে ডেক, ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে গ্রীক অ্যারোনিকাস। মুখ নামিয়ে ক্রুদের নির্দেশ দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে পাল খুলবার জন্য মাস্তুল বেয়ে উঠতে শুরু করল ক্রুরা।

সীমাহীন সাগরের বুকে কালো একটা খুদে ছায়ার মত লাগছে ডেস্ট্রয়ারটাকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা, লাল আলোর ঝলক দেখতে পেল। ভয়ের একটা স্রোত পোকার মত কিলবিল করতে

করতে শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল পিঠে। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে আকাশে উঠে এল শেলটা, তারপর পাপাগোয়ার দিকে নামতে শুরু করল।

ওটার ছুটে আসবার আওয়াজ পেল রানা, তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, পাপাগোয়ার আধ মাইল সামনে ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে। আকাশের গায়ে উঁচু হলো ছলকে ওঠা পানির স্তম্ভ, তীব্র বাতাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল স্তম্ভটা।

হাত থেমে গেছে ক্রুদের, স্তব্ধ বিস্ময়ে পাপাগোয়ার সামনের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ক্যাপটেনের হুংকার শুনে আবার তারা যার-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। দেখতে না দেখতে ঝলমলে সাদা ক্যানভাস অদৃশ্য হলো জাহাজের মাথা থেকে।

আবার ডেস্ট্রয়ারের দিকে ফিরল রানা, দু'সেকেন্ড লাগল খুঁজে পেতে। পাল অদৃশ্য হতে দেখে ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন কী ভাবছে কে জানে। হয়তো ধরে নিয়েছে ওদের নির্দেশ মত থামছে পাপাগোয়া, জানে না জাহাজটার ডিজেল এঞ্জিনও আছে। তবে একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, পাল নামিয়ে নেওয়ায় ডেস্ট্রয়ার থেকে এখন আর পাপাগোয়াকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর যখন অন্ধকারে হারিয়ে গেল ডেস্ট্রয়ার, মাস্টহেড থেকে গ্রীক ক্যাপটেনকে নির্দেশ দিল, 'আবার আগের কোর্স ধরো। আমাদের খোঁজে সোজা আসবে ডেস্ট্রয়ার, এসে পাবে না।'

দেখতে না দেখতে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। স্বর্গ জুড়ে জ্বলজ্বল করছে তারার অসংখ্য মালা। ক্রসট্রি-তে দাঁড়িয়ে আছে রানা, অন্ধকারের ভিতর দৃষ্টি হেনে ডেস্ট্রয়ারটাকে খুঁজছে। ওর ভয় কাটেনি এখনও, জানা নেই ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন কী ভাবছে। লোকটা যদি সন্দেহ করে থাকে? সে-ও যদি কোর্স বদলে ওদের

পিছু নিয়ে থাকে? অন্ধকারের ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আকাশ ছোঁয়া ইস্পাতের খোল পাপাগোয়ার উপর চড়াও হলে একটুও অবাক হবে না ও। কিংবা একেবারে কাছ থেকে জ্বলে উঠতে পারে সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো সাদা আলো। কানের পর্দা ফাটিয়ে বেজে উঠতে পারে বুল হর্ন।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পর, স্বস্তির একটা বিরাট ধাক্কার সঙ্গে, সাদা আলোর দীর্ঘ আঙুল সাগরের গায়ে নড়ে উঠতে দেখল রানা। অন্তত ছ'মাইল পিছনে, ঠিক যেখানে পাল নামিয়েছিল পাপাগোয়া। ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন টোপ গিলেছে, তার নির্দেশে পাপাগোয়া থেমেছে ধরে নিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

তবে ভুল ভাঙতে দেরি হবে না ক্যাপটেনের। নির্দিষ্ট একটা সময় পেরিয়ে যাবার পর সে বুঝতে পারবে, পাপাগোয়া ডেস্ট্রয়ারের দিকে আসছে না। তখনই শুরু হবে সার্চ।

আবার অ্যারোনিকাসকে নির্দেশ দিল রানা। পাল তোলো, কোর্স ঠিক রাখো, ফুলস্পীডে ছোটো। মিনিট পনেরো পর ডেস্ট্রয়ারের সার্চলাইট আবার জ্বলে উঠতে দেখল ওরা, ডেস্ট্রয়ার থেকে ওটার দৌড় মাত্র এক মাইল। নিয়মিত একটা ছক ধরে খুঁজবার পালা শুরু হলো।

দু'ঘণ্টা পর নতুন একটা ভয় ছেঁকে ধরল রানাকে। ডেস্ট্রয়ারও দিক বদলেছে, ধাওয়া করে ইতিমধ্যে পাপাগোয়ার অনেকটা কাছে চলে এসেছে। সার্চলাইটের আলোর ডগা আর মাত্র এক মাইল দূরে।

পরের বার আলোটাকে দেখা গেল অনেক বাঁ দিকে, কোর্স বদলে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে ডেস্ট্রয়ার। মাস্টহেড থেকে তবু নামল না রানা, অন্ধকারে দৃষ্টি হেনে অপেক্ষা করতে লাগল। সময়

গড়িয়ে চলল। এক সময় ক্ষীণ আলো ফুটল পুব আকাশে। চোখে টেলিস্কোপ তুলে চারদিকের দিগন্তরেখায় দৃষ্টি বুলাল ও। অথৈ জলরাশির মাঝখানে কোথাও কোন জাহাজ নেই।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপ ধরে গেছে রানার, মাস্তুলের মাথায় নড়াচড়া করবার সুযোগ না থাকায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশী, ধীরে ধীরে নীচে নামবার সময় ভয় হতে লাগল হাত ফসকে পড়ে না যায়।

অ্যারোনিকাস ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানাল, ওর নাকে-মুখে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে, রসুনের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল রানার। ওকে নামতে দেখে আগেই স্টোভ জ্বেলেছে অ্যানি উইসপার, মগভর্তি গরম কফি নিয়ে এল সে, নতুন দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে, সে-দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাতর-কোমল একটা ভাবও যেন লুকিয়ে আছে। মাইকেল এতক্ষণ একটা আর্মারড কারের ভিতর পাহারায় ছিল, অ্যানির হাত থেকে কফি নেওয়ার জন্য সে-ও হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল, এক গাল হাসি নিয়ে রানার ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল সদ্য ধরানো একটা লম্বা চুরুট। রানার হাত ধরে রেলিঙের দিকে সরে এল সে।

'তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল,' নিঃশব্দে হাসল মাইকেল। 'কালা আদমী, ধরেই নিয়েছিলাম বুদ্ধিশুদ্ধি কম হবে। এখন দেখছি তুমি একটা বিরাট সম্পদ, কী?'

'কিন্তু সাবধান,' রানাও সহাস্যে বলল, 'আমাকে পুঁজি করে জমজমাট কোন ব্যবসা ফাঁদার কথা ভেবো না—বিরাট লোকসান দিতে হবে।' দু'জনেই একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা, যেদিকে বসে আছে অ্যানি উইসপার। ডিম ভেঙে একটা বাটিতে রাখছে সে। পরস্পরকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল ওরা।

দুপুরের দিকে ধাক্কা দিয়ে ওদের দু'জনের ঘুম ভাঙাল অ্যানি। একটা আর্মারড কারের ছায়ায়, যার যার চাদরের উপর উঠে বসে চোখ কচলাতে লাগল, যেন একজোড়া ঘুমকাতুরে শিশু। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ায় মেজাজ তিরিক্ষি, কিন্তু রাগ করতে পারছে না, কারণ ঘুমটা ভাঙিয়েছে ওদের খেলার সাথী। বিনা প্রতিবাদে অ্যানির পিছু নিয়ে বো-র দিকে চলে এল ওরা, চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে নিচু উপকূলরেখা দেখতে পেল, রঙটা অবিকল সিংহের গায়ের মত, রেখার মাথায় সাদা ফেনা যেন কোমল ক্রীম, তার ঠিক উপরে নীল আকাশ এত বেশি জ্বলজ্বলে ভাব নিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে যে ব্যথা করে ওঠে চোখ।

আকাশ আর মাটিকে আলাদাভাবে চিনবার জন্য মাঝখানে পরিষ্কার কোন রেখার অস্তিত্ব নেই, তাপ-তরঙ্গ আর মিহি ধুলোর ভিতর সিংহের হলুদ কেশরের মত কাঁপছে উপকূলরেখা। দৃশ্যটা অ্যানির কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আকর্ষণহীন আর বৈরী। নিজের ভাণ্ডার থেকে শব্দ বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে তার মনে, ভাবছে ঠিক কীভাবে বর্ণনা করলে পাঠকরা দৃশ্যটা হুবহু কল্পনা করতে পারবে।

একজন আফ্রিকান যোগ দিল ওদের সঙ্গে—আব্বাস খায়ের। সে তার পশ্চিমা ড্রেস বাদ দিয়ে আলখেল্লা পরেছে, ভিতরে আঁটসাঁট পা'জামা। চকলেট-ব্রাউন মুখে সগর্ব গাম্ভীর্য ফুটে আছে, কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল সেঁটে আছে খুলির সঙ্গে, আদিবাসীদের একজন পণ্ডিত ও যোদ্ধা দেশে ফিরছে। 'পাহাড়গুলো আপনারা দেখতে পাবেন না, কুয়াশা বেশ ঘন,' ব্যাখ্যা করল সে। 'তবে কোন কোনদিন ভোরে বাতাস যখন ঠাণ্ডা থাকে...' পশ্চিম দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকল, তরল জ্যোতির মত দুই চোখে ভাবাবেগ উথলে

উঠছে, পাথরখোদাই ঠোঁট দুটো কাঁপছে একটু একটু।

ধীরগতিতে তীরের দিকে এগোল পাপাগোয়া, অগভীর পানি এত স্বচ্ছ যে ত্রিশ ফুট নীচে ডুবে থাকা পাহাড়ের চূড়া আর ঢাল পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা, বহুবর্ণ প্রবালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে রঙচঙে সামুদ্রিক মাছের ঝাঁক ছুটোছুটি করছে।

তীর আরও কাছে সরে এল, পাথুরে কিনারা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা, কিনারা ভাঙা ফাঁকের ভিতর সোনা রঙ সৈকত, চিকচিক করছে বালি। আরও সামনে উঁচু হয়ে উঠে গেছে মরু–নির্জন, ফাঁকা, অনুর্বর; মাঝে মধ্যে বিবর্ণ কিছু কাঁটাঝোপ আর শুকনো ঘাস ছাড়া দৃষ্টি কাড়বার মত কোথাও কিছু নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক তীর ঘেঁষে সমান্তরাল রেখা ধরে এগোল পাপাগোয়া, মাঝখানে এক হাজার ফুট ব্যবধান; রেলিঙে দাঁড়িয়ে অজানা ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা। দলে শুধু রানা অনুপস্থিত, কার্গো আনলোড করবার প্রস্তুতি নিতে গেছে ও। তবে একটু পরই ফিরে এল আবার, ঠিক তখুনি ওদের সামনে গভীর একটা উপসাগর উন্মুক্ত হলো।

'দ্য বে অভ চেইনস,' বলল আব্বাস, সেই সঙ্গে নামকরণের কারণটাও ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বে-র শেষ মাথায় দু'দিকে উঁচু হয়ে রয়েছে উপকূল, দু'পাশের বাতাস থেকে রক্ষা করছে তীরের খানিকটা অংশকে, পানির উপর জেগে থাকা পাহাড় চূড়া ঠেকিয়ে রেখেছে সাদা ফেনা, নাক বরাবর সামনে প্রাচীন নগরী মণ্ডির ধ্বংসাবশেষ–এক সময় লোহার চেইন পরা ক্রীতদাসদের নিলামে তোলা হত এখানে।

বিধ্বস্ত শহরটা আব্বাস দেখিয়ে দেওয়ায় চিনতে পারল ওরা। তীরের কিনারায় কিছু সমতল, মসৃণ পাথরের স্তূপ দেখে কার সাধ্যি বোঝে এখানে একটা সময় শহর ছিল। আরও কাছে এসে

জ্যামিতিক ধাঁচের ছক দেখে রাস্তা, ছাদহীন দেয়াল ইত্যাদি চিনতে পারল ওরা।

নোঙর ফেলল পাপাগোয়া। কার্গো নামানোর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে রেলিঙে মাইকেলের কাছে চলে এল রানা। 'দু'জনের একজনকে লাইন নিয়ে সাঁতরাতে হবে।'

'এসো টস করি,' প্রস্তাব দিল মাইকেল, রানা প্রতিবাদ করবার আগেই তার হাতে বেরিয়ে এল শিলিংটা।

'হেডস!' হাল ছেড়ে দেওয়ার সুরে বলল রানা।

'মন্দ কপাল, ওল্ড চ্যাপ। হাঙরগুলোকে আমার স্নেহ জানিয়ো।' সহাস্যে বলল মাইকেল, মোচড় দিল গোঁফে।

ডেরিকে চড়িয়ে ভেলাটা নামিয়ে দেওয়া হলো পানিতে, ভেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টান টান রশি ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল রানা। গর্ভবতী জলহস্তীর মত বেঢপ ভেলাটা ঢেউয়ের মাথায় দুলতে লাগল। রেলিঙে ভর দিয়ে সাগ্রহে নীচে তাকিয়ে রয়েছে অ্যানি উইসপার, মুখ তুলে হাসল রানা।

'যদি ভয় করো তোমার সম্মান ক্ষুণ্ন হবে, বা যদি মনে করো চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, অন্যদিকে তাকাতে পারো।' রানার কথা এক মুহূর্ত বুঝল না অ্যানি। কিন্তু শার্ট খুলে রানা যখন ট্রাউজারের বোতামে হাত দিল, নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

কোমরে হালকা লাইন জড়িয়ে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, লাফ দিল রানা ভেলা থেকে। শেষ পর্যন্ত অদম্য কৌতূহলেরই জয় হলো, চোখ নামিয়ে আবার রানার দিকে তাকাল অ্যানি। ট্রাউজার খোলা অবস্থায় একজন পুরুষকে ভারি অসহায় আর ছেলেমানুষ লাগে, উপলব্ধি করল সে। পানির নীচে ডুবে রয়েছে রানার শরীর, মাঝে মধ্যে শুধু নিতম্ব আর কাঁধ দুটো জেগে উঠছে পানির উপর, যদিও

পানির নীচেও পুরো শরীরটা দেখতে পাচ্ছে অ্যানি। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মাইকেল সেভারস, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে ব্যঙ্গাত্মক একটুকরো ধারাল হাসি, উঁচু হয়ে কপালে উঠে গেছে একটা ভুরু। মাইকেলের হাত দুটো অবশ্য থেমে নেই, রানা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে লাইন ছাড়ছে সে। লজ্জায় লালচে হয়ে উঠল অ্যানি, তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে নিতম্বিনীর দিকে এগোল—দেখে নেওয়ার দরকার ওর ব্যাগ আর টাইপরাইটার গাড়িটায় তোলা হয়েছে কিনা।

পানির নীচে মাটিতে পা পড়ল রানার, হেঁটে তীরে উঠল ও, লাইনটা একটা বড়সড় পাথরে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধল। ইতিমধ্যে ডেরিকের সাহায্যে বড় ভেলাটায় নামানো হয়েছে প্রথম আর্মারড কার। লাইন টেনে তীরে ভেড়ানো হলো ভেলাটাকে, খুলে দেওয়া হলো গাড়িটার বাঁধন। তীরের কিনারা থেকে বালিময় হলুদ সৈকত ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, সেদিকে একটা উদ্বিগ্ন চোখ রেখে স্টার্ট দিল রানা, ভেলা আর সৈকতের মাঝখানে শক্ত আর মোটা কাঠের তক্তা ফেলে সিধে হলো আব্বাস। ভেলা বিপজ্জনকভাবে দুলছে, এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল একটু, ভেলা থেকে তক্তার উপর উঠে এল কার। প্রায় অনায়াসে সৈকতে পৌঁছুল রানা, ওয়াটার-মার্ক ছাড়িয়ে এসে দাঁড় করাল গাড়ি। আব্বাসকে নিয়ে ফিরে গেল ভেলা, দ্বিতীয় গাড়িটা নিয়ে আসবে।

প্রায় নিঃশব্দে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ সারল ক্রুরা, তবু ফুয়েলের ড্রাম আর কাঠের বাক্সগুলো নিয়ে ভেলাটা যখন শেষবারের মত তীরে ভিড়ল, সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কিনারায় পৌঁছে গেছে। ভেলার শেষ আরোহী হিসাবে কাঠের একটা বাক্সের উপর একা বসে রয়েছে অ্যানি উইসপার, মুখে স্থির হয়ে আছে আড়ষ্ট হাসিটুকু।

ভেলাটা জাহাজের গা থেকে সরতে না সরতে ডিজেল এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল, নোঙর তুলবার নির্দেশ দিল কোস্টাস অ্যারোনিকাস, ভেলার সঙ্গে বাঁধা লাইনটা খুলে নেওয়া হলো। ভেলা থেকে লাফ দিয়ে তীরে নামল অ্যানি, ইতিমধ্যে নাক ঘুরিয়ে বে-র প্রবেশ পথের দিকে ছুটতে শুরু করেছে পাপাগোয়া, ক্রুরা পাল তুলবার কাজে ব্যস্ত সবাই। সন্ধ্যা নামছে, সৈকতে দাঁড়িয়ে চারজন ওরা তাকিয়ে আছে দ্রুতগতি পাপাগোয়ার দিকে। কেউ ওরা হাত নাড়ল না, তবু কী যেন একটা হারানোর ব্যথা সবাই ওরা অনুভব করল। জাহাজটা অবৈধ মালামাল পাচার করে, ক্রুরা নোংরা, ক্যাপটেন লোকটা বিবেকহীন, তবু সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে পাপাগোয়াই ছিল ওদের সর্বশেষ যোগসূত্র। সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে বে থেকে বেরিয়ে গেল পাপাগোয়া, অদৃশ্য হয়ে গেল সীমাহীন সাগরে।

নিস্তব্ধতা আর একাকীত্ব থেকে ওদেরকে উদ্ধার করল রানা। 'মন খারাপ করে লাভ কী, এসো তাঁবু ফেলা যাক।'

বিধ্বস্ত শহরের মাঝখানে, একজোড়া নিচু দেয়ালের সামনে থামল ও, তাঁবু ফেলবার জন্য জায়গাটা ওর পছন্দ হলো। একেবারে খোলা জায়গায় ফেলে না রেখে, এক এক করে গাড়িগুলোকেও সৈকত থেকে ধ্বংসাবশেষের ভিতর নিয়ে এল ওরা। বাড়ি-ঘরের ভাঙাচোরা কাঠামোয় কাঁটাঝোপ গজিয়েছে, পাথরের স্তূপগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে আছে বালিতে। রাস্তাগুলো সরু, কর্কশ ঝোপ আর বালিতে ঢাকা। আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িগুলোর চাকা আর ফুয়েল পরীক্ষা করছে রানা, একটা দেয়ালের গোড়ায় কিছু ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরাবার চেষ্টা

করছে মাইকেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও, শহর দেখতে একাই বেরিয়ে পড়ল অ্যানি।

খুব বেশি দূর গেল না সে। হাঁটবার গতি শ্লথ হয়ে এল তার, পা উঠতে চায় না। ক্রীতদাসদের হাত-পায়ে লোহার চেইন, ঝনঝন শব্দ করছে। বাতাসে চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ। রক্তাক্ত কালো-মানুষদের আর্তনাদ। লাফ দিয়ে ঝলসে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা, গোটা শহর পুড়ছে। দেড়-দুশো বছর আগে ঠিক যা ঘটেছিল, সব যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল অ্যানি উইসপারের চোখের সামনে। পোকার মত কিলবিল করছে তার চামড়া, ভয়ে আর উত্তেজনায় পা উঠতে না চাইলেও কীসের এক দুর্নিবার টানে সম্মোহিতের মত সামনে এগিয়ে চলেছে সে। সরু গলির মাথা থেকে চওড়া একটা উঠন মত জায়গায় বেরিয়ে এল, আন্দাজ করল প্রাচীন মণ্ডি নগরীর এখানটাতেই মানুষ বেচাকেনার হাট বসত। লোহার শেকল পরা অনাহারক্লিষ্ট মানুষ ধুঁকছে, কল্পনা করে শিউরে উঠল সে। পরমুহূর্তে তিরস্কার করল নিজেকে, অতীতের কথা ভেবে এভাবে কাতর হয়ে পড়বার কোন মানে হয় না। বর্তমানকে নিয়েই তার কারবার, যেখানে যা দেখে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলে সচেতন পাঠককে জানানোর জন্য লিখে ফেলে। আজ আর মানুষ বেচাকেনা হয় না, ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেছে…কিন্তু সত্যিই কি তাই? আপনমনে মাথা নাড়ল অ্যানি উইসপার। কম দিন তো হলো না এই গ্রহে বসবাস করছে মানুষ, কিন্তু আজও কি সমাজ তাদের সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পেরেছে? মানুষকে মানুষ আজও কিনে নিয়ে নিজের খুশিমত কাজে লাগাচ্ছে, বদলে গেছে শুধু ধরনটা। ক্রীতদাস প্রথা আজও আছে, পাল্টেছে শুধু তার সংজ্ঞা। অসৎ আর নির্দয় মানুষের কব্জায় ছিল প্রাচীন দুনিয়া, আজও কূটকৌশলী আর স্বার্থপর

একদল মানুষের হাতে দুনিয়াটা জিম্মি হয়ে আছে। হঠাৎ করেই অ্যানি উইসপার উপলব্ধি করল, সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে আসলে সে একজন যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ-যুদ্ধ সম্মুখসমরে বন্দুক নিয়ে প্রাণসংহারের যুদ্ধ নয়। তার অস্ত্র ভাষা, অবহেলিত মানুষের দুর্দশা সচেতন পাঠককে জানানোর দায়িত্বটাই তার কাছে যুদ্ধ। ইথিওপিয়ার যেখানে সে যাচ্ছে, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেখানে—অশুভ শক্তি দুর্বল মানুষের উপর চড়াও হচ্ছে। নির্যাতিত আদিবাসীদের কথা অবশ্যই লিখবে অ্যানি উইসপার।

খসখস একটা শব্দে সংবিৎ ফিরল তার, চোখ নামিয়ে তাকাতেই আতংকে পিছিয়ে এল এক পা। তিন ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁকড়া-বিছে, সড়সড় করে তার পায়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে হাঁটা ধরল সে, ক্যাম্পের দিকে ফিরছে।

ভয়টা তখনও কাটেনি, কাজেই দেয়ালের গোড়ায় উজ্জ্বল আগুন জ্বলতে দেখে সোজা সেদিকেই এগোল অ্যানি, হাঁটু মুড়ে আগুনের পাশে বসবার সময় তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাইকেল। হাত দুটো বাড়িয়ে আগুনের উপর ধরল অ্যানি।

'এক্ষুনি তোমাকে খুঁজতে বেরুচ্ছিলাম। একা কোথাও যাওয়া ঠিক না।'

'নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় আমার জানা আছে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অ্যানি, গলার ঝাঁঝটুকুর সঙ্গে আগেই পরিচয় ঘটেছে মাইকেলের।

'আমি একমত,' নরম হাসি ফুটল মাইকেলের মুখে। 'মাঝে মধ্যে মনে হয়, কাজটায় অতিমাত্রায় দক্ষ তুমি।' পকেটে হাত ভরল সে। 'আগুন জ্বালার জন্যে মাটি খুঁড়ছিলাম, জিনিসটা

পেলাম।' পকেট থেকে বের করে ভাঙা একটা ধাতব চাকতি ধরল অ্যানির সামনে, আগুনের আলোয় চকচক করছে। চাকতির গায়ে একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে, দেহটা কুণ্ডলী পাকানো।

অস্বস্তি আর অকারণ রাগ কর্পূরের মত উবে গেল, উত্তেজনায় খাড়া হয়ে গেল অ্যানির শিরদাঁড়া। 'ওহ্, মাইক!' প্রায় ছোঁ দিয়ে চাকতিটা তুলে নিল সে। 'ওমা, কী সুন্দর! সোনা, তাই না?'

'সন্দেহ করছি,' মুচকি হেসে মাইকেল ভাবল, উপহারের জন্য সবাই ওরা লালায়িত। 'ওটা এক রাজকুমারীর ছিল,' হালকা সুরে বলল সে। 'রাজকুমারীকে দিয়েছিল তার পাণিপ্রার্থী এক রাজকুমার। কাজেই আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবে ওটা তোমাকে দিলে ব্যাপারটা বেশ মানানসই হবে, কী?'

'ওহ্!' আনন্দের আতিশয্যে হাঁপিয়ে উঠল অ্যানি। 'আমার জন্যে!' আকস্মিক আবেগে ভেসে গেল সে, মাইকেলের কপালে চুমো খাওয়ার জন্য ঝুঁকল। কিন্তু থতমত খেয়ে গেল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছে মাইকেল, অ্যানির ঠোঁট মাইকেলের ঠোঁটের সঙ্গে সেঁটে গেল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল অ্যানি, কিন্তু ততক্ষণে ওর মাথার দু'পাশ হাত দিয়ে চেপে ধরেছে মাইকেল।

চঞ্চলার এঞ্জিন বনেটের উপর বড়সড় স্কেল ম্যাপ খুলেছে রানা, পাশে আব্বাস; ল্যাম্পের আলোয় মরুভূমির গতিপ্রকৃতি বুঝবার চেষ্টা করছে। কোন্ রুট ধরে অ্যাওয়াস নদীর দিকে যাবে ওরা, খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে আব্বাস। তার অভিযোগ: ম্যাপটা নিখুঁত নয়, গুরুত্বপূর্ণ অনেক জায়গা এতে চিহ্নিত করা নেই। 'দলে আমি না থাকলে এই ম্যাপ ধরে যেতেন আপনারা,' বলল সে, 'নির্ঘাত পথ হারাতেন।'

ম্যাপ থেকে হঠাৎ মুখ তুলেই আগুনের আভায় দুটো মূর্তিকে

সরে এসে এক হতে দেখল রানা। ঘাড়ের পিছনে উত্তপ্ত রক্ত যেন ছলকে উঠল, বুকের খাঁচায় হাতুড়ির বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ড। 'কফি বানাবে, আব্বাস?' ঘড়ঘড় করে উঠল ওর গলা।

'একটু পর, মাসুদ ভাই!' প্রতিবাদের সুরে বলল আব্বাস। 'স্যান্ড ডেজার্টটুকু ঠিক কোথায় পেরোব আমরা সেটা আগে দেখাই আপনাকে...,' সামনের দিকে ঝুঁকে একটা আঙুল রাখল ম্যাপে, জানে না কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে নেই। ওদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য আগুনের দিকে রওনা হয়ে গেছে রানা।

আট

ভোরের ক্ষীণ আলো ইতস্তত করছে পুব দিগন্তে, ঘুম থেকে জেগে উঠে অ্যানি বুঝতে পারল, বাতাস থেমে গেছে। রাতে যতক্ষণ জেগে ছিল সে, সকরুণ বিলাপের মত আওয়াজ শুনেছে, বাতাস নয়, যেন বিধ্বস্ত নগরীর আনাচে-কানাচে ক্রীতদাসদের অতৃপ্ত আত্মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। গা থেকে চাদর সরাবার সময় চারদিকে চিকচিকে ধুলো-বালি উড়ল, কিচকিচ করে উঠল দাঁত। উঠে বসে পুরুষ তিনজনের দিকে তাকাল সে। চাদর ঢাকা তিনটে লম্বা বস্তার মত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে রয়েছে ওরা, একজন নাক ডাকছে। কে, বুঝতে পারল না অ্যানি। মাথায় হাত দিয়ে আঙুলের ডগায় বালি পেল সে। কারও ঘুম ভাঙবার আগে গোসলটা সেরে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

টয়লেট ব্যাগ, তোয়ালে আর আন্ডারঅয়্যার নিয়ে দেয়ালের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল অ্যানি, বালিয়াড়ি টপকে নেমে এল

সৈকতে। পিছন ফিরে একবার তাকাল—না, কেউ পিছু নিয়ে আসছে না।

স্তব্ধ ভোর, লুকিয়ে থাকা সূর্যের আভায় বে-র পানি লালচে সাটিনের মত মসৃণ। চারদিকে জমাট নিস্তব্ধতা, এই নিস্তব্ধতা শুধু মরুভূমিতেই আশা করা যায়—পশু বা পাখি, বাতাস বা ঢেউ, মানুষ বা সরীসৃপ, কারও দ্বারাই বিঘ্নিত হচ্ছে না। বেঁচে থাকা বড় সুখের, শরীরে অদ্ভুত একটা ভাললাগার অনুভূতি নিয়ে ভাবল অ্যানি উইসপার। কালকের হতাশা আজ ওকে স্পর্শ করতে পারল না।

এক এক করে কাপড় খুলে বিবস্ত্র হলো অ্যানি, ভিজে বালির উপর দিয়ে লম্বা লম্বা সতর্ক পা ফেলে সাগরের দিকে এগোল। পানিতে পা দিতেই হিম শীতল শিরশিরে ভাব কাঁপিয়ে দিল শরীরটাকে, দু'হাত বাড়িয়ে সাগরকে আলিঙ্গন করবার জন্য ঝাঁপ দিল সামনের দিকে।

আপনমনে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল সে, গুনগুন করে গান গাইছে। ঠিক সচেতনভাবে নয়, অনেকটা অন্যমনস্কভাবে, রানা আর মাইকেলের কথা পালা করে ভাবল সে। আনন্দ, কৌতুক, রোমাঞ্চ আর খুনসুটির অফুরন্ত একটা উৎসের নাম করো। মাইকেল সেভারস। ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ববোধ, রহস্য আর নিরাপত্তার উৎস কী? মাসুদ রানা।

সাগর থেকে যখন উঠল অ্যানি, দিগন্তের তরল মাথায় মুকুটের মত শোভা পাচ্ছে সূর্য। আলোর ধরন এই অল্প সময়ের মধ্যে বদলে গেছে, ভোরের কোমলতাকে হটিয়ে দিয়ে কর্কশ উজ্জ্বলতা নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে আফ্রিকার কাঠফাটা দিন।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরা শেষ করল অ্যানি, পরিত্যক্ত আন্ডার-অয়্যারটা তোয়ালের ভিতর জড়িয়ে নিয়ে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এল, এক হাতে চিরুনি চালাচ্ছে মাথায়। ভাঙা দেয়ালের কাছে

ফিরে এসে দেখল আগুনের ধারে বসে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে রানা। ডিম, মাখন, রুটি, ফল—চারজনের জন্য চারটে প্লেট সাজিয়েছে ও।

'আর কী পারো তুমি?' হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল অ্যানি। 'না, ভুল হলো—জিজ্ঞেস করা উচিত, কী তুমি পারো না?'

'ব্রেকফাস্টের জন্যে পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করা হয়েছে,' কফির জন্য আগুনে পানি বসিয়ে বলল রানা। 'রোদ এড়াবার জন্যে একবার ভেবেছিলাম রাতে রওনা হব, কিন্তু না—দুর্গম পথ, অন্ধকারে গাড়ি চালালে বারোটা বাজবে ওগুলোর।' একটা প্লেট অ্যানির দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

প্লেটটা নিয়ে রানার সামনে একটা বাক্সের উপর বসল অ্যানি, মাথা নিচু করে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে শুরু করল। খানিক পর একবার মুখ তুলল মাইকেলকে আসতে দেখে। সদ্য দাড়ি কামিয়েছে মাইকেল, পোশাক দেখে কে বলবে মরুভূমিতে রয়েছে সে! ঘিয়ে রঙের ওপেন-নেক শার্ট পরেছে, দামী টুইডের ট্রাউজার, কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো জোড়া আয়নার মত চকচক করছে পায়ে। আঙুলের ডগা দিয়ে সযত্নে সোনালি গোঁফ জোড়া সমান করল সে, রানাকে হো হো করে হেসে উঠতে দেখে উঁচু হলো একটা ভুরু।

'চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ?' আওয়াজ থামলেও, হাসি থামেনি রানার। 'নাকি কোন মেয়ের সাথে ডেটিঙে বেরুবে?'

'দেখো রানা, ওল্ড চ্যাপ,' প্রথমে নিজের পোশাক, তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রানার মলিন শার্ট আর ট্রাউজারের দিকে তাকাল মাইকেল, 'তুমি কে, সেটা তোমার পোশাকেই জানিয়ে দেয়। আফ্রিকায় আছি, শুধু এই কারণে নেংটি পরে জংলী সাজতে হবে,

কী?’ তারপর তার নজর পড়ল আব্বাসের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। ‘নো অফেন্স, অফকোর্স। বলতে বাধ্য হচ্ছি, দেশীয় পোশাকে রীতিমত রাজপুত্রের মত লাগছে তোমাকে।’

খাবার প্লেট থেকে মুখ তুলে নড়েচড়ে বসল আব্বাস খায়ের, পরনের আলখেল্লা টেনে-টুনে ঠিক করল, তারপর সে-ও হাসল। ‘ইস্ট ইজ ইস্ট, অ্যান্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট,’ বলল সে।

‘বুড়ো ওয়ার্ডসওয়ার্থ খাঁটি কথা লিখে গেছে,’ সায় দিল মাইকেল, বাক্সের উপর অ্যানির পাশে ছোট্ট জায়গাটা দখল করে হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ‘দাও, ওল্ড চ্যাপ—খাবারে বিষ মেশানোর এই সুযোগ তুমি ছেড়েছ বলে মনে হয় না, কী?’

গায়ে-গতরে বোঝা নিয়ে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা পেয়েছে কারগুলো, পরস্পরের ধুলো এড়ানোর জন্য প্রতিটির মাঝখানে দুশো গজ ব্যবধান, উপকূলীয় বালিয়াড়ি টপকে বেরিয়ে এল খাঁ খাঁ মরুতে। একটানা অবিরাম তীব্র বাতাস বইলেও, হু-হু করে বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা, গাড়ির ভিতর দরদর করে ঘামছে ওরা।

কম্পাসে চোখ রেখে কলামের মুখ সামান্য দক্ষিণ দিকে তাক করেছে রানা, আব্বাসের পরামর্শ না পেলেও তাই করত ও। এই পথটা ধরায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সল্ট প্যানগুলোকে এড়ানো সম্ভব হবে। আব্বাস ওকে জানিয়েছে, ভুল করে কেউ যদি ওদিকে গিয়ে পড়ে, অপেক্ষাকৃত ভাল পথে ফিরে আসতে তিন-চার দিন সময় লেগে যাবে।

প্রথম দু’ঘণ্টা বালি মেশানো হলদেটে নরম মাটি তেমন গুরুতর কোন সমস্যার সৃষ্টি করল না, শুধু ভারি চাকা মাঝে মধ্যে

দেবে যাওয়ায় এগোনোর গতি ঘণ্টায় দশ মাইলের উপরে তোলা গেল না। লো গিয়ারে রয়েছে পুরানো এঞ্জিনগুলো, পরিশ্রমে ধুঁকছে।

তারপর ওরা শক্ত মাটিতে উঠে এল, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে পাথর। বহুযুগ ধরে বাতাস ওগুলোকে পালিশ করেছে, আকৃতি বদলে দিয়ে প্রায় প্রতিটি পাথরকে গোল করে তুলেছে, আকারে পেঁপের দানা থেকে শুরু করে রাজহাঁসের ডিম, সব ধরনেরই আছে। ঝাঁকি খেতে শুরু করল গাড়ি, গতি আরও একটু কমল। কালো পাথর থেকে অদৃশ্য তাপ ছিটকে উঠে এসে পুড়িয়ে দিল ওদের চোখ-মুখ। রানার নির্দেশে প্রতিটি গাড়ির সবগুলো হ্যাচ আর এঞ্জিন লূভর খুলে রাখল ওরা। প্রত্যেকে গায়ের কাপড় খুলে শুধু আন্ডারওয়্যার পরে আছে, অ্যানি উইসপারও ব্যতিক্রম নয়। তবু প্রতিমুহূর্তে ঘামছে ওরা, লোমকূপ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা শুকিয়েও যাচ্ছে। গাড়ির ইস্পাতে, যেখানে রোদ লাগছে, সাদা রং থাকা সত্ত্বেও, ছুঁলেই ফোসকা পড়ে যাবে চামড়ায়। মাথার উপর উঠে আসছে সূর্য, সেই সঙ্গে এঞ্জিনের তাপ আর গরম তেলের গন্ধে ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টে বসে থাকা অসহনীয় একটা শাস্তি হয়ে দাঁড়াল।

দুপুরের ঘণ্টাখানেক আগে প্রথম প্রতিবাদ জানাল চঞ্চলা, তার রেডিয়েটরের ভালব বিস্ফোরিত হলো, সশব্দে আকাশে নিক্ষিপ্ত হলো গরম বাষ্প। ম্যাগনিটো নিউট্রাল করে সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলাকে থামাল রানা। অর্ধনগ্ন, ঘামে চকচক করছে গা, টারিটের উপর উঠে দাঁড়াল ও, চোখে হাতের ছায়া ফেলে তাপ-তরঙ্গের ভিতর নৃত্যরত ধু-ধু প্রান্তরের দিকে তাকাল। অস্পষ্টতার ভিতর দিগন্তরেখার কোন অস্তিত্ব নেই, মাত্র কয়েকশো গজ সামনের দৃশ্যও পরিষ্কার

নয়। এমনকী পিছনের আর্মারড কারগুলোকেও চেনা কঠিন, দানবীয় আর অবাস্তব লাগল চোখে।

গাড়িগুলো কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর সবাইকে ডেকে বলল, 'এঞ্জিন বন্ধ করো। এই অবস্থায় এগোনো সম্ভব নয়—এঞ্জিন অয়েল পানির মত পাতলা হয়ে যাচ্ছে, চালালে সবগুলো বেয়ারিং নষ্ট হবে। একটু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

কৃতজ্ঞচিত্তে গাড়ি থেকে নেমে এল ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে যে যার গাড়ির পাশে ছায়ায় পৌঁছুল। দৌড়ে আসা কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে সবাই। ওদের সবার সামনে দিয়ে হেঁটে এল রানা, প্রত্যেকের হাতে একবার করে ধরিয়ে দিল পাঁচ গ্যালন পানি ভর্তি ক্যানটা। যার যতটুকু খুশি পানি খেয়ে নেতিয়ে পড়ল ওরা। সবশেষে পানি খেলো অ্যানি, তার হাত থেকে গ্যালনটা নিয়ে একপাশে নামিয়ে রাখল রানা, তারপর ঢলে পড়ল অ্যানির পাশে চাদরের উপর। 'এই গরমে আমার গাড়ির কাছে হেঁটে যেতে হলে মারা পড়ব,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল অ্যানি, চেহারায় বিরূপ কোন ভাব ফুটল না, আধ খোলা ব্লাউজের আরও একটা বোতাম লাগাল। পানিতে রুমাল ভিজিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। সেটা নিয়ে ঘাড় আর মুখ মুছল অ্যানি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'এই গরমে শুতে পারব না,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমাকে খানিকটা আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করো, রানা।'

'শোনো মেয়ের কথা!' রানার হাসিতে কোন শব্দ নেই, কিন্তু অ্যানির হাসি ঠিকই শুনতে পাওয়া গেল।

'বললাম বড় বেশি গরম। এসো গল্প করি।'

'কী নিয়ে?'

'তোমাকে নিয়ে। নিজের কথা বলো—কোত্থেকে, কেন, কোথায়

যাচ্ছ তুমি, ইত্যাদি।'

'আমি বাঙালী, ভবঘুরে—ব্যস, নটে গাছটি মুড়াল, আমার গল্পও ফুরাল।'

'ধ্যেৎ! কেন, বলতে বাধা কীসের? তুমি যে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র, সে তো বোঝাই যায়। পালাচ্ছ, তাই না? নিজের কাছ থেকে? কেউ ছ্যাঁক দিয়েছে? নাকি...'

'আমার সম্পর্কে অনেক দূর ভেবেছ দেখছি!' মনে মনে অবাক হলো রানা। 'পালাচ্ছি? কেন, এ-কথা কেন মনে হলো?'

'ভুলে যাচ্ছ কেন আমি একজন সাংবাদিক,' স্মিত হাসি ফুটল অ্যানির ঠোঁটে। 'খবর সংগ্রহ করাই আমার কাজ। তোমার মনের খবর খানিকটা হলেও আন্দাজ করতে পারি বৈকি।'

'এসো, কমপ্রোমাইজ করি। যতটুকু স্বীকার করব, তার বেশি তুমি জানতে চাইবে না, রাজি?'

'রাজি।'

'আমি পালাচ্ছি না,' বলল রানা। 'বলতে পারো, কিছু দিনের জন্যে সরে আছি।'

'কারও কাছে বাঁধা আছ?' অ্যানির চোখে গভীর আগ্রহ, সেটা লক্ষ করেই প্রশ্নটার অন্তর্নিহিত অর্থ ধরে ফেলল রানা।

'না। অনেকে কাছে এসেছে, কিন্তু ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেনি—টের পেয়ে যায়, আমাকে ধরে রাখা যাবে না।'

'ধরে রাখা যাবে না...দায়ী কে—পেশা, না প্রকৃতি?'

'বোধহয় দুটোই।'

'স্বপ্নের কথা বলো, রানা,' ম্লান হেসে প্রসঙ্গ পাল্টাল অ্যানি উইসপার।

'স্বপ্ন?'

‘সবারই একটা স্বপ্ন থাকে, তোমারটা কী?’

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকবার পর রানা বলল, ‘স্বপ্ন আমার একটা আছে বটে, কিন্তু দুঃখিত, সেটা রোমান্টিক কোন ব্যাপার নয়–অনেকের কাছে অবাস্তবও মনে হতে পারে। তবু স্বপ্নটা আমি মনের গভীরে বেশ কিছুদিন থেকে লালন করছি।’

‘কী সেই স্বপ্ন?’

‘তুমি সাংবাদিক, বাংলাদেশের কথা তোমাকে ব্যাখ্যা করে না বললেও চলবে, তাই না? আমার স্বপ্ন হলো একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। সে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী হয়ে আসবে, যদি না আসে বেঁধে নিয়ে আসা হবে, অযোগ্য আর দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতারা। তাদের পড়াবে কে জানো? কমপিউটর, বেত আর গ্রাম্য চাষী। কমপিউটর তাদের শেখাবে কীভাবে জনসাধারণের টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে ও দিতে হয়। বেত যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করবে। আর গ্রাম্য চাষীর কাছ থেকে ওরা শিখবে কীভাবে দেশকে, দেশের মাটিকে ভালবাসতে হয়। আমার স্কুলে ছাত্র হতে হবে লোভী ব্যবসায়ী, ঘুষখোর আমলা, অল্প জ্ঞানী অধ্যাপক আর মধ্যসত্ত্বভোগী টাউটদের। ব্যবসায়ীদের ক্লাস নেবে ভূমিহীন কৃষক আর বেকার যুবকরা, ঘুষখোর আমলাদের শিক্ষা দেবে আমার স্কুল থেকে ইতিমধ্যে পাশ করা ধর্ম-ব্যবসায় ভণ্ড মৌলভিরা, আর মেয়েরা…,’ ভাষণ দেওয়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে হঠাৎ চুপ করে গেল রানা, কয়েক সেকেন্ড পর মৃদুকণ্ঠে বলল, ‘দুঃখিত, অ্যানি। ভেবো না শখ করে নাটুকে চরিত্র হয়ে উঠছি–এ হলো অক্ষমের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, আরে, এ-সব তোমাকে কেন শোনাচ্ছি আমি?’

রানার কথা শুনতে শুনতে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা তুলেছে অ্যানি, অপলক চোখে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি, হঠাৎ যেন আরেক মাসুদ রানাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে। ঈশ্বর

রক্ষা করুন, মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যানি উইসপার, বুকে এত ক্ষোভ নিয়ে লোকটা মারা পড়বে যে! আন্তরিক উৎসাহ দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, বাধা দিল রানা।

'না, আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো। তোমার স্বপ্ন।'

হালকা সুরে হেসে উঠল অ্যানি।

'না, আমি শুনতে চাই,' জেদ ধরল রানা।

'একটা বই। উপন্যাস, রানা। সেই জ্ঞান হবার পর থেকে ওটা নিয়ে ভাবছি আমি। মনে মনে অন্তত একশোবার লিখে ফেলেছি, এখন শুধু সময় করে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই হয়ে যায়...,' হঠাৎ থেমে আবার হেসে উঠল অ্যানি উইসপার। '...তা ছাড়া, অবশ্যই, ছেলেমেয়ে আর ঘর-সংসারের স্বপ্ন দেখি আমি। এই অল্প বয়েসে বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়েছি আমি, বারবার—অথচ ফেরার কোন জায়গা নেই আমার, আমার নিজের আপনজন বলতে কেউ নেই।'

'তোমার স্বপ্নটা সুন্দর, আশা করা যায় জীবনে তুমি খুব সুখী হবে,' বলল রানা।

'তোমার স্বপ্নটা আমাকে নাড়া দিয়েছে, তার কারণ আমি যে উপন্যাসটা লিখব বলে ভেবেছি সেটারও বিষয় ক্ষোভ, ঘৃণা, বিদ্রোহ, ভালবাসা আর দেশপ্রেম।'

ওদের কথা আর হাসি অস্পষ্টভাবে হলেও, শুনতে পাচ্ছে মাইকেল সেভারস। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একবার খানিকটা মাথাও তুলল। কালো পাথরের উপর দিয়ে বারো-তেরো গজ দূরত্ব, গুরুত্বের সঙ্গে ভাবল যাবে কিনা। কিন্তু অসহ্য গরম লাগায় ইচ্ছেটা জোরাল হতে পারল না, ভাবল থাক ওরা শুয়ে। চাদরে আবার ঢলে পড়ল সে, পেপারওয়েট সাইজের একটা পাথর গুঁতো

মারল কিডনিতে, নিঃশব্দে অভিশাপ দিল ও।

বিকেল পাঁচটার দিকে রানা সিদ্ধান্ত নিল আবার চালু করা যায় এঞ্জিন। ক্যান থেকে ফুয়েল ভরা হলো ট্যাংকগুলোয়, আবার কলামের আকৃতি নিয়ে রওনা হলো চারটে আর্মারড কার। গতি খুব মন্থর, হেঁটেও এরচেয়ে দ্রুত এগোনো যায়। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেলো গাড়ি, অবস্থা কাহিল হলো ড্রাইভারদের।

দু'ঘণ্টা পর হঠাৎ করেই কালো পাথরের এলাকা থেকে বেরিয়ে এল ওরা, সামনে লাল বালি ঢাকা নিচু পাহাড়, একটার পর একটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্পীড বাড়াল রানা, অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে ছুটল কলামটা। দিগন্তের কাছে ধুলোভরা আকাশে বিদায়ী সূর্য যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, দেখতে দেখতে আগুনটা রঙ বদলাতে শুরু করল—কোথাও হালকা লাল, কোথাও গোলাপি, কোথাও টকটকে রক্তবর্ণ, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিল অর্ধেক আকাশ। থমকে গেছে মরু-বাতাস, সারাদিনের তাপের স্মৃতি নিয়ে স্থির আর ভারি হয়ে আছে পরিবেশ। প্রতিটি গাড়ি পিছনে ঘন আর লম্বা ছায়া ফেলছে, ছায়ার উপর পাক খেতে খেতে মাথাচাড়া দিচ্ছে লাল ধুলোর মেঘ।

রাত নেমে এল হঠাৎ করে, গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। আগেই হিসাব করেছে রানা, সারা দিনে ওরা বিশ মাইলও এগোতে পারেনি। চাকার নীচে মাটি বা বালি অনুকূল, এঞ্জিনের গোঙানি অনেক কমে গেছে, গাড়ির ভিতর এখন আর গরমে সেদ্ধ হচ্ছে না ড্রাইভাররা—কাজেই থামবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। আকাশে মুখ তুলে কালপুরুষের উপর দৃষ্টি রাখল ও, কম্পাসের কাঁটা অ্যাডজাস্ট করল, হেডলাইটের সুইচ অন করে পিছনে তাকাল বাকি সবাই দৃষ্টান্তটা অনুকরণ করছে কি না দেখবার জন্য। চঞ্চলার সামনে একশো গজ লম্বা উজ্জ্বল আলোর

একটা পথ তৈরি হলো, এতে করে ঘন কাঁটাঝোপ আর মরু খরগোশগুলোকে এড়ানোর সময় পাবে রানা। ধূসর রঙা খরগোশগুলোর চোখ হীরের মত জ্বলজ্বলে। হেডলাইটের আলো ওগুলোকে সম্মোহিত বা অবশ করে ফেলে, আলোর পথ থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে সরতে পারে না।

খানিক পর পানাহারের জন্য থামবার কথা ভাবল রানা, পরে আবার রাত গভীর হবার আগেই রওনা হওয়া যাবে। এই সময় লাল বালি ঢাকা শেষ পাহাড়টা টপকে এল গাড়ি, হেডলাইটের আলোয় সমতল সাদা বালির মসৃণ চকচকে বিস্তৃতি দেখতে পেল রানা। রওনা হবার পর এই প্রথম টপ গিয়ার দিল ও, ব্যগ্রতার সঙ্গে সামনের দিকে লাফ দিয়ে ছুটল চঞ্চলা–একশো গজের মত–তারপরই সল্ট প্যানের শক্ত মোটা ছাল ধসে গেল, পেট পর্যন্ত দেবে গেল চঞ্চলার ভারি চেসিস। গতি অকস্মাৎ রুদ্ধ হওয়ায় সামনের দিকে ছিটকে পড়ল রানা, ইস্পাতের মুখোশের ভিতর থেঁতলে গেল কপালের চামড়া, ব্যথা পেল কাঁধের হাড়ে।

থ্রটল বন্ধ করে এঞ্জিনের গর্জন থামাল রানা, টারিট থেকে বেরিয়ে এসে থামবার সংকেত দিল পিছনের গাড়িগুলোকে। সাবধানে গাড়ির পাশে নামল ও, কী ধরনের গাড্ডায় পড়েছে বুঝবার চেষ্টা করল, এই সময় তুষার ধবল প্যানের উপর দিয়ে হেঁটে এল মাইকেল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করল ওরা।

'বাজে কোন কথা বলে দেখুক!' মনে মনে বলল রানা। রাগ আর হতাশায় কাঁপছে ও, পাকানো মুঠো হাতুড়ির মত শক্ত।

'চুরুট?' রানার সামনে বাক্সটা খুলে ধরল মাইকেল।

রাগের মাত্রা সামান্য কমল।

'ক্যাম্প করার জন্যে জায়গাটা কিন্তু মন্দ না, কী?' বলে চলল মাইকেল। 'সকালে দেখব কীভাবে তোলা যায় ওটাকে।' রানার কাঁধে মৃদু চাপড় দিল সে। 'এসো, তোমাকে বিয়ার খাওয়াব।'

'আমি অপেক্ষা করছিলাম, তুমি অন্য কিছু বললে এক হাত হয়ে যেত,' বলল রানা, ঠোঁট মেলে হাসল, মাথা নাড়ল–ওর তুঙ্গে ওঠা মেজাজ মাইকেল আগেই বুঝতে পারায় বিস্মিত হয়েছে। 'ভেবেছ বিয়ার খাওয়াতে চেয়েছি শুধু শুধু?' পাল্টা হাসি উপহার দিল মাইকেল সেভারস। 'তোমার সাথে মারামারি? কল্পনাও করতে পারি না, ওল্ড চ্যাপ। আমরা দুই যমজ ভাই, মনে আছে, কী?'

মাঝরাতের পরপরই ঘুম ভেঙে গেল অ্যানি উইসপারের, নিশীথের অসাড় নিশ্চল গভীর নিস্তব্ধতা ভয় পাইয়ে দিল ওকে, কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে, দ্বিতীয়বার চোখ মেলতে পারল না। তারপর অস্পষ্ট আওয়াজটা শুনতে পেল ও। কার যেন নাক ডাকছে। পরিচিত আওয়াজ, কিন্তু তিনজনের মধ্যে কার, তা এখনও জানবার সুযোগ হয়নি। ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু অনেক সময় এ-ধরনের ছোটখাট ব্যাপারও একটা মেয়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে–ভেবে দেখো, বাকিটা জীবন পাশে করাতকল নিয়ে ঘুমাতে কেমন লাগবে তোমার!

তবে ঘুমটা নাক ডাকবার আওয়াজে ভাঙেনি। কারণটা হয়তো ঠাণ্ডা। মরুভূমির বৈশিষ্ট্যই তো এই, দিনে আগুন, রাতে বরফ। চাদরটা বুকের উপর টেনে নিয়ে চোখ বুজে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করল অ্যানি। পরমুহূর্তে ঝট্ করে সটান বসে পড়ল–শিরদাঁড়া খাড়া, চোখ বিস্ফারিত, প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট।

অলৌকিক, অবাস্তব একটা আওয়াজ; জীবনে কখনও শোনেনি

অ্যানি। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড শোনা গেল, অসম্ভব ভরাট, প্রতিমুহূর্তে আরও ভারি হতে হতে গোটা দুনিয়া যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগল। আতংকের শ্লথগতি হিমশীতল স্পর্শ ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। চিৎকার করতে চাইল অ্যানি, লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা পুরুষ সঙ্গীদের দিকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো। নড়লে বা চিৎকার দিলে ওর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে ভেবে অনড় বসে থাকল সে, সমগ্র অস্তিত্ব সজাগ হয়ে অপেক্ষা করছে আবার কখন শোনা যাবে গর্জনটা।

'ভয় পাবার কিছু নেই, মিস উইসপার।' শান্ত গলা শুনে চমকে উঠল অ্যানি। 'কয়েক মাইল দূরে ওটা।' ঘাড় ফিরিয়ে ইথিওপিয়ান যুবক আব্বাস খায়েরকে দেখতে পেল সে, এখনও চাদরের তলায় রয়েছে, বাইরে শুধু মাথাটা দেখা যাচ্ছে, তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'মাই গড, আব্বাস—কী ওটা, কীসের আওয়াজ?'

'সিংহ, মিস উইসপার,' ব্যাখ্যা করল আব্বাস, গলার সুরেই বোঝা গেল অতি পরিচিত আওয়াজটা অ্যানি চিনতে না পারায় অবাক হয়েছে সে।

'সিংহ? ওটা সিংহের গর্জন?' সিংহ যে এভাবে ডাকে, অ্যানির কল্পনাতেও ছিল না।

'আমার গোত্রের মুরুব্বিরা বলে, এমনকী সাহসী একজন লোকও সিংহকে তিনবার ভয় পায়—প্রথমবার যখন সে ওটার গর্জন শোনে।'

'বিশ্বাস করলাম,' ফিসফিস করে বলল অ্যানি। 'সত্যি বিশ্বাস করি।' চাদর তুলে উঠে দাঁড়াল সে, সাবধানে হেঁটে এল রানা আর মাইকেল যেখানে শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে ওরা। দু'জনের

মাঝখানে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটায় চাদর বিছাল সে, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। মনে খানিকটা সাহস ফিরে এসেছে, সিংহটা এখন শিকার বাছবার সুযোগ পাবে, হামলা করবার জন্য একা শুধু তাকেই দেখতে পাবে না। কিন্তু তবু তার ঘুম এল না।

নয়

হরিণের হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি নিয়ে বিজয়ীর বেশে তাঁবুতে ফিরল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক, শিফটা সৈনিকরা বীরোচিত সম্বর্ধনা দিল তাকে। কিন্তু তার মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াল জেনারেল ফাদের জরুরী বার্তা। ফাদ সবিনয়ে জানিয়েছে, গন্তব্যে পৌঁছুতে কাউন্ট যদি এভাবে অযথা দেরি করে, বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবতে বাধ্য হবে সে। ঘুমাতে যাবার আগে গভীর আন্তরিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল কাউন্ট, কেউ আর তাকে ধরে রাখতে পারবে না, সকাল হওয়ামাত্র ওয়েলস অভ চাল্ডি অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে সে।

কিন্তু ভোর হবার খানিক আগেই ঘুম ভেঙে গেল কাউন্টের, উপলব্ধি করল কাল রাতে ডিনারের সময় যে কিঅ্যানটি (ইটালিয়ান মদ) গলাধঃকরণ করেছিল সেটা সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মত পেটের ভিতর দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। সাধারণ কোন মানুষ সমস্যাটার সমাধান পাবার জন্য নিঃশব্দে বিছানা ত্যাগ করত, কিন্তু কাউন্ট যে-কোন তুচ্ছ কাজেও জাঁকজমক পছন্দ করে, তা ছাড়া সব কাজে তার নিজস্ব স্টাইলের ছোঁয়াও না থেকে পারে না।

পেটের ব্যথায় একবার বিছানার উপর উঠে বসলেও, করণীয়

স্থির করবার পর আবার শুয়ে পড়ল সে, তারপর বাঘের মত একটা হুংকার ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাম্প হাতে তাঁবুতে ঢুকল বানানটো সাতা, কোমরের কাছে এক হাতে ধরে আছে ট্রাউজার, লাল চোখ ঘুমে এখনও ঢুলুঢুলু। তার পিছু পিছু ঢুকল কাউন্টের ব্যক্তিগত ভৃত্যরা, প্রত্যেকের হাতে ল্যাম্প, অপর হাত দিয়ে সবাই চোখ রগড়াচ্ছে।

শারীরিক অস্বস্তির কথা ব্যক্ত করল কাউন্ট, নিবেদিত প্রাণ দলটা তার বিছানার চারদিকে জড়ো হয়ে উৎকণ্ঠা আর সহানুভূতি প্রকাশ করল। বানানটো সাতা মহাশয়কে দু'হাত দিয়ে তুলে নিল বুকে, সে যেন একটা অথর্ব। মেঝেতে নামানো হলেও, কয়েক জোড়া হাত দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল তাকে, এই সুযোগে নীল চাইনীজ সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরানো হলো। একজন ভৃত্য স্লিপার নিয়ে এসে কাউন্টের পায়ে গলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাউন্ট তাকে লাথি মেরে ফেলে দিল, সোনালি ছাড়া অন্য কোন রঙের স্লিপার সে পরবে না। ইতিমধ্যে তার ব্যক্তিগত গার্ডদের লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলেছে বানানটো সাতা, তাঁবুর বাইরে সশস্ত্র অবস্থায় তৈরি হয়ে আছে তারা।

তাঁবু থেকে বের হলো কাউন্ট, সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট মিছিলটা ল্যাট্রিনের দিকে রওনা হলো, কাউন্টের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে ওটা।

ল্যাট্রিনের ভিতর প্রথম ঢুকল সাতা; সাপ, ব্যাঙ, বিছে, আরশোলা বা টিকটিকি আছে কিনা দেখবার জন্য। তারপর ঢুকল একজন গার্ড, গুপ্তঘাতকের সন্ধানে। সে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করল, ল্যাট্রিন সম্পূর্ণ নিরাপদ। এবার ভিতরে ঢুকল কাউন্ট। তার

এসকর্ট টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বাইরে, সবাই শ্রদ্ধা এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ছোটখাট কিন্তু ঘন ঘন অবিরাম বিস্ফোরণের শব্দগুলো শুনতে লাগল। তারপর শোনা গেল দুনিয়া কাঁপানো, আকাশ ফাটানো একটা পুরুষ সিংহের গর্জন।

ল্যাট্রিন থেকে বুলেটের মত ছিটকে বেরিয়ে এল কাউন্ট, ল্যাম্পের আলোয় সাদা ধবধব করছে তার চেহারা। 'মিষ্টি ও দয়াবতী ঈশ্বরের মা!' প্রায় কেঁদে ফেলল সে। 'কী ওটা?'

জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, কেউ তার প্রশ্নটাকে গুরুত্বই দিল না। সশস্ত্র গার্ডদের নাগাল পাবার জন্য রীতিমত দৌড় দিতে হলো কাউন্টকে, এরইমধ্যে ক্যাম্পের সীমানায় ফিরে গেছে তারা।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে নিরাপদ বোধ করল কাউন্ট। প্রাণদণ্ডের হুমকি দেওয়ায় স্টাফরাও সবাই আবার তার তাঁবুতে জড়ো হয়েছে। ধীরে ধীরে কাউন্টের পালসরেট স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে এল, মেজর লুইগি রাকা তাকে অভয় দিয়ে জানাল, অপ্রত্যাশিত গর্জনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো ইরিত্রীয় গাইড ফিরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্টটা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে মহা হৈ-চৈ এবং আতংক ছড়িয়ে পড়ল গোটা ক্যাম্পে।

'সিংহ?' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল কাউন্ট, তারপর আবার বলল, 'সিংহ?' অজানা ভয় দূর হয়েছে, তার একটা কারণ ইতিমধ্যে ফর্সা হতে শুরু করছে পুবের আকাশ। শিকারীসুলভ উত্তেজনায় চকচক করে উঠল কাউন্টের চোখ, ফুলে উঠল বুক।

'রিপোর্টে আন্দাজ করা হয়েছে, মাই কাউন্ট, মরুভূমিতে আপনার ফেলে আসা হরিণটাকে খাবে বলে রওনা হয়েছে পশুরাজ,' ইরিত্রীয় গাইডের বক্তব্য ভাষান্তর করে শোনাচ্ছে

মেজর। 'রক্তের গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

'সাতা!' আদেশ করল কাউন্ট, 'ম্যানলিকারটা আনো। ড্রাইভারকে বলো এই মুহূর্তে রোলস-রয়েস নিয়ে আমার তাঁবুর সামনে চলে আসুক। আমি শিকারে বেরুব।'

'মাই কর্নেল,' প্রতিবাদ জানাল মেজর রাকা। 'থার্ড ব্যাটালিয়ান, আপনারই নির্দেশে, সকালে মার্চ করার কথা!'

'নির্দেশ বাতিল করা হলো!' খেঁকিয়ে উঠল কাউন্ট, এরইমধ্যে সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে সিংহের চামড়াটা তার লাইব্রেরীর ডেস্কে বিছানো রয়েছে। হঠাৎ করে হরিণ শিকারের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেল তার। 'মেজর,' হুকুম করল সে, 'আমি চাই বিশজন সশস্ত্র লোক আমার সঙ্গী হবে। ওদের বাহন হিসেবে একটা ট্রাক দাও। প্রত্যেকের সাথে থাকবে একশো রাউন্ড করে অ্যামুনিশন।' না, বোকার মত কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয় সে।

এখন তার পূর্ণ যৌবন, বয়স ছয়, মরুভূমিতে বেড়ে ওঠায় জংলী সিংহের চেয়ে আকারে সে অনেক বড়। দাঁড়ানো অবস্থায় কাঁধের কাছে তিন ফুট উঁচু, ওজন চারশো পাউন্ডের কিছু বেশি হবে। ঢলে পড়া সূর্যের তির্যক রশ্মি তার চামড়ার পিচ্ছিল লালচে গেরুয়া রঙ উজ্জ্বল করে তুলেছে, কেশরটাকে পরিণত করেছে স্বর্ণ বলয়ে। ঘন আর দীর্ঘ কেশর, চওড়া সমতল মাথাটাকে ফ্রেমে আটকেছে, কাঁধ ছাড়িয়ে আরও অনেক পিছনে তার বিস্তার, বুক আর পেট থেকে এত বেশি ঝুলে আছে যে মাটি প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে সে, মাথাটা খুব নিচু করা, কষ্টসাধ্য প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে একদিক থেকে আরেকদিকে দুলছে সেটা। চাপা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে প্রতিটি নিঃশ্বাসের

সঙ্গে, মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্ষতস্থানের উপর নীল মেঘের আকৃতি নিয়ে উড়তে থাকা মাছিদের গুঁতো মারবার চেষ্টা করছে মাথা দিয়ে। মাছি তাড়াবার পর ছোট্ট গাঢ় রঙের ফুটোটা চাটছে সে, অনবরত পানির মত স্বচ্ছ রক্ত বেরুচ্ছে ওটা থেকে। বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসছে ফ্যাকাসে লাল জিভ, ঘোড়ার চামড়ার মত কর্কশ, ঘন ঘন ঘষা খাচ্ছে নরম ক্ষতের গায়ে, ক্ষতের চারদিকে কামানো একটা ভাব এনে দিয়েছে।

ছুটে পালানোর জন্য ঘুরতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে নাইন পয়েন্ট থ্রি ম্যানলিকার বুলেট জখম করে তাকে। শেষ পাঁজরের দু'ইঞ্চি পিছন থেকে শরীরের ভিতর ঢুকেছে বুলেটটা, নয় টন ওজনের বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে পশুরাজ, ম্লান ধুলোর মেঘ তুলে গড়াগড়ি খেতে শুরু করে। তামার জ্যাকেট পরানো বুলেটের মাথায় রয়েছে নরম সীসা, পেটের ভিতরটা ছিন্নভিন্ন করবার সময় চ্যাপ্টা হয়ে আকারে বেড়ে যায় ওটা, নাড়িভুঁড়ি চিরে দেয়, ছিঁড়ে ফেলে বড় চারটে শিরা। কিডনির পাশ ঘেঁষে গেছে বুলেটটা, দুটোকেই মারাত্মকভাবে জখম করেছে, তাই থেমে দাঁড়িয়ে যতবারই রক্ত মেশানো প্রস্রাব করবার জন্য পিঠ ধনুকের মত বাঁকিয়ে নিচু হলো, বিরতিহীন ড্রাম পেটানোর গুরগুর গর্জন বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। সবশেষে পেলভিক বেষ্টনী ভেদ করেছে বুলেট, হাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে রুদ্ধ হয়েছে ওটার গতি।

সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে, কয়েকটা গড়ান দেওয়ার পর, উঠে দাঁড়ায় পশুরাজ। নিচু হয়ে ছুটতে শুরু করে সে, সবচেয়ে খাটো ঝোপটাকে পাশ কাটানোর সময়ও তার পিঠ আর কাঁধ পাতা বা ডালের উপরে ওঠেনি। যদিও আরও প্রায় দশ বারোটা বুলেট তার দিকে ছুটে এসে আশপাশে ধুলো উড়িয়েছে, একটা তো এত কাছে এসে পড়ে যে তার চোখ বালিতে ভরে যায়,

তবে একটাও আর ছুঁতে পারেনি তাকে।

দলে ছিল সাতটা সিংহ। দ্বিতীয় পুরুষটার কেশর ছিল আরও ঘন আর গাঢ় রঙের, ওজনও ছিল অনেক বেশি। গর্ভবতী যুবতী ছিল দুটো। বাকি তিনটে শিশু।

ঝাঁক ঝাঁক গুলি বৃষ্টির ফাঁক গলে এই পূর্ণ বয়স্ক সিংহটাই শুধু বেঁচে গেছে। ছুটছে সে, প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তার পেটের ভিতর থকথকে রক্ত একদিক থেকে আরেক দিকে গড়াচ্ছে, এখনও পুরোপুরি জমাট বাঁধেনি। সারা শরীরে অবসাদ, প্রতি মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, শুধু অসহ্য পিপাসা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে। অ্যাওয়াস নদীর কিনারা এখনও বারো মাইল দূরে।

ভোরে দেখা গেল চঞ্চলার চারটে চাকাই সল্ট প্যানের পাঁকে ডুবে গেছে। খালি গায়ে অবিরাম কোদাল চালাল রানা, ওকে সাহায্য করল আব্বাস খায়ের। এমনকী কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ ফুলবাবু মাইকেল সেভারসও নিজ উদ্যোগে কখনও কোদাল দিয়ে পাঁক সরাল, কখনও কাঁটাঝোপের মোটা ডাল কেটে এনে জড়ো করল এক জায়গায়।

মনোযোগের অভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, ফলে নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে কাজ করছে রানা, জানে কমপক্ষে পুরো একটা দিন পিছিয়ে পড়ল ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অসহ্য গরম ওর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়, এই অজুহাত মেনে নিতে না পারায় রাগটা আত্মপীড়নের সমতুল্য হয়ে উঠেছে। আব্বাস তো আগেই ওকে সাবধান করে দিয়েছিল।

সূর্য উঠবার আগে এক ঘণ্টা কাজ করল ও, পাঁচ মিনিট বিশ্রাম

নিয়ে তারপর আরও দু'ঘণ্টা, রোদ আর গরম অসহ্য হয়ে উঠবার পরও কাজ শেষ না করে থামল না।

প্রথমে চার চাকার আশপাশ থেকে পাঁক সরানো হলো। এরপর গাড়ির এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের নীচে সমতল পাথর আর মোটা ডাল ফেলে শক্ত একটা ভিত রচনা করল রানা। ধুলো কাদায় শুয়ে গাড়ির বেস-এ ফিট করা হলো জ্যাকটা। ধীরে ধীরে গাড়ির সামনের দিকটা উঁচু করে তোলা হলো। জ্যাকের হাতল পালা করে ঘোরাচ্ছে রানা আর মাইকেল।

সামনের চাকা এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঁচু হলো, আব্বাস আর অ্যানি চার হাতে ওগুলোর তলায় ডালপালা ভরল। কঠিন পরিশ্রমের কাজ, পুনরাবৃত্তি করা হলো পিছনের চাকাতেও।

দুপুর পেরিয়ে যাবার পর প্রাথমিক কাজটা শেষ হলো—ডালপালা আর পাথরের চারটে স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চঞ্চলা। তার পেট সারফেস ছেড়ে উঠে এসেছে।

'এবার?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল। 'পিছন দিকে চালাবে?'

'চাকা একবার ঘুরলেই সমস্ত ডালপালা উড়ে যাবে,' বিড়বিড় করে বলল রানা, পাকিয়ে গোল করা শার্ট দিয়ে ঘাম মুছল বুকের। মাইকেলের দিকে তাকিয়ে ভারি অস্বস্তি বোধ করল ও, রোদের ভিতর একটানা পাঁচ ঘণ্টা গাধার খাটনি খেটেছে সে, ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে, মাটিতে কাত হয়ে থেকে হাতল ঘুরিয়েছে জ্যাকের, অথচ লোকটা প্রায় ঘামেনি বললেই চলে, তার কাপড়ে কোথাও কোন দাগ নেই—ঈর্ষাবোধ করবার আরও একটা বড় কারণ, তার চুল এমন সুন্দরভাবে সাজানো যেন এইমাত্র চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হয়েছে।

রানার পরামর্শ মত আরও কিছু ডালপালা কেটে আনা হলো, সেগুলো সল্ট প্যানের কিনারায়, শক্ত আবরণের উপর ফেলল

ওরা। নিতম্বিনীকে চালিয়ে সল্ট প্যানের ধারে নিয়ে এল অ্যানি, তিনটে মোটা ম্যানিলা লাইন-এর কয়েল দিয়ে দুটো গাড়িকে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হলো। চঞ্চলার টারিটে উঠে গেল মাইকেল, হুইলের দায়িত্ব নিল সে। আব্বাস আর রানা দুটো মোটা ডাল নিয়ে নীচে থাকল, দরকার হলে চাকা তুলবার কাজে ব্যবহার করবে ওগুলো।

'প্রার্থনা ইত্যাদির অভ্যাস আছে, মাইকেল?' হাঁক ছেড়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওল্ড চ্যাপ, আজও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না?' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল মাইকেল। 'আমি কর্ম, কৌশল আর আভিজাত্যে বিশ্বাসী।'

'তা হলে তোমার অভিজাত ভাগ্যটাকে সাফল্য প্রসব করতে বলো,' মুখ ভেঙচাল রানা, দেখল নিতম্বিনীর হ্যাচের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যানির সোনালি মাথা। আগেই এঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে অ্যানি, শব্দটা বাড়ল এবার, পিছনের দিকে এগোল গাড়ি, টান টান হলো লাইনগুলো।

ধীরে ধীরে চঞ্চলাকে টানছে নিতম্বিনী, ডালপালার শক্ত ভিতের উপর দিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পিছু হটছে চঞ্চলা। অবশেষে শক্ত মাটিতে উঠে এল চাকা। স্বস্তি আর বিজয়ের আনন্দে পাগলের মত হেসে উঠল ওরা।

লুকিয়ে রাখা একটা বাক্স থেকে চার বোতল বিয়ার বের করল রানা। বোতলের ভিতর বিয়ার এতই গরম হয়ে আছে যে ছিপি খুলবার সঙ্গে সঙ্গে হুস করে অর্ধেকের বেশি বুদ্‌বুদ্‌ হয়ে উপচে পড়ল, এক ঢোকের বেশি জুটল না কারও কপালে।

'সন্ধ্যের আগে আমরা অ্যাওয়াস নদীতে পৌঁছুতে পারব?'

রানার প্রশ্ন শুনে সূর্যের অবস্থান দেখে নিল আব্বাস। 'আর যদি সময় নষ্ট না করি।'

সল্ট প্যান এড়াবার জন্য নতুন দিক নির্ণয় করা হলো। কলামের আকৃতি নিয়ে আবার রওনা হলো গাড়িগুলো। বিকেলের মাঝামাঝি সময় বালিসর্বস্ব মরুতে পৌঁছুল ওরা, টাওয়ারের মত উঁচু বালিয়াড়িগুলো নীচের গভীর গহ্বরে লোভনীয় গাঢ় ছায়া ফেলেছে। বালির রঙ কোথাও গভীর লালচে, কোথাও প্রায় বেগুনি, আবার কোথাও হালকা বাদামি ও সাদা, আর বালি এত মিহি ও নরম যে প্রতিটি বালিয়াড়ির চূড়া থেকে ধোঁয়ার মত উড়ছে বাতাসে।

আব্বাসের দিক নির্দেশনায় উত্তর দিকে ঘুরে গেল কলামের নাক, আধ ঘণ্টার মধ্যে নাগাল পাওয়া গেল আয়রনস্টোনের দীর্ঘ বিস্তৃতি, বালিময় মরুকে দ্বিখণ্ডিত করে সরু একটা বাঁধের মত এগিয়ে গেছে। আঁকাবাঁকা পাথুরে বাঁধের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল কলামটা, দু'পাশে ক্রমশ আরও উঁচু হয়ে উঠল বালিয়াড়িগুলো।

ইথিওপিয়ান নিম্নভূমির শুকনো সমতল ঘাস-ঢাকা প্রান্তরে এমন হঠাৎ করে বেরিয়ে এল ওরা, বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খাওয়ার মত অনুভূতি হলো ওদের। অবশেষে মূল মরু পিছিয়ে পড়ল, সামনের ধু-ধু প্রান্তরে গাছ না থাকলেও উঁচু ঝোপ রয়েছে প্রচুর। গোটা প্রান্তর শুকনো ঘাসে মোড়া, যদিও ঘাসের রঙ পুড়ে গেছে রোদে, দেখতে হয়েছে অনেকটা ফ্যাকাসে সাদা বা রুপোর মত। সবচেয়ে যেটা খুশি করল ওদের, ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ডাকছে দূর দিগন্তের কাছ থেকে গাঢ় নীল পাহাড়শ্রেণী।

নিচু ঘাস, নরম; মহানন্দে ছুটল চার লৌহমানবী। সামনের পিঁপড়ের গর্ত বা উইঢিবি পড়লে মাঝে মধ্যে ঝাঁকি খেলো, তবে

গুরুতর কোন সমস্যা হলো না। দিন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যাত্রাবিরতির সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে রানা, এই সময় ওদের সামনের খোলা প্রান্তর ভোজবাজির মত ফাঁক হয়ে গেল। পঞ্চাশ ফুট নীচে অ্যাওয়াস নদীর খাদ দেখতে পেল ওরা, কিনারা থেকে বুকে বড় বড় বোল্ডার নিয়ে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে ঢাল। ঠিক নদী নয়, বলা চলে নালা—গাড়ি থেকে নেমে সবাই ওরা নালার ঠোঁটের কাছে ভিড় জমাল, সবারই হাত পা আড়ষ্ট হয়ে আছে।

'ওই ইথিওপিয়া, দুশো গজ সামনে। দেশের মাটিতে শেষবার দাঁড়িয়েছি আমি দু'বছর আগে,' বিড়বিড় করে বলল আব্বাস খায়ের, দিনের শেষ আলোয় চকমক করে উঠল তার বড়সড় চোখ। আদ্দিস আবাবার কাছাকাছি উঁচু একটা উৎস থেকে রওনা হয়ে খাদের ভিতর দিয়ে নিম্নভূমির দিকে চলে এসেছে অ্যাওয়াস নদী। আব্বাস আরও জানাল, ভাটির দিকে খানিকদূর গেলে দেখা যাবে নিচু জলাভূমিতে হারিয়ে গেছে নদীটা। এই মুহূর্তে এখনও ওরা সোমালি প্রজাতন্ত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামনে ইথিওপিয়া।

'ওয়েলস অভ চান্ডি আর কতদূর?' আব্বাসকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল মাইকেল। তার জন্য ওটাই রঙধনুর শেষ প্রান্ত, অর্থাৎ ওখানে পৌঁছুলেই সোনায় ভরে উঠবে তার ঝোলা।

কাঁধ ঝাঁকাল আব্বাস। 'আর হয়তো পঞ্চাশ মাইলের মত।'

'কিন্তু এটা পেরোব কীভাবে?' বিড়বিড় করে বলল রানা, নীচের অস্পষ্ট নালার দিকে তাকিয়ে আছে। ছায়ার ভিতর নালার পানি ম্লান রুপোর মত।

'উজানের দিকে একটা উট চলার পথ আছে, গেছে জিবুতির দিকে,' বলল আব্বাস। 'পাড় হয়তো একটু খুঁড়তে হতে পারে, তবে আমার মনে হয় পার হতে পারব আমরা।'

‘তোমার ধারণা যেন সত্যি হয়, বৎস,’ বলল মাইকেল। ‘বাড়ি ফিরতে হলে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।’

দিনের বেলা খাদের গভীরে যে স্বচ্ছ পানির উপর চোখ বুলিয়েছে অ্যানি উইসপার, রাতে সেটা স্বপ্ন হয়ে ফিরে এল তার কাছে। পাহাড়ী ঝর্ণার ফেনাসমৃদ্ধ একটা দুর্বার প্রবাহের স্বপ্ন দেখল সে, জলপ্রপাত হয়ে লাফিয়ে পড়ছে পাহাড়ের কিনারা থেকে শ্যাওলা মোড়া বড়বড় পাথরের উপর, আরও নীচে জলজ আগাছা নিয়ে ঠাণ্ডা গভীর খুদে একটা লেক, লেকের চারধারে ঘন সবুজ বাঁশঝাড় আর নারকেল গাছ। তারপরই তার ঘুম ভেঙে গেল। অস্থির বোধ করল সে, বুঝতে পারছে ক্লান্ত; ঘামে ভিজে গেছে চুলের গোড়া, ঘাড় আর কপাল। আকাশে সবেমাত্র ভোরের প্রথম প্রতিশ্রুতি ডানা মেলছে।

মনে হলো সে-ই একমাত্র জেগে আছে। চাদর সরিয়ে সন্তর্পণে গাড়ির কাছে চলে এল অ্যানি, তোয়ালে আর টয়লেট ব্যাগটা নিল। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই ইস্পাতের উপর স্প্যানারের শব্দ হলো, ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল, চঞ্চলার এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা।

রানা তাকে দেখতে পাবার আগেই চুপিসারে কেটে পড়তে চাইল অ্যানি, কিন্তু হঠাৎ সিধে হলো ও। ‘কোথায় যাচ্ছ?’ গলার আওয়াজ মোটেও নরম নয়। ‘ভেবেছ জানি না? শোনো, অ্যানি, আমি চাই না ক্যাম্পের বাইরে একা একা তুমি ঘুরে বেড়াও।’

‘আমার নিরাপত্তার জন্যে তোমার উদ্বেগ সত্যি প্রশংসনীয়, জনাব মাসুদ রানা। কিন্তু ঘটনা হলো, নিজেকে আমার বড় নোংরা লাগছে। নদীতে যাচ্ছি জানো, কিন্তু জানো কি কেউ আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না?’

ইতস্তত করল রানা, তারপর বলল, 'তা হলে তোমার সাথে আমাকে যেতে হবে।'

'থ্যাঙ্কস, বাট নো থ্যাঙ্কস,' হেসে উঠে বলল অ্যানি। 'আফ্রিকায় এসেছি বটে, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তিগুলোয় অভ্যস্ত হওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। নদীতে আমি যাচ্ছি গোসল করতে, সেখানে তোমার উপস্থিতি আমার কাম্য নয়।' আবার একবার মৃদু শব্দে হাসল সে।

ইতিমধ্যে জেনেছে রানা, মেয়েটার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, দেখল নালার ঠোঁট থেকে খাড়া ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল সে, একেবারে অদৃশ্য হবার আগের মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল, দুষ্টামিভরা ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে, যার কোন অর্থ করতে পারল না রানা।

ঝুরঝুরে নরম মাটি, পায়ের ধাক্কায় নুড়ি পাথরগুলো গড়িয়ে পড়ছে নীচের দিকে, অস্থির ভাবটা দমন করে সাবধানে নামতে শুরু করল অ্যানি। খানিকটা নামবার পর সরু একটা পথ পেয়ে গেল সে, পানি খেতে আসা পশুদের আসা-যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। ঝুঁকি কমল, নিরাপদ একটা তির্যক কোণ সৃষ্টি করে নেমে গেছে পথটা, স্বস্তির সঙ্গে সেটা ধরে নামতে লাগল অ্যানি। নরম মাটিতে একটা গভীর পদচিহ্ন রয়েছে, পাঁচটা আঙুল নিয়ে পিরিচের চেয়েও বড় আকারের। চোখ নামিয়ে কোথায় পা ফেলছে তাকাল না অ্যানি, তবে তাকালেও কী দেখছে বুঝতে পারত কি না সন্দেহ। আয়নার মত চকচকে নালার পানি হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

খাদের নীচে নেমে অবাক হলো সে, শুকিয়ে এত ছোট হয়ে গেছে নদী যে বুকে স্রোত বলে কিছু নেই। নালার কোথাও পানি

খুব একটা গভীর নয়, এখানে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে আছে লম্বা সমতল পাথর। কাপড়চোপড় খুলে পানিতে নামল সে, কালকের রোদে গরম হওয়া পানি এখনও পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়নি। পায়ের তলায় সমতল পাথর, পিচ্ছিল লাগল। নালায় দাঁড়িয়ে দু'হাত ভরা পানি ঢালল মাথায় আর মুখে, তারপর গা থেকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করল ধুলো আর ঘাম।

একটু পর নালার কিনারায় ফিরে এল অ্যানি, টয়লেট ব্যাগ খুলে একটা বডি শ্যাম্পুর বোতল বের করল। আবার কোমর সমান পানিতে ফিরে এসে গায়ে শ্যাম্পু মাখল সে। শারীরিক একটা পুলকে বার বার শিউরে উঠল, আবার একটু ভয় ভয়ও করছে—এরকম খোলা জায়গায় কখনও গোসল করেনি সে। সারা শরীরে শ্যাম্পু মাখবার পর স্বচ্ছ পানিতে ডুব দিল অ্যানি। পানির উপর মাথা তুলল, আর ঠিক তখুনি তার মনে হলো, কেউ দেখছে তাকে।

ইতিমধ্যে ভোরের আলো ভালভাবেই ফুটেছে, অ্যানি আন্দাজ করল আবার রওনা হবার জন্য ক্যাম্পে ওরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। প্রথমে মাইকেলের কথাই ভাবল সে, পিছু নিয়ে এসে থাকতে পারে। কিন্তু ছেড়ে আসা নালার কিনারা বা প্রায় খাড়া ঢালে চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখতে পেল না সে।

তবু, সাবধান হওয়া দরকার। ঢালের দিকে পিছন ফিরে আবার ডুব দিল সে। পানির উপর মাথা তুলবার পর আবারও সেই একই সন্দেহ জাগল মনে, কেউ তাকে দেখছে। এবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল অ্যানি, নালার অপর পাড়টা ভাল করে দেখবার জন্য সমতল একটা পাথরে উঠে পড়ল, তলপেট আর বুক ঢাকল হাত দিয়ে।

নিষ্ঠুর সোনালি একজোড়া চোখ দেখছে তাকে, চোখের তারা

চকচকে কালো ফাটলের মত, স্থির অপলক দৃষ্টি।

লালচে-সোনালি পশুরাজ নালার উল্টোদিকের ঢালের মাঝামাঝি একটা সমতল পাথরের উপর বসে আছে। সামনের জোড়া পায়ের উপর চিবুক ঠেকিয়ে রেখেছে, বসে থাকবার ভঙ্গির মধ্যে অনড়-অটল ভাবটুকু রোমহর্ষক, যদিও দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যানি ওটাকে চিনতে পারেনি।

তারপর অত্যন্ত ধীরগতিতে খাড়া হলো কেশর, মাথাটাকে ঘিরে ফুলে উঠল, আকারে আরও বড় হয়ে উঠল সিংহটা। সেই সঙ্গে নড়ে উঠল লেজ, যেন একটা ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে ঢেউ তুলে সামনে-পিছনে আসা-যাওয়া করছে।

হঠাৎ চিনতে পেরে মাথাটা ঘুরে গেল অ্যানির, সেদিন রাতের গুরুগম্ভীর গর্জন আবার ফিরে এল তার কানে। আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ, আর্তনাদ করে উঠল সে।

চঞ্চলার ইগনিশন অ্যাডজাস্ট করছিল রানা, কাজটা শেষ করে হাতে লেগে থাকা গ্রিজ পরিষ্কার করবার জন্য অ্যামোনিয়ার বোতলটা মাত্র ধরেছে, এই সময় অ্যানির আর্তচিৎকার শুনতে পেল। সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ছুটল ও।

চিৎকারটা এত তীক্ষ্ণ আর ভয়ার্ত, অজানা আশংকায় রানার বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আবার আর্তনাদ শোনা গেল, কোথায় পড়ছে না দেখেই কিনারা থেকে লাফ দিল ও, ঢালে পড়ে পিছলে গেল পা, নরম মাটির উপর একটা ডিগবাজি খেয়ে সিধে হলো আবার, কোন বিরতি না নিয়ে সবেগে নেমে এল খাদের নীচে। প্রথম চিৎকারটা শুনবার পর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেরিয়েছে, নালার পাশে পাথুরে পাড়ে পৌঁছে গেল ও। পানির

কিনারা থেকে সামান্য দূরে, একটা সমতল পাথরের উপর নগ্ন দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যানি উইসপার, দুটো হাতই মুখের উপর চেপে ধরা। সরু, মেদহীন শরীরের উপর নিজের অজান্তেই চোখ বুলাল রানা। তলপেট এত সরু, রানার মনে হলো দু'হাতের আঙুল লম্বা করে ধরলে তালুর ভিতর চলে আসবে। কোমর থেকে নীচে ও উপরে ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে শরীরটা। সম্ভবত উন্মুক্ত বলেই অস্বাভাবিক লম্বা লাগছে পা দুটো।

'অ্যানি!' এত কাছে, তবু চিৎকার করে জানতে চাইল রানা, 'কী হয়েছে?'

ঝট্ করে রানার দিকে ঘুরল অ্যানি, লাফিয়ে ওঠায় আবার একবার রানার চোখ গিয়ে পড়ল জোড়া স্তনের উপর। জানে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, তবু চোখ ফেরানো সহজ হলো না। রানাকে চিনতে এক সেকেন্ড সময় নিল অ্যানি, পরমুহূর্তে ছোট একটা লাফ দিয়ে ছুটে এল সে, রানাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য সামনে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো। মুখে রক্ত নেই, সোনালি-সবুজ চোখে নগ্ন আতংক। 'রানা!' ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'ওহ্ গড, রানা!' এতক্ষণে রানার নজরে পড়ল নালার উল্টোদিকে কী একটা যেন নড়ছে।

ক্ষতটা শক্ত হয়ে গেছে রাতের মধ্যে, সিংহের পিছন দিকটা এখন প্রায় পঙ্গুই বলা চলে, ছিন্নভিন্ন নাড়িভুঁড়ি থেকে পাঁজরের খাঁচার ভিতর বেরিয়ে আসা দূষিত তরল পদার্থ সারা শরীরে বিষের মত ছড়িয়ে পড়েছে, শুরু হয়ে গেছে সংক্রমণ। মানুষের আকৃতি দেখামাত্র তার যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা তা হলো না—আক্রোশ আর রাগের ভাব কম, তারচেয়েও কম শক্তি-সামর্থ্য। তবু মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে শিকারীদের স্মৃতি ফিরে এল মনে, তারাই তো তার এই যন্ত্রণাকর অবস্থার জন্য দায়ী, আর সেই সঙ্গে ক্রোধে উন্মাদ

হয়ে গেল আহত পশুরাজ।

তারপরই আরও একটা ঘৃণিত দু'পেয়েকে দেখতে পেল সে। শরীরের দুর্বলতা আর আড়ষ্ট ভাব দূর করবার জন্য আর কিছুর দরকার করে না, চার পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, গরগর করে উঠল।

অ্যানির আলিঙ্গন এড়িয়ে গেল রানা, খপ্ করে তার একটা বাহু চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, ইচ্ছা তাকে ওর পিছন দিকে সরিয়ে দেওয়া। হোঁচট খেতে খেতে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল অ্যানি, রানার আচরণে অবাক হয়ে গেছে। তার পিঠে ধাক্কা দিল রানা, ঢালের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া সরু পথটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, 'দৌড়াও! দৌড়াতে থাকো!' অ্যানিকে ছেড়ে দিয়ে ঝট্ করে নালার দিকে ফিরল ও, দেখল অপর দিকের ঢাল বেয়ে এরইমধ্যে নালার কিনারায় নেমে এসেছে সিংহটা। যমদূতের মত ছুটে আসছে ওর দিকে।

এই প্রথম খেয়াল হলো রানার, অ্যামোনিয়ার বোতলটা এখনও ওর হাতে। অগভীর নালায় নেমে পড়েছে সিংহ, দু'পাশে পানি ছিটিয়ে তেড়ে আসছে ওর দিকে। আহত হলেও ওটার ছুটে আসবার ভঙ্গিতে কোন জড়তা নেই। এত কাছে এসে পড়েছে, বাঁকা উপরের ঠোঁটের গায়ে গোঁফ জোড়া পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, গলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা চাপা গরগর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ছুটে পালাবে না, ওটাকে আসতে দেবে। কারণ এখন ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছন দিকের বাতাসে হেলান দিল রানা, মাথার পাশে উঠে গেল বোতল ধরা হাতটা, গায়ের সমস্ত শক্তি

একত্রিত করে ছুঁড়ে দিল সেটা। নিরস্ত্র মানুষের শেষ চেষ্টা, জানে কাজ হবে না, তবু হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস।

সোজা ছুটে গিয়ে সিংহের মাথায় লাগল বোতল, ঠিক কপালের মাঝখানে। পাথরের উপর, অ্যানি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, লাফ দিয়ে সেখানটায় পড়ছে ওটা, এই সময় বোতলটা লাগল। বিস্ফোরিত হলো বোতল, কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল মাথার চারপাশে, কটুগন্ধ তরল অ্যামোনিয়ায় ঢাকা পড়ে গেল দুই চোখ আর নাক, হাঁ করা মুখের ভিতরও ঢুকল খানিকটা। ঘ্রাণশক্তি হারাল সিংহ, চোখ আর গলার ভিতরটা এমন জ্বালা করে উঠল যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে ছাল তুলে নিয়েছে কেউ। গর্জে উঠল পশুরাজ, তার গোটা অস্তিত্ব প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়েছে। পাথরটাকে নাগালের মধ্যে পেল না, ভারি বস্তার মত ঝপাৎ করে অগভীর পানিতে পড়ল, ডুবে থাকা পাথরে পিঠ দিয়ে ছটফট করতে লাগল।

গড়াতে গড়াতে আরও কম পানিতে সরে এল সিংহ। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল দু'বার, পারল না। তবে তৃতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলো। ছুটল রানা, থামল, ঝুঁকে তুলে নিল ফুটবল আকারের ভারি একটা পাথর। নালার কিনারায় দাঁড়িয়ে পাথরটা ছুঁড়বার জন্য মাথার উপর তুলেছে, দেখল অন্ধ সিংহ সরাসরি ওর দিকে লাফ দিতে যাচ্ছে।

ভয়ে শিউরে উঠল রানা। দু'হাতে ধরা পাথরটা সজোরে ছুঁড়ে দিল উপর থেকে। কামানের গোলার মত ছুটে গেল সেটা, পাথর আর সিংহ শূন্যে থাকতেই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো। সিংহের ঘাড় আর শিরদাঁড়া যেখানে এক হয়েছে, ঠিক সেখানটায় চুরমার হয়ে গেল হাড়। গতি রুদ্ধ হলো, ধপাস করে নালার কিনারায়

পড়ে গেল পশুরাজ, কাত হলো ধীরে ধীরে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, যতটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বেশি ভয়ে হাঁপাচ্ছে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে আঙুলের ডগা দিয়ে ওটার ম্লান চোখের পাতা সরাল। তরল গ্যাস এরইমধ্যে চোখের তারা বিবর্ণ করে তুলেছে, রানার স্পর্শেও সেটা নড়ল না। মারা গেছে সিংহ।

ঘুরল রানা, দেখল ওর নির্দেশ অমান্য করে সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি, নগ্ন আর অসহায়। মায়া লাগল রানার, ছুটে এল তার পাশে।

চেহারায় কার প্রতি যেন অকারণ অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে—ঈশ্বর, রানাকে বাঁচাও, রানাকে বাঁচাও! হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে।

রানা জানে, এই আলিঙ্গনের উৎস প্রেম নয়, আতংক। তবু হার্টবিট স্বাভাবিক হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল, নিরেট একটা সুবিধে অর্জন করেছে ও। তুমি যদি কোন মেয়ের প্রাণ বাঁচাও, সে তোমাকে সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য, অন্তত যুক্তি তাই বলে। আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। সমস্ত ভয় নিঃশেষে মুছে গেল মন থেকে, ভুলে গেল সিংহের কথা। ভাবল, এই সুবিধে সে নেবে না। কিন্তু বডি শ্যাম্পুর মিষ্টি গন্ধ পেল ও। কোমল নারীদেহের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ দেহ-মনে পুলক জাগিয়ে তুলল। অ্যানি তাকে এখনও গায়ের জোরে চেপে ধরে রেখেছে। তাকে একটু দূরে সরাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না।

'ওহ্, রানা!' ভাঙা গলায় ফিসফিস করল অ্যানি, আর তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর রানাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল এই মুহূর্তে অ্যানি

ওর। অ্যানি চাইছে এখানে, এই মুহূর্তে, নিজের অধিকার আদায় করে নিক রানা।

এখানে, এই খোলা নদীর ধারে? সদ্য নিহত সিংহের পাশে? কেন নয়, কেন নয়, রানা? নিজের সঙ্গে তর্ক করছে ও। এই সময় অনুভব করল, ওকে সাহায্য করবার জন্য ওর বুক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে অ্যানি।

দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল। মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল রানার। দুটো মুখ পরস্পরের দিকে এগোল। অ্যানি মুখ তুলল, রানা নামাল। ওরা চুমো খাবে, ঠিক এই সময় বাধা।

'নীচে তোমরা করছটা কী শুনি? কী হচ্ছে ওখানে?' খাদের মাথা থেকে হাঁক ছাড়ল মাইকেল, দাঁড়িয়ে রয়েছে একেবারে ঢালের কিনারায়, হাতের ভাঁজে লী এনফিল্ড বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল। তার ভাব দেখে মনে হলো, ঢাল বেয়ে নামতে যাচ্ছে।

অ্যানিকে ধরে ঘোরাল রানা, নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করল নগ্ন দেহটাকে, তারপর গা থেকে খুলে পরিয়ে দিল লেদার জ্যাকেটটা। অ্যানির ঊরুর মাত্র অর্ধেকটা ঢাকা পড়ল, আর বগলের কাছে ফুলে থাকল বেঢপ আকৃতি নিয়ে। এখনও সে একটু একটু কাঁপছে, যেন ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে একটা অসহায় শিশু। নিঃশ্বাস ফেলছে ভাঙা ভাঙা।

'আর শুনে কী হবে?' ঢালের মাথায় দাঁড়ানো মাইকেলের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল রানা। 'যখন দরকার ছিল তখন সুযোগ হারিয়েছ, এখন আর তোমাকে দরকার নেই।' পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বের করে অ্যানির দিকে বাড়িয়ে দিল ও। আড়ষ্ট, কাঁপা কাঁপা হাসির সঙ্গে সেটা নিল অ্যানি। 'চোখ মুছে নাও,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে দুনিয়াসুদ্ধ সবাই ছুটে আসবে এখন, তার আগে প্যান্টটা পরে

নাও। নইলে…হাঃ হাঃ হা!’

এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হলো যে কয়েক মিনিট কথাই বলতে পারল না আব্বাস খায়ের। কারও সাহায্য না নিয়ে একা কোন হিংস্র পশুকে বধ করা ইথিওপিয়ায় অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার, গোত্রের লোকেরা রাতারাতি শিকারীর অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠবে। আর পূর্ণ-বয়স্ক একটা পুরুষ সিংহকে খালি হাতে মেরে ফেলা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপ্রত্যাশিত, কেউ যদি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। বীরশ্রেষ্ঠ শিকারী তখন বীরত্বের প্রতীকচিহ্ন হিসাবে নিহত সিংহের কেশর পরিধান করতে পারে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই তাকে শ্রদ্ধা জানায়। যে শিকারী বন্দুক ছুঁড়ে সিংহ মারে সে শ্রদ্ধার পাত্র, যে বর্শা দিয়ে মারে তার সম্মান আরও বেশি—কিন্তু একটা মাত্র পাথর আর এক বোতল অ্যামোনিয়া দিয়ে সিংহ মারা যায় এ-কথা জীবনে এই প্রথম শুনল আব্বাস।

ছালটা নিজের হাতে ছাড়াল সে। কাজটা শেষ করবার আগেই মাথার উপর বৃত্ত রচনা করে চক্কর দিতে শুরু করল কালো তীরচিহ্নের মত শকুনের দল। লাশটা নদীর পাড়ে ফেলে এল সে, ভিজে চামড়াটা নিয়ে উঠে এল খাদের উপর, ইতিমধ্যে আবার রওনা হবার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছে রানা।

চামড়ার ব্যাপারে রানার কোন আগ্রহ নেই শুনে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো আব্বাস। ‘মাসুদ ভাই, কী বলছেন আপনি! এটা সাথে থাকলে আমার গোত্রের লোকেরা আপনার পুজো করবে! যেখানেই যাবেন, লোকজন আপনার দিকে আঙুল তুলে পরস্পরকে দেখাবে।’

‘খুব ভাল কথা। অসুবিধে একটাই—কেউ পুজো-টুজো করতে চাইছে বুঝতে পারলে নিজের ওপর ঘৃণার পরিমাণটা বেড়ে যায়। যাক, সে তুমি বুঝবে না। এবার তৈরি হও...।’

‘কেশর দিয়ে আমি আপনার জন্যে একটা পাগড়ি বানিয়ে দেব, মাথায় জড়িয়ে রাখবেন...,’ চামড়াটা চঞ্চলার উপর নামিয়ে রাখল সে। ‘আপনাকে যা সুন্দর লাগবে না!’

‘পাগড়ি? মাথায় পরবে?’ শুকনো গলায় বলল মাইকেল। ‘তা পরতে পারে, কিন্তু তাতে শুধু ওর চুলের এখনকার স্টাইল একটু উন্নত হবে, তার বেশি কিছু না। স্বীকার করছি, কেশরটার রঙ ভারি চমৎকার, আরও স্বীকার করছি, রানা ছেলে হিসেবে দারুণ—কিন্তু ওর কথার প্রতিধ্বনি তুলে আমিও বলতে চাই, অনেক হয়েছে, এবার তৈরি হয়ে নাও, কারণ তোমরা যা শুরু করেছ তাতে যে-কোন মুহূর্তে আমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।’

যে-যার গাড়ির দিকে এগোল ওরা, লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত রানার পাশে চলে এল আব্বাস। তামার জ্যাকেট পরানো বুলেটটা রানাকে দেখাল সে, চ্যাপ্টা হয়ে আছে। ফিসফিস করে বলল, লাশটার ভিতর থেকে পেয়েছে সে।

বুলেটটা হাতের তালুতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ভাল করে পরীক্ষা করল। ‘নাইন মিলিমিটার কিংবা নাইন পয়েন্ট থ্রি,’ মৃদু কণ্ঠে বলল ও। ‘স্পোর্টিং ক্যালিবার—মিলিটারি নয়।’

‘ইথিওপিয়ার এদিকে এমন কোন রাইফেল আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না যা দিয়ে এই বুলেট ছোঁড়া যেতে পারে।’ আব্বাস খায়ের গম্ভীর, তার চোখে উদ্বেগ। ‘রাইফেলটা অবশ্যই কোন বিদেশীর।’

‘এখুনি ঢাক-ঢোল পেটাবার দরকার নেই,’ বলে বুলেটটা

আব্বাসকে ফিরিয়ে দিল রানা। ‘তবে কথাটা আমরা মনে রাখব।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলেই যাচ্ছিল আব্বাস, হঠাৎ রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে টানল ওকে, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আলিঙ্গন করল। ‘মাসুদ ভাই,’ পিছিয়ে গিয়ে বলল সে, ‘হোক আহত, তবু প্রায় খালিহাতে একটা সিংহকে মেরে ফেলা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আজ আপনার এই বীরত্ব দেখে আমার সাহস কী পরিমাণে বেড়ে গেছে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আজ আমি শিখলাম সাহস করে রুখে দাঁড়ালে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এতদিন আমরা শুধু শিফটাদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি, আমাদের এবার রুখে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে…।’

আব্বাসের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে হাসল রানা, ছেলেটার ভাবাবেগ ও উপলব্ধি ওর মনে দোলা দিয়ে গেল। ‘বেঁচে থাকার জন্যেই সাহস দরকার, আব্বাস। তুমি ঠিকই বুঝেছ। শোনো, দ্বিতীয় সিংহটা এলে তাকে বলব, দাঁড়াও, আব্বাসকে খবর দিই—কেমন?’

দশ

বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তরের চারদিক ঘাসে ঢাকা। অ্যাওয়াস নদীর আঁকাবাঁকা পাড় ধরে এগোল ওরা। দূর দিগন্তে অসমান রেখাগুলো পাহাড়, প্রতি ঘণ্টায় দূরত্ব কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গায়ে উঁচু হতে শুরু করল ওগুলো, ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাথরের দীর্ঘ পাঁচিল আর ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা গভীর খাদগুলো অস্পষ্টভাবে চেনা গেল।

নদীর পাড় ঘেঁষা এই পথ হাজার বছর ধরে মরুবাসীরা ব্যবহার করে আসছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে একা এই পথে কেউ কোন কালে আসেনি–ব্যবসা, যুদ্ধ বা দেশত্যাগের উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু কাফেলার সঙ্গে আসা-যাওয়া করেছে। হঠাৎ করে সামনের পথে একটা ছেদচিহ্ন দেখতে পেল ওরা, নদীর খাড়া পাড় খানিকটা সমতল হয়ে রয়েছে ওখানটায়, ঢালও তত খাড়াভাবে নেমে যায়নি। ঢালের গায়ে অসংখ্য সরু পথ দেখল ওরা, বোঝাবাহী পশুদের এই সব পথ দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রতিটি পথ লাল মাটির গভীর নালার মত, বড় বড় পাথর আর পাথরের পাঁচিলগুলোকে এড়িয়ে এঁকেবেঁকে নেমে গেছে নদীর দিকে।

পাড় আরও সমতল করা দরকার, খালি গায়ে তিনজনই ওরা কাজে নেমে পড়ল। দেখতে দেখতে মিহি ধুলো লেগে লাল হয়ে উঠল ওদের চুল আর গা। পথগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে চওড়াটা বেছে নিল রানা, সেটাকে আরও চওড়া করবার জন্য গাধার খাটুনি খাটতে হলো। পথের মাঝখানে কোথাও গর্ত রয়েছে, আবার কোথাও ফুলে আছে মাটি, সেগুলো সমান করতে হলো। পথ চওড়া করতে গিয়ে কিছু বড় পাথর সরাল ওরা, ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিল নদীতে। সন্ধ্যার সময় কাজ বন্ধ করল ওরা, সবাই এত ক্লান্ত যে কথা বলবারও শক্তি নেই। রাতে ওরা ঘুমাল মড়ার মত।

ভোর অন্ধকারে আবার ওদেরকে কাজে ফিরিয়ে আনল রানা। আরও প্রায় দু'ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ধারণা করা হলো, এবার বোধহয় গাড়িগুলো নিয়ে নীচে নামা যাবে। প্রথম গাড়িটায় মাইকেল থাকবে, টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, সারা গায়ে লাল ধুলো নিয়ে ভান করছে কায়িক পরিশ্রমে তার মর্যাদা বা ফুলবাবু

ভাবটুকু মোটেও ক্ষুণ্ন হয়নি। রানার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসল সে, নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার করে বলল, 'দুর্ঘটনায় আমি মারা গেলে আমার ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তির মালিক তোমরা,' বলে চট্ করে একবার অ্যানির দিকে তাকাল সে, পরমুহূর্তে ইস্পাতের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাড়ে উঠে গেল আর্মারড কার, কিনারা থেকে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করবে এবার। সাধ্যমত চওড়া করা হয়েছে পথটা, কিন্তু ঢালু ভাব কমিয়ে যথেষ্ট লেভেল করা যায়নি, দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। সেজন্য অবশ্য সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়েছে। মাইকেলের গাড়ি যদি হুমড়ি খেয়ে বা ডিগবাজি খেয়ে পড়তে শুরু করে, ওটাকে টেনে রাখবে চঞ্চলার সঙ্গে বাঁধা মোটা একাধিক রশি। তবে না, কোন অঘটন না ঘটিয়েই ঢাল বেয়ে নেমে গেল মাইকেল।

নদীর উপরের ঢাল বেয়ে ওঠা তেমন কঠিন হলো না, যদিও সময় লাগল প্রচুর। ওদিকের ঢাল যথেষ্ট চওড়া, তেমন খাড়াও নয়। লাইন ব্যবহার করল রানা, একটা গাড়ি আরেকটাকে টেনে তুলে নিল। রোদে পোড়া ইথিওপিয়ার শক্ত মাটিতে যখন পা রাখল ওরা, বিকেল প্রায় শেষ হতে চলেছে। নিতম্বিনীর ফেলা ছায়ায় বসে হাঁপাতে লাগল তিনজনই, ব্যস্তভাবে ওদেরকে মগভর্তি গরম চা পরিবেশন করল অ্যানি।

গরম চা খেয়ে জিভ পুড়ে গেল আব্বাসের। 'সামনে আর কোন বাধা নেই,' বলল সে। 'ওয়েলস অভ চাল্ডি অর্থাৎ কুয়া পর্যন্ত খোলা মাঠ।' হঠাৎ তিনজনের দিকে পালা করে তাকাল সে, ক্লান্ত চেহারায় উজ্জ্বল হাসি ফুটল। 'ওয়েলকাম টু ইথিওপিয়া!'

'সত্যি কথা বলতে কি, ওল্ড বয়, তোমার এই রোদ আর

বালির বদলে প্যারিসের একটা পানশালাই আমি বেশি পছন্দ করব,’ বলল মাইকেল, মিটিমিটি হাসল। ‘আমার দুধ-সাদা অভিজাত হাতে চকলেট সালে সোনাভর্তি ঝোলাটা ধরিয়ে দিক, পরমুহূর্তে সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে তোমরা।’

আচমকা দাঁড়াল রানা, কপালে হাত রেখে দূরে তাকাল। তাপ-তরঙ্গের ভিতর দূরের মাটি তরল পদার্থের মত টলটল করছে। ছুটল ও, চঞ্চলার কাছে পৌঁছে থামল, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল টারিটে। আবার যখন নেমে এল, হাতে একটা বিনকিউলার রয়েছে। সবাই ঘিরে দাঁড়াল ওকে, দূরে কী যেন দেখবার চেষ্টা করছে ও।

‘ঘোড়সওয়ার!’ বলল রানা।

‘ক’জন?’ দ্রুত জানতে চাইল মাইকেল, মারমুখো চেহারা।

‘মাত্র একজন। এদিকেই আসছে।’

ছুটে গিয়ে লী এনফিল্ড রাইফেলটা তুলে নিল মাইকেল, ব্রিচে কার্ট্রিজ ভরল।

খালি চোখে এতক্ষণে ওরা তাকে দেখতে পেল, তাপ-তরঙ্গের ভিতর লম্বা পতাকার মত কাঁপছে, ঘোড়া আর তার সওয়ার যেন মাটি স্পর্শ না করে উড়ে আসছে ওদের দিকে। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল, ঢাল বেয়ে আবার উঠবার পর আগের চেয়ে অনেক বড় হলো আকার-আকৃতি, ছুটন্ত ঘোড়ার পিছনে অলসগতি মেঘের মত ধুলো ভাসছে। আরও অনেক কাছে চলে আসবার পর ঘোড়সওয়ারের শুধু কাঠামোটা চেনা গেল।

তালুতে সশব্দে চুমো খেয়ে হাতটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল আব্বাস খায়ের, তীক্ষ্ণ একটা উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এল গলা চিরে, রোদে বেরিয়ে এসে ছুটল আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করল ঘোড়সওয়ার,

দক্ষতার সঙ্গে অকস্মাৎ বিশাল সাদা স্ট্যালিয়নের লাগাম টেনে ধরল সে, সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হলো ঘোড়া। ঘোড়সওয়ারের সাদা আলখেল্লা ফুলে উঠল তীব্র বাতাসে, ঘোড়া থেকে উড়াল দেওয়ার ভঙ্গিতে শূন্যে লাফিয়ে পড়ল, নামল আব্বাস খায়েরের প্রসারিত দুই বাহুর মাঝখানে।

দুটো মূর্তি পরমানন্দে জোড়া লেগে থাকল, দীর্ঘদেহী আব্বাসের আলিঙ্গনের ভিতর আগন্তুককে হঠাৎ করে ছোট আর ভঙ্গুর লাগল, ওদের হাসি আর অভ্যর্থনা তীক্ষ্ণকণ্ঠ পাখির মত।

পরস্পরের হাত ধরে, একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে গাড়ির পাশে অপেক্ষারত দলটার দিকে এগিয়ে এল ওরা।

'ঈশ্বরপুত্র যীশু আর মাতা মেরীর কিরে,' কসম খেয়ে বলল মাইকেল, 'আরেকটা মেয়ে!' তার চোখে আনন্দ আর বিস্ময়ের ঢল নেমেছে, হাতের রাইফেল তাড়াতাড়ি একপাশে রেখে দিল।

সবাই ওরা একহারা গড়নের সুশ্রী শ্যামলা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আব্বাসের বয়স যদি আঠারো হয়, তার বয়স সতেরো কিংবা উনিশ হওয়া সম্ভব। সাদার উপর কালো মণি ছটফট করছে, হাসি আর কৌতুকের একজোড়া প্রাণবন্ত উৎস। যার চোখ আছে সে-ই এক পলকে বুঝে নেবে জন্মের পর থেকে শুধু হাসছে আর হাসছে মেয়েটা, লম্বা পাতার ভিতর বড় বড় চোখে রাজ্যের দুষ্টামি। গায়ের চামড়া চকচকে সিল্ক, নাকটা প্রায় খাড়া, জড়তাহীন হাঁটবার ভঙ্গিতে অপূর্ব একটা ছন্দ ফুটে ওঠে।

'বানুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি?' আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞেস করল আব্বাস। 'ও আমার কাজিন, আমার কাকার বড় মেয়ে, এবং কোন সন্দেহ নেই, গোটা ইথিওপিয়ায় ও-ই সবচেয়ে সুন্দরী—রাহেলা বানু।'

‘কী বলছ বুঝতে পারছি,’ বলল মাইকেল। ‘ইথিওপিয়ার একটা দুর্লভ পাখি। সত্যি অত্যন্ত ভাগ্যবান আমরা।’

সবার নাম উচ্চারণ করে পরিচয় জানাল আব্বাস, প্রত্যেকের চোখে সরাসরি তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল বানু, প্রাচীন মিশরীয় রাজকুমারীর মত অভিজাত লম্বাটে চেহারায় শান্ত সমাহিত ভাবটুকু ওদের দৃষ্টি কাড়ল। তার হাবভাব আর কথা বলবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো ওরা যেন তার কতদিনের পরিচিত। ‘আমি জানতাম, ঠিক এখানটায় তোমরা অ্যাওয়াস পেরোবে, এটাই তো একমাত্র জায়গা–তাই দেখা করার জন্যে চলে এলাম।’

‘ওর ইংরেজি শুনে অবাক হচ্ছেন?’ সগর্বে বলল আব্বাস। ‘কৃতিত্বটা আমার দাদুর, তাঁর পরিবারের সবাইকে তিনি ইংরেজি শিখতে বাধ্য করেছেন। বানুর কথা অবশ্য একটু আলাদা। আমরা সমবয়েসী হলেও, দু’বছর আগেই লন্ডন থেকে বেড়িয়ে এসেছে ও।’

‘বাহ্,’ প্রশংসা করল অ্যানি উইসপার, ‘তোমার ইংরেজি উচ্চারণ তো দারুণ ভাল।’

‘আদ্দিস আবাবার মিশনারি স্কুলে পড়েছি,’ এগিয়ে এসে অ্যানির হাত ধরে তার পাশে দাঁড়াল বানু, যেন এতক্ষণে সে তার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেল। ‘ওখানকার সিস্টাররা আমাকে শিখিয়েছে।’ ঘাড় ঘুরিয়ে নানাভাবে অ্যানিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল সে, যেন প্রিয় কোন উপহার নেড়েচেড়ে দেখছে, কোনরকম রাখ-ঢাক না করে খোলাখুলি বলল, ‘তুমি ভাই সাংঘাতিক সুন্দরী, মাথায় এত সোনা নিয়ে ঘুমোও কী করে? ওমা, তোমার চোখ দুটোও দেখছি অলংকার!’

এ-ধরনের অকপট প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত নয় অ্যানি, পুরুষদের চোখের সামনে বেচারি লজ্জায় পড়ে গেল। অস্বস্তি দূর করবার

জন্য হাসল বটে, কিন্তু তার চেহারা সামান্য লালচে হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে রাহেলা বানুর চঞ্চল দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে আর্মারড কারগুলো। 'ওগুলোও ভারি সুন্দর। সবাই জানে আসছে, কাজেই কারও মুখে অন্য কোন কথা নেই।' কোমরের ফিতে খুলে ঢোলা আলখেল্লাটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলল সে, আব্বাসের হাতে ধরিয়ে দিল। তার পরনে এখন স্কার্ট আর খাটো ব্লাউজ। প্রাণচঞ্চল কিশোরের মত গাড়িগুলোর দিকে ছুটে গেল সে, নিতম্বিনীর গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল। 'আর কোন চিন্তা নেই, এগুলো পাওয়ায় এখন আমরা শিফটাদের এক হাত দেখে নেব। আমাদের গোত্রে বীরের কোন অভাব নেই, অভাব ছিল অস্ত্র আর ওঅর মেশিনের।' পালা করে মাইকেল আর রানার দিকে মনোযোগ দিল সে। 'আমার গোত্রের তরফ থেকে আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এই উপকারের কথা আমরা কখনও ভুলব না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে...'

'বাদ দাও, মাই ডিয়ার গার্ল,' বিড়বিড় করে বলল মাইকেল। 'গোটা ব্যাপারটাই আনন্দময় অভিজ্ঞতা। যদি জানতাম তুমি এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছ, বিলিভ মি, স্রেফ উড়ে চলে আসতাম।' তার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, তার বাবা কি মনে করে নগদ টাকা সঙ্গে করে এনেছে? লোভী বা নির্লজ্জের মত শোনাবে ভেবে প্রশ্নটা করল না সে। 'তোমার গোত্রের লোকজন কি আমাদের জন্যে কুয়ার কাছে অপেক্ষা করছে?'

'বাবার সাথে আমার সব কাকা আর দাদুও এসেছেন–ওদের সাথে কয়েকশো রাসটা আর হারাবি আছে। মেয়ে-বউ আর পশুদেরও নিয়ে এসেছে তারা।'

'লে বাবা,' হেসে ফেলল রানা। 'এ-ধরনের রিসেপশন

কমিটির কথা জীবনে শুনিনি।'

অভিযানের শেষ রাতটায় একটা কাঁটাগাছের প্রসারিত ডালের নীচে ক্যাম্প ফেলল ওরা, অ্যাওয়াস নদীর কিনারায়। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করল সবাই, আগুনটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসল। দুর্গ প্রাচীরের মত ওদেরকে ঘিরে থাকল চারটে আর্মারড কার। গভীর রাতে থামল গল্প, শান্ত নিস্তব্ধতা নেমে এল আগুনের ধারে, নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল অ্যানি উইসপার। 'একটু হাঁটাহাঁটি করে শুতে যাব আমি।'

তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল বানুও। 'আমিও তোমার সাথে হাঁটব।' এরইমধ্যে রীতিমত ভক্ত হয়ে উঠেছে সে অ্যানির। 'ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার নিরপেক্ষ বন্ধু।'

ক্যাম্পের বাইরে এসে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা, মাথার উপর আকাশ ভর্তি তারা জ্বলজ্বল করছে। আলতোভাবে অ্যানির কব্জি ধরে মৃদু চাপ দিল বানু।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

অ্যানির দিকে গম্ভীর মুখে তাকাল বানু, তারার আলোয় ঝিক্ করে উঠল তার চোখের মণি। 'ওরা দু'জনেই তোমাকে মারাত্মকভাবে কামনা করে–রানা আর মাইকেল।'

আড়ষ্ট কণ্ঠে হেসে উঠল অ্যানি, বানুর সরাসরি কথা বলবার ধরন দ্বিতীয় বার তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল। 'কী যা-তা বলছ!'

'যা-তা নয়, খাঁটি সত্যি কথা। যখনই তুমি ওদের কাছাকাছি হও একজোড়া কুকুরের মত হয়ে যায় ওরা–আড়ষ্ট পিঠ বাঁকা করে পরস্পরকে ঘিরে ঘুরতে থাকে, যেন পরস্পরের লেজ শুঁকতে চাইছে।' চাপা গলায় খিকখিক করে হেসে উঠল বানু, তার সঙ্গে অ্যানিকেও হাসতে হলো।

‘না, মানে, ব্যাপারটাকে এভাবে না দেখে...,’ শুরু করল অ্যানি, কিন্তু বাধা দিল বানু।

‘দু’জনের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ, অ্যানি?’ সিরিয়াস হয়ে জানতে চাইল সে।

‘গড, পছন্দ করতেই হবে এমন কোন কথা আছে?’ অ্যানির মুখে এখনও হাসি।

‘না, বাছ-বিচার না করলেও পারো,’ তাকে আশ্বস্ত করল বানু। ‘ইচ্ছে হলে দু’জনের সাথেই তুমি চালিয়ে যেতে পারো। আমি হলে তাই চালাতাম।’

‘চালিয়ে যেতে পারি...মানে?’

‘মানে প্রেম! এই সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে নাকি! আর শোনো, না বোঝার ভান কোরো না। ভান জিনিসটা আমি একদম সইতে পারি না।’

হাসি গোপন করে অ্যানি জানতে চাইল, ‘তুমি হলে তাই করতে? দু’জনের সাথেই চালিয়ে যেতে?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। তা না হলে, তুমিই বলো, কাকে তুমি বেশি পছন্দ করো সেটা বোঝার উপায় কী?’

‘তা সত্যি।’ হাসি চেপে রাখায় দম বন্ধ হয়ে এল অ্যানির, তবে বানুর অদ্ভুত যুক্তি রীতিমত নাড়া দিয়েছে তাকে। ধারণাটার মধ্যে নগ্ন সত্য আর প্রচুর আবেদন রয়েছে, অস্বীকার করা যায় কি?

‘আব্বাসকে বিয়ে করার আগে বিশজনের সাথে প্রেম করব আমি। শুধু এভাবেই জানা সম্ভব কোন কিছু থেকে নিজেকে আমি বঞ্চিত করিনি, বুড়ো বয়সে সেজন্যে আপসোস করতে হবে না,’ ঘোষণার সুরে জানাল বানু।

‘বিশজন কেন, বানু?’ অ্যানিও বানুর মত গলার সুরে গুরুত্ব আর গাম্ভীর্য ফোটানোর চেষ্টা করল। ‘তেইশ বা ছাব্বিশ জন নয় কেন?’

‘ধ্যেৎ, কী যে বলো না!’ সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কার করল বানু। ‘লোকে তা হলে আমাকে খারাপ মেয়ে বলবে যে!’ এরপর আর হাসি চেপে রাখা অ্যানির পক্ষে সম্ভব হলো না।

‘কিন্তু তুমি...,’ বর্তমানের জরুরী সমস্যায় ফিরে এল বানু, ‘কাকে আগে পরীক্ষা করার কথা ভাবছ?’

‘তুমিই না হয় আমার হয়ে একজনকে বাছো,’ আমন্ত্রণ জানাল অ্যানি।

‘কাজটা কঠিন,’ স্বীকার করল বানু। ‘একজন ভাব দেখায় সে অতি সাধারণ, তারমানে তার হৃদয়টা বিশাল। অপরজন ভাব দেখায় সে অভিজাত, তারমানে তার রয়েছে দক্ষতা আর শক্তি।’ মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ‘না, সত্যিই ভারি কঠিন। উঁহুঁ, না ভাই, এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি শুধু কামনা করতে পারি, তুমি সুখী হও।’

যতটুকু বুঝতে পারল, আলোচনাটা তারচেয়ে বেশি নাড়া দিয়ে গেছে অ্যানিকে। সারাটা দিন পথে থাকায় চরম ক্লান্ত হলেও, ঘুমাতে পারল না সে। পাথরের মত শক্ত মাটিতে একটা মাত্র চাদর বিছিয়ে শুয়েছে, শুধু এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকল–নিষিদ্ধ, চিন্তারও অতীত ধারণাটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারছে না। সমস্যাটা আগেও ছিল, বানু সেটাকে তার মনের গহীন গহ্বর থেকে তুলে এনে দেখিয়ে দিয়েছে শুধু। সত্যিই তো, জীবনসঙ্গী বাছবার আর কী উপায় আছে? পশ্চিমা জগতে মেয়েদের প্রায় অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের অনেককেই সারা জীবন ভুগতে হয়। কেউ কেউ ডিভোর্স করে ভুল সংশোধনের

চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ডিভোর্সের পরিণতিই বা ক'জনের জন্য সুখকর হয়? খুব ভাল হত যদি প্রথমবার বাছাই করবার সময় যাচাই করে নেওয়া যেত। আর যাচাই করতে হলে সম্ভাব্য সবরকমভাবে একাধিক পুরুষকে পরীক্ষা করা দরকার। হঠাৎ অ্যানির চিন্তায় বাধা পড়ল।

আস্তে আস্তে গা থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসল রাহেলা বানু। সাবধানে দাঁড়াল, তার ধারণা কেউ জেগে নেই। মাইকেলের দিকে এগিয়ে গেল সে। আবছা অন্ধকারে বিস্ফারিত হয়ে উঠল অ্যানির চোখ। ওখানে কে শুয়ে আছে, মাইকেল নাকি রানা?

ঘুমন্ত লোকটাকে টপকাল বানু, নিঃশব্দ পায়ে আব্বাসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসল সে, আব্বাসের বুকে হাত রেখে মৃদু ধাক্কা দিল। বোধহয় অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে আব্বাস, একবার ধাক্কা খেয়েই উঠে বসল সে। অ্যানি দেখল, কোমরে স্কার্ট থাকলেও বানুর গায়ে ব্লাউজ নেই, শুধু ব্রেসিয়ার পরে রয়েছে সে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল দু'জন। আকাশে সদ্য ওঠা চাঁদের আলোয় নগ্ন নারীমূর্তির মত আকর্ষণীয় লাগল বানুকে। তার কাঁধে একটা হাত রাখল আব্বাস, দু'জন বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প থেকে।

ওদেরকে এভাবে যেতে দেখে আরও অস্থির হয়ে উঠল অ্যানির মন। রাতের মরুতে অচেনা কতরকম শব্দ, কান পেতে শুনতে লাগল সে। একবার মনে হলো মানুষের নরম গলা শুনছে, কে যেন ফুঁপিয়ে উঠল কোথাও। তবে দূর থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাকও হতে পারে। ওরা দু'জন ফিরে আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল অ্যানি উইসপার।

জেনারেল ফাদের জরুরী তলব পেয়ে আসমারায় ফিরে এল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক। ওদের বৈঠকে তৃতীয় একটা পক্ষ উপস্থিত থাকল–মি. এক্স। কথা যা বলবার জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সই বলল, সম্মতি জানিয়ে বারবার শুধু মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট।

ওয়েলস অভ চান্ডিতে পৌঁছুতে থার্ড ব্যাটালিয়ান অস্বাভাবিক দেরি করছে। মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট–হ্যাঁ, দুঃখিত। 'জোর গুজব ছড়িয়েছে, ওয়েলস অভ চান্ডি রক্ষার জন্য প্রতিপক্ষরা অস্ত্র আর লোকবল একত্রিত করছে। রিপোর্ট করা হয়েছে, আপনার শিফটা সৈনিকরা যাবার পথে একাধিক গ্রাম লুঠ করেছে।

'যদি করেও থাকে,' কাউন্ট বলল, 'মিছিলের লেজে যারা ছিল তারাই দায়ী।'

সিদ্ধান্ত দিল মি. এক্স। আপাতত বিশজন ভাড়াটে সৈনিক যোগাড় করা গেছে, পঞ্চাশজন শিফটাকে বাদ দিয়ে তাদেরকে থার্ড ব্যাটালিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বিনা প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত মেনে নিল কাউন্ট ডিকানডিয়া। তার কী, ওদেরকে সামলানোর দায়িত্ব তো মেজর লুইগি রাকার উপর। 'জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী,' জেনারেল ফাদকে আশ্বাস দিল সে, রোলস-রয়েসে চড়ে আসমারা ত্যাগ করল।

ইথিওপিয়ার বিশাল পার্বত্য এলাকা জুড়ে প্রতি বছর তুমুল বৃষ্টিপাত হয়, সেই পাহাড়ী ঢল লক্ষ লক্ষ জলপ্রপাত আর নালা বেয়ে নেমে আসে উপত্যকা আর নিম্নভূমিতে। মাটির উপর পানির এই প্রবাহ বেশিরভাগটাই অবশেষে সাড জলাভূমির নিষ্কাশন ধারার সঙ্গে মিশে যায়, সেখান থেকে গিয়ে পড়ে নীল নদে, তারপর উত্তরে এগিয়ে মিশর হয়ে বিলীন হয়ে যায় ভূমধ্যসাগরে।

সামান্য কিছু পানি পথ ভুলে চোরা বা একমুখো নদীতে গিয়ে

পড়ে, তারই একটা হলো অ্যাওয়াস। কিছু পানি পথ ভুল করলেও, শেষ পর্যন্ত কোন নদীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না–নরম মাটি, বৃক্ষহীন প্রান্তর বা মরুভূমি শুষে নেয়।

স্বতন্ত্র কিছু ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতির কারণে এই সাধারণ নিয়ম লংঘিত হয়, এর জন্য দায়ী স্ফটিক শিলার একটা স্তর। স্তরটা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বিস্তৃত হয়ে সমতলভূমির লাল মাটির তলায় পৌঁছে একটা অগভীর পিরিচের আকৃতি নিয়েছে। পাহাড়ী ঢলের একটা অংশ এই স্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তৈরি করেছে সরু আর লম্বা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রিজারভয়ার, সারডি গিরিসংকটের গোড়া থেকে শুকনো উত্তপ্ত বৃক্ষহীন প্রান্তরের নীচে বিস্তৃত হয়ে আছে একটা আঙুলের মত।

পাহাড়ের কাছাকাছি পানির গভীরতা বেশি, মাটি থেকে কয়েকশো ফুট নীচে। কিন্তু তারপর, মাটি যেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে তেমনি ওই শিলা স্তরও ক্রমশ উঁচু হয়েছে, ফলে পানির স্তর উঠে এসেছে–মাটি থেকে মাত্র চল্লিশ ফুটের মধ্যে।

হাজার হাজার বছর আগে দলবদ্ধ বুনো হাতিদের বিচরণক্ষেত্র ছিল এলাকাটা। কীভাবে যেন পাতাল লেকের সন্ধান পেয়ে যায় ওরা। পা আর দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে পৌঁছে যায় পানির সারফেসে। শিকারীরা হাতির বংশ প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে, কিন্তু তাদের কুয়া আজও খোলা রেখেছে অন্যান্য পশুরা–বুনো গাধা, হরিণ, উট, আর হাতি নিধনযজ্ঞের হোতা মানুষ।

কুয়াগুলো, দু'তিন মাইলের মধ্যে বারো-তেরোটা হবে, লাল মাটিতে গভীর গর্তের মত। প্রতিটি কুয়ার গা বেয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ নেমে গেছে, এত খাড়াভাবে যে পানির উপর সূর্যের আলো পৌঁছায় না বললেই চলে।

পাতাল লেকের পানিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি, দেখতে সবুজ দুধের মত, খেতেও বিস্বাদ লাগে, তবু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিপুল সংখ্যক প্রাণীকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তরের এই একটা মাত্র এলাকাতেই ঘন হয়ে গাছপালা জন্মেছে, চারদিকে সবুজের ছড়াছড়ি।

কুয়াগুলো ছাড়িয়ে, পাহাড়ের দিকে এগোলে যে এলাকাটা সামনে পড়বে, সেটা ভাঙাচোরা আর এলোমেলো—অসংখ্য চৌকো টিলা আর নদী-নালায় ভর্তি। টিলাগুলো একেবারে নিচু, আর বৃষ্টি না হলে শুকনো থাকে নদী-নালা। যুগ যুগ ধরে যে-সব রাখাল পশুর পাল নিয়ে কুয়ার উদ্দেশে এসেছে, ওই টিলা আর নালার পাড়ে গুহার ভিতর বিশ্রাম নিয়েছে বা রাত কাটিয়েছে তারা। এলাকা জুড়ে গুহা আর সুড়ঙ্গই শুধু দেখা যায়।

প্রকৃতি যেন কুয়াগুলোকে শান্তিপূর্ণ এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। মানুষ আর পশু এখানে সতর্কতার সঙ্গে শান্তিচুক্তি মেনে চলে, আক্ষরিক অর্থেই এক ঘাটে পানি খায়, প্রায় কখনোই শান্তি ভঙ্গ করে না। তামাটে সবুজ ঘন কাঁটাগাছের ফাঁকে বিভিন্ন জাতের হরিণ, ছাগল, গাধা, উট ইত্যাদি অবাধে বিচরণ করে।

স্তব্ধ দুপুরে পুব থেকে এগিয়ে এল চারটে আর্মারড কারের কলাম, অপেক্ষারত জনগোষ্ঠীর কানে দূর থেকে ভেসে এল এঞ্জিনের কর্কশ গর্জন।

কলামের সামনে রয়েছে রানা, আগের মতই তার ঠিক পিছনে নিতম্বিনীতে রয়েছে অ্যানি, তারপর আব্বাস আর বানু, ওদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বানুর স্ট্যালিয়নও আসছে। সবার পিছনে রয়েছে মাইকেল। হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল বানু যে সব ক'টা এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল আওয়াজটা, সবুজ ঝোপ আর কাঁটাগাছ ঢাকা নিচু উপত্যকার দিকে হাত তুলল সে। কলাম দাঁড়

করাল রানা, টারিটের উপর উঠে দাঁড়াল।

চোখে বিনকিউলার তুলে খোলা বনভূমিটা দেখল রানা। হঠাৎ অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়তে প্রায় আঁতকে উঠল। যেন ধুলোর ডানায় ভর করে ছুটে আসছে ঝাঁক ঝাঁক ঘোড়সওয়ার। 'মাই গড!' বিস্ময় ধরে রাখতে পারল না ও। 'কয়েকশো মানুষ!' অস্বস্তি বোধ করছে, তার কারণও আছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওদেরকে কচু-কাটা করতে আসছে।

পরমুহূর্তে ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। ঝট করে তাকাতেই দেখল, তীরবেগে ওকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল স্ট্যালিয়নটা, শিরদাঁড়া খাড়া করে ওটার খালি পিঠে বসে রয়েছে রাহেলা বানু, রোদের ভিতর তীব্র বাতাসে ফুলে আছে তার সাদা আলখেল্লা। আগন্তুক ঘোড়সওয়ারদের দিকে ছুটে যাচ্ছে বানু, বিরতিহীন তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, যেন একটা উন্মাদিনী খেপে গেছে। তার আচরণ খানিকটা আশ্বস্ত করল রানাকে। কলামটাকে এগোবার সংকেত দিল ও।

প্রথম সারির লোকগুলো পৌঁছুল ঘোড়া আর উটের পিঠে চড়ে। কালো চেহারা সবার, কুৎসিতই বলা যায়, হিংস্র আর নির্দয় ভাব স্থায়ী ছাপ ফেলে রেখেছে মুখে। প্রত্যেকের পরনে নোংরা ঢোলা পোশাক, গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা—সাদা, কালো, লাল সব রঙেরই আছে। কারও হাতে তরোয়াল আর ঢাল, কেউ মাথার উপর তুলে ধরেছে বর্শা, অনেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও দেখা গেল। প্রায় সবার মাথায় কিছু না কিছু আছে—হয় পাগড়ি, নয় হেলমেট, অথবা বহুবর্ণ টুপি। পিতলের চাকতি দিয়ে তৈরি করা মালা পরেছে অনেকে, কারও গলা থেকে রঙচঙে কাপড়ের তৈরি অসংখ্য ফিতে ঝুলছে। অনেকের হাতে লাল কাপড়ের পট্টিও দেখা গেল।

কাছাকাছি এসে প্রথম সারির লোকগুলো ঘিরে ধরল আর্মারড কারের ড্রাইভারদের। চারদিকে ধুলোর পাহাড় সৃষ্টি হলো। মানুষ আর পশুর ভিড়ে দম আটকে মারা যাওয়ার অবস্থা।

বেশিরভাগ লোকের দাড়ি রয়েছে, মাথাতেও কেউ কেউ লাল কাপড়ের পট্টি বেঁধেছে, দু'একজন মাথায় জড়িয়েছে সিংহের কেশর। উলুবনে শিয়াল যেমন রাজা, ইথিওপিয়ার এদিকটায় জংলী এই লোকগুলো তেমনি বীরযোদ্ধা। রানা আর ওর সঙ্গী-সাথীদের ঘিরে নৃত্য শুরু করে দিল তারা, লু-লু চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলল আকাশ-বাতাস।

আর্মস স্মাগলিঙের অভিজ্ঞতা রয়েছে মাইকেলের, অস্ত্র আর গোলাবারুদ সম্পর্কে রানার রয়েছে ভাল ধারণা, জংলী যোদ্ধাদের সংগ্রহ দেখে রীতিমত তাজ্জব বনে গেল দু'জনেই। প্রতিটি অস্ত্র অত্যন্ত পুরানো হলেও, অন্তত বিশ রকমের আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে তারা। কয়েক ধরনের মার্টিনি হেনরি কারবাইন থেকে শুরু করে লম্বা মাজল টাওয়ার, কী নেই! মাউজার, লী-মেটফোর্ডসও সংখ্যায় কম নয়। নৃত্য-গীত খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ফাঁকা গুলিবর্ষণের উদ্দাম প্রতিযোগিতা। কালো ধোঁয়ার রেখা দাগ কাটল সন্ধ্যার ম্লান আকাশে, বিস্ফোরণের অবিরাম আওয়াজের সঙ্গে আবার শুরু হলো অভ্যর্থনাসূচক লু-লু চিৎকার।

দ্বিতীয় সারির লোকজন এল গাধা, উট আর খচ্চরের পিঠে চড়ে। তারা ধীরগতিতে এলেও, কর্ণপীড়ন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকল না। তাদের ঠিক পিছু পিছু এল পদাতিক বাহিনী, ভিড়ের সঙ্গে মিশে আছে মেয়েলোক, শিশু-কিশোর আর কয়েক ডজন সরব কুকুর।

ছুটন্ত মিছিলের পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হলো এক মহিলা, তারপর তার পেটে উটের পা পড়ল। মহিলার কোল থেকে আগেই

ছিটকে পড়েছে দুধের বাচ্চাটা। সেদিকে ছুটে যাওয়ার সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো রানার, নিরেট পাঁচিলের মত সচল ভিড় বাচ্চা আর তার মাকে কোথায় যে হিঁচড়ে নিয়ে গেল তাও জানবার কোন উপায় থাকল না। এভাবে আরও কত যে প্রাণহানির আশংকা দেখা দিত বলা যায় না, ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বিপদটা টের পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করল রাহেলা বানু। প্রথম সারির সামনে থেকে স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণস্বরে নির্দেশ দিল সে, ধীরে ধীরে স্থির পাথর হয়ে গেল উল্লাসে উন্মত্ত জনতা। জংলীদের আনুগত্য প্রকাশের এই দৃষ্টান্ত মুগ্ধ করল রানাকে। বুঝতে পারল গোত্রপ্রধানদের একজন হিসাবে বানুকে তারা কী পরিমাণ সম্মান করে। এরপর রানার উদ্দেশে চিৎকার করল বানু।

আবার রওনা হলো কলাম। চঞ্চলার সামনে থাকল আদিবাসীদের নৃত্যরত মিছিল, নেতৃত্ব দিয়ে কুয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বীরাঙ্গনা রাহেলা বানু। সামনে ঘন বনভূমি, কুয়াগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বনভূমি ভেদ করে বেরিয়ে এল মিছিল, এবার পথ করে নিতে হবে একটা অগভীর পাথুরে নালার ভিতর দিয়ে—নীচটা শুকনো খটখটে, দু'পাশে প্রায় খাড়া তার গা।

এখানে পৌঁছে সামনে এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। গোটা নালা মানুষের নিরেট আবরণে ঢাকা পড়ে গেল, এমনকী মাটি আর পাথরের খাড়া গায়ে ও মাথার উপর সরু কার্নিসে এমন গিজগিজ করছে মানুষ যে কম ভাগ্যবানরা ঠেলাঠেলি সামলাতে না পেরে টপাটপ গড়িয়ে পড়তে লাগল নীচে। যন্ত্রণাকাতর চিৎকার আর প্রতিবাদের কঠিন ভাষা মহা শোরগোলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

প্রতিটি টারিট থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল ড্রাইভাররা, যেন গর্ত থেকে সন্ত্রস্ত ইঁদুর মাথা তুলছে। পরস্পরের সঙ্গে অসহায় সংকেত বিনিময় করল ওরা, এই হাঙ্গামার মধ্যে অন্য কোনভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আবারও উদ্ধারকারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো রাহেলা বানু। ইতিমধ্যে রানার একটা ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। স্ট্যালিয়ন থেকে লাফ দিয়ে রানার গাড়ির সামনের বনেটে নামল বানু, আদিবাসীদের মধ্যে যারা গাড়ির গায়ে ঝুলছে বা উপরে উঠতে চাইছে তাদের উদ্দেশে এলাপাতাড়ি কিল-ঘুসি চালাল সে। তার আগে আধ ঘণ্টা ধরে বহু চেঁচামেচি করেছে সে, কেউ তার কথায় কান দেয়নি। জংলী কি আর সাধে বলা হয়, কখন যে ওরা সুবোধ বালক আর কখন যে বেয়াড়া আচরণ করবে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। তবে একটা ব্যাপারে রানার কোন সন্দেহ নেই, অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটা দারুণ উপভোগ করছে বানু। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে, সেখানে নগ্ন রণোন্মাদনা ঝিলিক মারছে। ইতিমধ্যে ভোজবাজির মত তার হাতে একটা চাবুক চলে এসেছে, অক্লান্ত উৎসাহের সঙ্গে উত্তেজিত জনতার পিঠে হরদম চালাচ্ছে সেটা। রানার একবার ইচ্ছে হলো বানুকে বাধা দেয়, কিন্তু তারপর অত্যন্ত বিপজ্জনক ভেবে বাতিল করে দিল ধারণাটা। তার বদলে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার হাত থেকে বাঁচবার অন্য কী বিকল্প উপায় করা যায় ভাবতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকাতে এই প্রথম নালার গায়ে গুহাগুলো দেখতে পেল ও।

অনেকগুলো গুহা থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে আদিবাসীরা। কেউ অশ্বারোহীর আঁটসাঁট পোশাক পরে আছে, কারও পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, প্রায় সবারই বুকে ঝুলছে অ্যামুনিশন বেল্ট, হাঁটুর নীচে লাল পট্টি বাঁধা, খালি পা। দু'হাতে

ধরে মাথার উপর মাউজার রাইফেল ঘোরাচ্ছে বন বন করে। এদের অনেকের মাথাতেও লাল কাপড়ের পট্টি দেখল রানা। উৎসাহের সঙ্গে উপভোগে এরাও বানুর চেয়ে কম যাচ্ছে না, তবে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার কাজে অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে।

'ওরা আমার দাদুর গার্ড,' রানার উদ্দেশে ব্যাখ্যা করল বানু, শরীরের উপর দিয়ে এইমাত্র বিরাট ধকল যাওয়ায় হাঁপাচ্ছে সে, কিন্তু আনন্দঘন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা,' আবার বলল সে, রানা যেন তার কতদিনের পুরানো আর সমবয়েসী বন্ধু। 'আমার লোকজন মাঝে-মধ্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমিও তাই লক্ষ করছি।' একটু পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'মাথায় আর পায়ে, কারও কারও হাতেও, কী ওগুলো? লাল কাপড়ের পট্টি…?'

'ওরা কমিউনিস্ট, সম্রাট হাইলে সেলাসিকে উৎখাত করতে চায়,' বলল বানু। 'যদিও কমিউনিস্টদের কোন সংগঠন এদিকে এখনও গড়ে ওঠেনি। আমার দাদু লোকমুখে শুনেছে কমিউনিস্টদের প্রতীক চিহ্ন হচ্ছে লাল, ব্যস, নিজের লোকদের লাল পট্টি ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে সে। কিন্তু আমার বাবা আর কাকারা কমিউনিস্টদের তেমন একটা সমর্থন করে না। এখনও ওরা সম্রাটের দলে। তবে শিফটাদের বিরুদ্ধে সম্রাট সেনাবাহিনী না পাঠালে এবার ওদের দল বদল করতে হবে।'

উল্টো করা রাইফেল হাতে গার্ডরা তেড়ে আসায় গাড়িগুলোর সামনে থেকে ভিড় খানিকটা কমল। শোরগোলের মাত্রা কমে যা দাঁড়াল তার সঙ্গে মাঝারি ধরনের পাহাড় ধসের তুলনা করা চলে।

ক্লান্ত চারজন ড্রাইভার নেমে এল গাড়ি থেকে, গুহাগুলোর সামনে খোলা একটা জায়গার দিকে সতর্কতার সঙ্গে নিরেট স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে এগোল তারা। প্রতিরক্ষা জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে রানা আর মাইকেলের মাঝখানে থাকল অ্যানি, তার পিছনে দুর্গপ্রাচীরের মত রয়েছে আব্বাস। পুরুষদের বগলের তলা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে তার পাশে এসে হাত ধরল বানু, নিজেকে আরও খানিক নিরাপদ মনে হলো অ্যানির।

'প্লিজ, ঘাবড়িয়ো না,' ফিসফিস করে অভয় দিল বানু। 'আমরা সবাই তোমার বন্ধু।'

'উল্টোটা বলে অনায়াসে আমাকে বোকা বানাতে পারতে, লক্ষ্মী বোনটি!' বানুর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে পাল্টা হাসল অ্যানি। ঠিক এই সময় একটা গুহা থেকে ছোট্ট মিছিলটা বেরিয়ে এল।

মিছিলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তালগাছের মত সরু আর লম্বা এক বৃদ্ধ, ঠিক যেন মানুষের আকৃতি নিয়ে একটা ক্যারিকেচার। শক্ত, হাড়সর্বস্ব কাঠামোয় লাল হলুদ ডোরাকাটা ঢোলা আলখেল্লা ঝুলছে। তার হাঁটবার সঙ্গে আলখেল্লার গায়ে ফুটে উঠছে পায়ের আকৃতি, এতই সরু যে হাড়ের উপর কোন মাংস আছে কিনা সন্দেহ। গাঢ় রঙের মাথায় কোন চুল নেই, মুখে নেই কোন দাড়ি-গোঁফ বা ভুরু।

ঝুলে থাকা কোঁচকানো আর বিবর্ণ চামড়ায় তার চোখ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে। মুখের ভিতর একটা দাঁতও অবশিষ্ট নেই, ফলে দু'দিকের চোয়াল ভিতর দিকে সেঁধিয়ে গেছে, ভাঁজ করে রেখেছে গোটা মুখটাকে। সব মিলিয়ে যে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হলো অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি, কিন্তু পরমুহূর্তে ধারণাটা মিথ্যে হয়ে যায় তাঁর হাঁটবার ভঙ্গিটা লক্ষ করলে। বুক ফুলিয়ে হাঁটছেন, প্রাণ-চঞ্চল যুবকের মত দীর্ঘ পদক্ষেপে, কারুকাজ করা

বাঁটসহ রাইফেলটা অনায়াসে বহন করছেন কাঁধে, চামড়া ঢাকা লম্বাটে গর্তের ভিতর থেকে শকুনের দৃষ্টি হানছেন চারপাশে। অথচ তবু রানার মনে হলো, ভদ্রলোকের বয়স আশির কম তো হতেই পারে না।

ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে বৃদ্ধের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল আব্বাস খায়ের, সালাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

ফিসফিস করে ওদেরকে জানাল বানু, 'উনি আমার দাদু, কামাল হাসান। দাদু ইংরেজি জানেন না, তবে জানেন সারা দুনিয়ায় ইংরেজির কদর আছে। আজও তিনি বীরযোদ্ধা হিসেবে নিজের খ্যাতি ধরে রেখেছেন–শুধু যে গোত্রপ্রধান তাই নয়, গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে সাহসীও বটেন।'

ড্রাইভার চারজনের ওপর চোখ বুলালেন বৃদ্ধ কামাল হাসান, ধুলো আর কাঁটাবিহীন টুইডের সুট পরা মাইকেল সেভারসকে তাঁর পছন্দ হলো। সামনের দিকে লাফ দিলেন তিনি, মাইকেল এড়িয়ে যাবার আগেই তাকে বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের ভেতর নিয়ে পিষতে শুরু করলেন, মাইকেলের নাকে পিঁয়াজ-রসুন আর তামাক থেকে শুরু করে ঘাম ও ধুলোময়লার বিভিন্ন পদের গন্ধ ঢুকল। 'হাউ ডু ইউ ডু?' সিংহের মত গর্জে উঠলেন তিনি, তাঁর ইংরেজি জ্ঞান এই একটি মাত্র বাক্যে সীমিত।

'আগেই শুনেছ, আমার দাদু ইংরেজির ভারি ভক্ত,' সগর্বে ওদেরকে জানাল আব্বাস। 'সেজন্যেই তো ছেলে আর নাতি-নাতনিদের ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন।'

'দাদুর বুকে যে পদকগুলো দেখছ ওগুলো সম্রাট হাইলে সেলাসি নিজের হাতে ওঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন,' বলল বানু। 'সম্রাটকে উনি পছন্দ না করলে কী হবে, পদকগুলো ওঁর খুব প্রিয়।'

বেশিরভাগই সোনার চাকতি, দু'একটা পিতলও রয়েছে।

মাইকেলের সংগ্রাম চলছে, বৃদ্ধ কামাল হাসানের আলিঙ্গন থেকে এখনও সে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। বানুর হাবভাব থেকে আলোচ্য বিষয় আন্দাজ করতে পারলেন বৃদ্ধ, মাইকেলকে ছেড়ে দিলেন, ওরা সবাই যাতে তাঁর বুকে লটকানো পদকগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে পারে। ওদেরকে গাইডও করলেন–প্রতিটি পদকের দিকে সগর্বে আঙুল তাক করলেন তিনি।

'অদ্ভুত সুন্দর, ওল্ড বয়, সত্যি অদ্ভুত সুন্দর,' ঐকমত্য ঘোষণা করল মাইকেল, হাত দুটো জ্যাকেট আর মাথার চুল ঠিকঠাক করায় ব্যস্ত।

বৃদ্ধের বক্তব্য ভাষান্তর করে ওদেরকে শোনাল বানু। 'দাদু তোমাদেরকে ইথিওপিয়ায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। বলছেন, যদিও ইংরেজরা আগের জেনারেশনে অত্যাচারী ছিল, আর এ-যুগেও তারা কালো মানুষদের ঘৃণা করে, তবে কীর্তিমান একজন ইংরেজ ভদ্রলোককে আলিঙ্গন করার সুযোগ পেয়ে তিনি ভারি গর্ববোধ করছেন। বাবার মুখে তোমার কথা আগেই শুনেছেন দাদু, জানেন তুমি একজন বীরযোদ্ধা...।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বানুর কাকাদের সঙ্গে প্রিন্স হাসান সালে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। 'আমার বাবা জানতে চাইছেন,' সহাস্যে মাইকেলকে বলল হাসান সালে, 'ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থাকার সময় তুমি যে পদকগুলো পেয়েছ সেগুলো সাথে করে এনেছ কিনা। বাবা চান ওগুলো পরেই তুমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

মাইকেলের চেহারা এক নিমেষে কালো হয়ে গেল। 'থামো, ব্যস করো!' চাপা স্বরে হিস হিস করে উঠল সে। বিস্তর টাকা কামানো ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ভাবতেই পারে

না মাইকেল। সংকটময় মুহূর্তটি অবশ্য কেটে গেল, গোত্রপ্রধান কামাল হাসান গলা চড়িয়ে কাদের যেন ডাকাডাকি শুরু করলেন।

এগিয়ে এল কৃষ্ণবর্ণ যুবতীর দল, প্রত্যেকের হাতে ফুলের মালা, সবাই দীর্ঘ ওড়না দিয়ে মুখের বেশিরভাগ ঢেকে রেখেছে। ড্রাইভারদের নয়, মালা দিয়ে বরণ করা হলো আর্মারড কারগুলোকে।

এই সুযোগটা কাজে লাগাল বানু, অ্যানির হাত ধরে একটা গুহার ভিতর চলে গেল সে। 'আমার চাকর তোমার জন্যে গোসলের পানি নিয়ে আসবে,' বলল সে। 'উৎসব অনুষ্ঠানে তোমাকে সাংঘাতিক সুন্দর দেখানো চাই। আমরা হয়তো আজ রাতেই ঠিক করে ফেলব তোমার জন্যে ওদের মধ্যে কাকে বাছা যায়।'

গাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কামাল হাসানের অনুসারীরা মূল নালায় শৃংখলা বজায় রেখে জড়ো হলো। যারা গোত্রপ্রধানের প্রিয় বা সম্মানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী অথবা যারা ভিড়ের গায়ে ঠ্যালা-গুঁতো দিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে পারল তাদের জায়গা হলো মাঝখানের সবচেয়ে বড় গুহাটায়। বাকি সবাই উপত্যকা জুড়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে বসল। চারদিকে আলখেল্লা পরা কালো মূর্তি গিজগিজ করছে। গোল হয়ে বসে আগুন জ্বালল প্রতিটি দল, একশোরও বেশি অগ্নিকুণ্ডের আলো প্রতিফলিত হলো রাতের আকাশে ভাসমান সাদা মেঘের গায়ে।

রাতের আকাশে হালকা গোলাপি আভা, বিশ কিলোমিটার দূর থেকে সেটা দেখতে পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল মেজর লুইগি রাকা।

থার্ড ব্যাটালিয়ানকে থামবার নির্দেশ দিল সে, একটা ট্রাকের ছাদে উঠে রহস্যটা কী বুঝবার চেষ্টা করল, সন্দেহ হচ্ছে সদ্য অস্ত যাওয়া সূর্যের অলস কোন আভা কি না। কিন্তু না, ব্যাপারটা সেরকম মনে হলো না।

লাফ দিয়ে নীচে নামল সে, ড্রাইভারের দিকে আঙুল তাক করে বলল, 'অপেক্ষা করো।' ক্যানভাস ঢাকা ট্রাকগুলোকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোল সে, কমান্ড কারের দিকে যাচ্ছে।

'মাই কর্নেল!' রোলস-রয়েসের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ভিতরে তাকাল সে।

গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দিয়ে রয়েছে কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক, চোখ দুটো বন্ধ। জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সের শীতল আচরণ তার অহমিকা, আভিজাত্য আর গর্বে আঘাত করেছে, সেটা এখনও ভুলতে পারছে না সে। মেজর রাকার উপস্থিতি টের পেলেও এমন কোন ভাব দেখাল না যাতে বোঝা যায় জেগে আছে। তবে মেজরের কথা শেষ হতে নিস্তেজ গলায় বলল, 'পরিস্থিতি বুঝে যা ভাল মনে হয় করো। শুধু একটা ব্যাপারে লক্ষ রেখো, সকালের আগেই ওয়েলস অভ চাল্ডি যেন আমাদের দখলে চলে আসে।'

পরিস্থিতি বুঝে মেজর রাকা থার্ড ব্যাটালিয়ানকে সেই মুহূর্তে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় থাকবার নির্দেশ দিল। কোন অবস্থাতেই আলো জ্বালা চলবে না, এমনকী জোরে কথাও বলা নিষেধ। এরপর সামনে বাড়বার নির্দেশ দিল সে, তবে আস্তে-ধীরে। ট্রাক বহর শম্বুকগতিতে এগোল, এঞ্জিনের আওয়াজ যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখা হলো। সৈনিকরা সবাই যে যার অস্ত্র নিয়ে তৈরি অবস্থায় থাকল।

অবশেষে এক সময় ইরিত্রীয় গাইডরা হাত তুলে ওদের নীচে অগভীর উপত্যকাটা দেখাল মেজরকে। চাঁদের আলোয় উপত্যকার

গাছপালা প্রায় পরিষ্কারই দেখা গেল। দশ মিনিট পর রণকৌশল স্থির করে ফেলল মেজর রাকা। কোথায় মোটর পুল থাকবে, কোথায় রাত কাটাবে সৈনিকরা, মেশিনগান বসানোর জায়গা, রাইফেল ট্রেঞ্চের নির্দিষ্ট স্পট, এক এক করে সব ঠিক করে ফেলল সে। ভাল করে কিছু না দেখেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাকে সমর্থন জানাল কাউন্ট ডিকানডিয়া। শান্তভাবে কয়েকটা নির্দেশ দিল মেজর, ফলে পরিষ্কার হয়ে গেল রাতে সৈনিকরা ঘুমানোর সময় পাবে না। 'আর যদি কারও হাত থেকে শাবল পড়ে যায় বা কেউ যদি হাঁচি দেয়, তাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাব–তারই নাড়ি গলায় বেঁধে।'

বড় গুহাটার ভিতর বাতাস এত ভারি আর গরম, যেন ভিজে একটা উলেন কম্বলের নীচে চাপা পড়েছে ওরা। আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, যতদূর দেখা যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। দানবীয় ছায়া ফেলে ছুটোছুটি করছে চাকর-বাকররা। অভিযাত্রী, অতিথি বা সৈনিকরা মুহূর্তের জন্যও মুখের কামাই দিচ্ছে না, অনর্গল বক বক করে চলেছে, সেই সঙ্গে সবজান্তার ঢঙে মাথা ঝাঁকানোর কোন বিরাম নেই। খানিক পরপরই গুহার বাইরে থেকে একটা করে আতংকিত ষাঁড়ের ডাক ভেসে আসছে। হঠাৎ করে থামছে সেই ডাক, বুঝতে অসুবিধে হয় না কসাই তার ছোরাটা এতক্ষণে ঠিকমত চালাতে পেরেছে ওটার গলায়। তারপরই আরেকটাকে মাটিতে ফেলার আওয়াজ ভেসে আসছে, গুহার অদৃশ্য দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে আওয়াজটা। পশু ধরাশায়ী হওয়ায় উল্লাসে মাতামাতি করছে দর্শকরা। জবাই হলেই দশ-বারো জন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাল ছাড়াতে লেগে

যাচ্ছে, রক্তাক্ত মাংসের ফালি মাটির বড় বড় পাত্রে তোলা হচ্ছে।

পাত্রগুলো নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে গুহায় ঢুকছে চাকররা, মাংসের ফালি তখনও কাঁপছে একটু একটু, ধোঁয়াটে ভাপও উঠছে সামান্য। প্রতিটি পাত্র নামাতে যা দেরি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সেটার দিকে। রক্ত ঝরা ফালি ছোঁ দিয়ে তুলে নিচ্ছে তারা, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে একটা প্রান্ত আটকাচ্ছে, অপরপ্রান্তটা টান টান করে এক হাতে ধরে থাকছে, আরেক হাতে ধরা ছুরি দিয়ে নাকের ডগার কাছাকাছি থেকে কেটে নিচ্ছে ফালিটা। উষ্ণ রক্ত ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, টুকরোটা একটা মাত্র ঢোকের সাহায্যে নেমে যাচ্ছে গলা দিয়ে।

আদিবাসীদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা প্রকাশ্যে আগুনের মত গরম চা খাচ্ছে, আর খ্রীস্টানরা খাচ্ছে গ্রাম থেকে তৈরি করে আনা মদ, স্থানীয় ভাষায় ওরা সেটাকে তেজ বলে। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, প্রত্যেক মুসলমানের রয়েছে একজন করে খ্রীস্টান বন্ধু। অপ্রকাশিত চুক্তি অনুসারে মুসলমান বন্ধুর চায়ের মগে তেজ ঢেলে দিচ্ছে খ্রীস্টান দোস্ত, মুসলমান বন্ধুরা ভান করছে ঘটনা সম্পর্কে কিছুই তাদের জানা নেই। গোত্রপ্রধান কামাল হাসান নিজে মদ্যপান করেন না, তবে তিনি জানেন তাঁর ছেলেরা বা প্রজারা লুকিয়ে-চুরিয়ে এক-আধটু খায়। যুদ্ধকালীন সময়ে ব্যাপারটা তিনি দেখেও না দেখবার ভান করেন, আর শান্তিকালীন সময়ে কেউ মাতলামি করলে তার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেন। জ্ঞানবৃদ্ধ কামাল হাসান প্রায়ই একটা কথা বলে থাকেন, তোমার যদি কোন দুর্বলতা থাকে সেটা গোপন রাখো, গোপন থাকলে এমনকী পাপও ক্ষমা পায়।

তেজ তৈরি করা হয় কড়া মধু মিশিয়ে, সোনালি আগুনের মত তার রঙ, পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত ষাঁড়ের মত গুঁতো মারে।

যারা শ্রদ্ধার পাত্র তাদের সঙ্গে বসবার সুযোগ হয়েছে মাইকেলের, বৃদ্ধ কামাল হাসান আর প্রিন্স হাসান সালের মাঝখানে। অপেক্ষাকৃত কম সম্মান যাদের তাদের সঙ্গে বসেছে রানা আর অ্যানি, মাইকেল আর ওদের মাঝখানে বিভিন্ন সম্মানের আরও পাঁচ-ছয়টা দল রয়েছে। ওরা বিদেশী বলে কাঁচা মাংসের বদলে রান্না করা খাসী আর মুরগি পরিবেশন করা হলো, সঙ্গে শূকরের মাংসও প্রচুর। প্রতিটি মাংসের পাত্রে এত বেশি মশলাবহুল ঝোল যে কেউ পড়ে গেলে তাকে বোধহয় ডুবেই মরতে হবে। বিদেশীদের জন্য শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে, পরিবেশনের দায়িত্ব পেয়েছে মাইকেল। মাঝে মধ্যেই গুহার ছাদের দিকে আঙুল তুলে প্রিন্স হাসান সালেকে জিজ্ঞেস করছে সে, 'ওটা কী বলো তো, চকলেট সালে?' প্রিন্স উৎসাহের সঙ্গে সেদিকে মুখ তুলছে, সেই ফাঁকে তার চায়ের মগে শ্যাম্পেন ঢেলে দিচ্ছে মাইকেল।

খেতে বসবার আগে বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান তাঁর টাক মাথা সিংহের কেশর দিয়ে ঢেকে নিয়েছেন। কেশরটার চেহারা খুব করুণ, যেন পোকায় খেয়েছে, তার কারণ প্রথমবার ওটা মাথায় পরবার পর পেরিয়ে গেছে চল্লিশটা বছর।

হঠাৎ করে দাঁতহীন মাড়ি বের করে আপনমনে হাসতে শুরু করলেন কামাল হাসান। হাতে বানানো রুটিতে শূকরের লম্বা মাংস ভরে রুটিটা গোল পাকালেন তিনি, আকারে সেটা হাভানা চুরুটের মত হলো, ঝর ঝর করে ঝোল ঝরছে, হঠাৎ সেটা মাইকেলের অপ্রস্তুত মুখের ভিতর সেঁধিয়ে দিলেন।

'তোমাকে ওটা হাতের সাহায্য না নিয়ে গিলতে হবে,' তাড়াতাড়ি প্রথাটা ব্যাখ্যা করল প্রিন্স সালে। 'এটা একটা খেলা,

বাবা খুব পছন্দ করেন।'

মাইকেলের চোখ ফুলে উঠল, দম নিতে না পারায় টকটকে লাল হয়ে উঠল তার মুখ, মরিচের অসম্ভব ঝাল জিভের চামড়া পুড়িয়ে দিল। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোক গিলল সে, চিবাল–এতকিছুর মাঝেও চেহারায় ধরে রাখবার চেষ্টা করছে হাসিখুশি অভিজাত ভাবটা।

কামাল হাসান সপ্রশংসদৃষ্টিতে অবলোকন করছেন, তাঁর ফোকলা মুখ থেকে ঝোল গড়াচ্ছে, বলিরেখাগুলো কুঁচকে সরু আর গভীর হয়ে উঠল অর্থাৎ নিঃশব্দে হাসছেন তিনি, আর মাঝে মাঝে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে একই কথা বারবার উচ্চারণ করে প্রেরণা যোগান দিচ্ছেন মাইকেলকে, 'হাউ ডু ইউ ডু? হাউ ডু ইউ ডু?'

অবশেষে আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রেখে মাংসের টুকরোটা গিলে ফেলতে পারল মাইকেল। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে সে। বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান আবার একবার তাকে বন্ধুসুলভ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। ঠোঁটে সহানুভূতিসূচক হাসি নিয়ে মাইকেলের জন্য তার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল প্রিন্স সালে।

কিন্তু কারও কৌতুকের শিকার হওয়া মাইকেলের ধাতে সয় না। গোত্রপ্রধানের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, ঠেলে সরিয়ে দিল গ্লাসটা, হাতছানি দিয়ে একজন চাকরকে কাছে ডাকল। মাটির চওড়া পাত্র থেকে কাঁচা মাংসের একটা ফালি তুলে নিল সে। ফালিটা প্রায় তার কব্জির মত মোটা, লম্বায় তার হাতের চেয়ে সামান্য একটু যদি ছোট হয়। বিনা নোটিসে ফালির একটা প্রান্ত গোত্রপ্রধানের দাঁতহীন মাড়ির মাঝখানে ঠেসে ধরল সে। শান্ত গলায়, হাসতে হাসতে বলল, 'খাও বাপ, দেখো কেমন লাগে!'

বিস্ফারিত রক্তচক্ষু মেলে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে থাকল

বৃদ্ধ। গুহার ভিতর ভীতিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল। যে-কোন মুহূর্তে একটা কল্পনাতীত অঘটন ঘটে যেতে পারে। তারপর, যদিও মাংসের ফালিটা ফুলে ওঠা বিশাল জিভের মত মুখে ঝুলে থাকায় গোত্রপ্রধান হাসতে পারলেন না, তাঁর চোখের চারপাশে আরও কুঁচকে উঠল চামড়া, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল উল্লাস। তাঁর চোয়ালের কাজ দেখবার মত হলো, যেন একটা অজগর গোটা একটা ছাগল গিলবার চেষ্টা করছে। ঢোক গিললেন তিনি, ফালির এক ইঞ্চি অদৃশ্য হলো মুখের ভিতর। আরেকটা ঢোক গিললেন, আরেক ইঞ্চি মাংস ভিতরে ঢুকল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মাইকেল, প্রতিটি ঢোকের সঙ্গে মাংসের ফালিটা আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোত্রপ্রধানের মুখ খালি হয়ে গেল, চোখ বুজে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি, চায়ের মগটা ধরবার জন্য হাতড়াতে শুরু করলেন। এই সুযোগে তাঁর মগে দুই আউন্সের মত শ্যাম্পেন ঢেলে দিল মাইকেল। ঠাণ্ডা চায়ের সঙ্গে সেটা এক ঢোকে খেয়ে ফেললেন কামাল হাসান, ঠোঁট আর মুখ থেকে কাঁচা রক্ত মুছলেন। তারপর দড়াম করে চাপড় মারলেন মাইকেলের পিঠে। পরস্পরের হাত থেকে খেয়েছে ওরা, কাজেই ওদের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

ওদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা খুঁটিয়ে লক্ষ করল আব্বাস খায়ের। বিদেশীদের পেয়ে দাদু যে খানিকটা বাড়াবাড়ি করবেন তা সে আগেই আন্দাজ করেছিল। তবে কল্পনাও করেনি একা শুধু শ্বেতাঙ্গ মাইকেলই তাঁর দৃষ্টি কাড়বে। যাকে যার পছন্দ, এ-ব্যাপারে করবার কিছু নেই। কিন্তু এ-কথাও তো সত্যি যে মাত্র ক'দিনের পরিচয়ে তারও পছন্দ হয়ে গেছে মাসুদ রানাকে। তার হিরোকে অবহেলা করা হবে, আর সে তা মুখ বুজে সহ্য করবে? কক্ষনো

না! বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে হলো না, দাদুর সম্পূর্ণ মনোযোগ কাড়বার উপায় পেয়ে গেল আব্বাস। লোকে লোকারণ্য গুহা থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এল সে, আবার যখন ফিরে এল তখন তার হাতে সিংহের ছালটা রয়েছে। মরুর গরম বাতাস পেয়ে ইতিমধ্যে শুকনো খটখটে হয়ে গেছে সেটা।

ছালটা মাথার উপর তুলে ধরে গুহায় ঢুকল সে, তারপরও মেঝের একদিকে ঘষা খেলো নাকের দিক, আরেক দিকে লেজের দিক। মাইকেলের কাঁধে হাত রেখে খোশগল্পে মেতে ছিলেন কামাল হাসান, ছালটা দেখে আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন তিনি। তাঁর সামনে চামড়াটা বিছিয়ে দিল আব্বাস।

উত্তর শুনে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, নাতির হাত ধরে ঘন ঘন ঝাঁকি দিলেন বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য। দাদুর মেজাজ বুঝে রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা বর্ণনা করল আব্বাস, অঙ্গভঙ্গি করে দেখাল ঠিক কীভাবে আক্রমণ করেছিল সিংহটা, কীভাবে পাথর ছুঁড়ে তার ঘাড় চুরমার করা হয়।

গুহার ভিতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা। কাছ থেকে ভাল করে শুনবার জন্য লোকজন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আব্বাস থামতে উঠে দাঁড়ালেন গোত্রপ্রধান, সরাসরি রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। যাবার পথে কোথায় পা ফেলছেন দেখলেন না, ফলে তাঁর পায়ের ধাক্কায় উল্টে পড়ল ঝোল আর মাংসসহ কয়েকটা পাত্র, তেজ ভর্তি মাটির একটা কলস লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন। রানার মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল ধরে টান দিলেন তিনি, ব্যথা পাবার আগেই তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'হাউ ডু ইউ ডু?' জিজ্ঞেস করলেন কামাল হাসান, প্রচণ্ড ভাবাবেগে কাঁপছেন– খালি হাতে একজন লোক একটা সিংহকে মেরে ফেলেছে শুনে মুগ্ধ বিস্ময় আর আনন্দে তাঁর চোখে পানি

এসে গেছে। চল্লিশ বছর আগে চওড়া ফলা লাগানো তিনটে বর্শা ভাঙবার পর চতুর্থটা তিনি হারামজাদা সিংহের হৃৎপিণ্ডে গাঁথতে পেরেছিলেন।

'হাউ ডু ইউ ডু,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, আনাড়ির মত দাঁড়িয়ে থাকল। তারপরই যন্ত্রণাকাতর চাপা শব্দ বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান ওকে বুকে টেনে নিয়ে পিষতে শুরু করেছেন।

ভাগ্য ভাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওকে মুক্তি দিলেন কামাল হাসান। ওর হাত ধরে প্রথমশ্রেণীর মর্যাদাসূচক বসবার জায়গাটির দিকে এগোলেন। তাঁর এক কনিষ্ঠ সন্তানের পাঁজরে লাথি মারলেন মৃদু, সরে গিয়ে রানাকে বসবার জায়গা করে দিল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানির দিকে একবার তাকাল রানা, অসহায় ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল। ইতিমধ্যে রুটির উপর রান্না করা মস্ত এক টুকরো খাসীর মাংস ফেলে সেটা গোল পাকিয়ে ফেলেছেন কামাল হাসান। সেটা দেখতে হলো হুবহু একটা টর্পেডোর মত, অনায়াসে একটা যুদ্ধ-জাহাজকে ঘায়েল করতে পারবে। গভীর শ্বাস টেনে যতটা সম্ভব হাঁ করল রানা, নিজের হাতে তৈরি টর্পেডো তরোয়ালের মত মাথার উপর উঁচু করে ধরলেন কামাল হাসান। 'হাউ ডু ইউ ডু?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে রানার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন সেটা।

এগারো

কাউন্ট অভিযোগ করল, একটানা দীর্ঘ সময় গাড়িতে বসে থাকায় তার নিতম্ব প্রদেশ ব্যথা করছে। মেজর লুইগি রাকাকে ডেকে সে আরও বলল, ওয়েলস অভ চাল্ডিতে পৌঁছে সে যেন দেখতে পায় তার তাঁবু ফেলা হয়েছে এবং তাঁবুতে খানাপিনা আর বিছানার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কাউন্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে বলে নত মস্তকে প্রতিশ্রুতি দিল মেজর। মনে মনে কাউন্টকে মা-বাপ তুলে গাল দিলেও, মুখে কিছু বলবার সাধ্য তার নেই। জেনারেল ফাদ তাকে বলে দিয়েছে, কোন অবস্থাতেই কাউন্টকে চটানো যাবে না। কাউন্টকে তোয়াজ করবার অন্তর্নিহিত কারণটা অবশ্য আন্দাজ করতে পারে মেজর রাকা। জেনারেল ফাদকে মি. এক্সের মাধ্যমে যারা আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে তাদের পরিচয়ও তার অজানা নয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সি.আই.এ. এবং মাফিয়া একযোগে কাজ করছে এখানে। ইটালিয়ান মাফিয়ার যে চক্রটি এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, তাদের নেতা কাউন্ট ডিকানডিয়ার শ্যালক, তার সুপারিশে ও তাকে খুশি করবার জন্য ওয়েলস অভ চাল্ডি দখল করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাউন্টকে।

ভাড়াটে সৈনিক বলেই নিজের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় মেজর রাকাকে। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এমন একটা খবর পেয়েছে সে, কাউন্ট ডিকানডিয়া যা কল্পনাও করতে পারবে না। ওয়েলস অভ চাল্ডি আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার হলো আদ্দিস আবাবায় সম্রাট হাইলে সেলাসিকে উৎখাত

করবার জন্য কমিউনিস্টরা যে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে তাতে নাক গলানো। জেনারেল ফাদকে সাহায্য করা হচ্ছে একটি মাত্র শর্তে, গেরিলাদের ঠেকানোর কাজে সম্রাটের অনুগত বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্য পাঠাতে হবে থার্ড ব্যাটালিয়ানকে। তারমানে ওয়েলস অভ চান্ডি দখল করা অভিযানের মাত্র প্রথম অংশ, তারপর রাজধানী আদ্দিস আবাবার দিকে মার্চ করবে থার্ড ব্যাটালিয়ান। এখন পর্যন্ত এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না কাউন্ট।

উপত্যকায় পৌঁছে তাঁবুতে আশ্রয় নিল কাউন্ট, ভৃত্যরা রিপোর্ট করল ভরপেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

মেজর রাকা তার বারোটা মেশিনগান বসাল উপত্যকার ঢালু গায়ে, যেখান থেকে বিশাল জায়গা জুড়ে তিনদিকেই গুলিবর্ষণ করা যাবে। তার একটু নীচে তৈরি করা হলো রাইফেল ট্রেঞ্চ। বালি মেশানো ঝুরঝুরে মাটি, গর্তের ভিতর পজিশন নিয়ে থাকল রাইফেলম্যানরা। ইতিমধ্যে মেশিনগান আর ট্রেঞ্চগুলোকে রক্ষার জন্য বালির বস্তা ফেলে পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। মর্টার কোম্পানীকে অনেকটা পিছনে রাখল সে, রাইফেল ট্রেঞ্চ আর মেশিনগান নেস্ট ওটাকে রক্ষা করবে। সুরক্ষিত অবস্থান থেকে ওয়েলস অভ চান্ডির গোটা এলাকার উপর মর্টার বোমা ফেলতে পারবে তারা।

পেশাদার সৈনিক বলেই আক্রমণের প্রস্তুতিতে কোন ত্রুটি রাখবার পক্ষপাতী নয় মেজর রাকা। সম্রাট হাইলে সেলাসি জানেন থার্ড ব্যাটালিয়ান কেন বা কোথায় যাচ্ছে, কাজেই তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য অবশ্যই তিনি সেনাবাহিনী পাঠাবেন না। আর ইথিওপিয়ার এদিকটায় গেরিলাদের কোন তৎপরতা বা ঘাঁটি নেই। বাধা দেবে শুধু আদিবাসীরা, কিন্তু তারা প্রায় সবাই হয় মারা

পড়বে, নয়তো জান নিয়ে পাহাড়ে পালাবে, কারণ থার্ড ব্যাটালিয়ানকে ঠেকাবার সামর্থ্য তাদের নেই। তবে মন খুঁত খুঁত করবার একটা কারণ অবশ্য আছে। বিশ্বস্ত কোন সূত্রের খবর না হলেও, গুজবটা মেজরের কানে এসেছে। আদিবাসীরা নাকি বাইরে থেকে সাহায্য পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিছু সাহায্য নাকি তারা পেয়েওছে। বিশ্বাস্য মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই।

তার লোকজন কাজ করছে, মেজর রাকা ব্যক্তিগতভাবে ডিফেন্সের সামনে দিয়ে বার কয়েক হেঁটে গেল, লক্ষ করল রঙ করা মেটাল মার্কারগুলোর পজিশন। তার সশরীর উপস্থিতিতে সারারাত ধরে চলল যুদ্ধ-প্রস্তুতি।

মদ এবং মাংস দুটোই বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, ফলে মাইকেলের পেটটাই যে শুধু অসভ্যের মত ফুলে উঠল তাই নয়, চোখেও সে খানিকটা ঝাপসা দেখছে।

ওদিকে রানা আর কামাল হাসানের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, ভাষার ব্যবধান কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। গোত্রপ্রধানের ধারণা, রানা যেহেতু খালি হাতে একটা সিংহকে বধ করতে পেরেছে, বিদেশী হলেও গোত্রের নিয়ম অনুসারে স্বল্প-মেয়াদী অন্তত চারটে বিয়ে করবার অধিকার রানার পাওয়া উচিত। ওকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হলো, এ-সব বিয়েতে শুধু মজা আর আনন্দ আছে, কোন রকম খরচাপাতি নেই বা কোন রকম বাঁধনেও জড়িয়ে পড়তে হবে না। গোত্রের কুমারী মেয়েরা তাকে দু'চার দিনের জন্য স্বামী হিসাবে পেলে নিজেদের জীবন সার্থক হয়েছে বলে মনে করবে, কারণ এমন একজন বীরের সন্তান গর্ভে ধারণ করবার সুযোগ ভবিষ্যতে আর কখনও তারা না-ও পেতে পারে।

‘রাজি হয়ে যাও, ওল্ড চ্যাপ,’ ফিসফিস করে রানাকে পরামর্শ দিল মাইকেল। ‘আমার কপালে যখন নেই, দেখে অন্তত সাধ মেটাই। কথাতেই তো আছে, ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন।’

প্রিন্স সালে জানাল, ‘বাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলে অনর্থ ঘটবে।’

মাইকেলের উদ্দেশে চোখ রাঙালেও, বৃদ্ধের দিকে ফিরে অমায়িক হাসল রানা, অনেক আগেই অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। হাত নেড়ে, আকার-ইঙ্গিতে পাল্টা একটা প্রস্তাব দিল ও, ওর উদারতা লক্ষ করে রাগে-দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল মাইকেলের।

গোত্রপ্রধানকে রানা জানিয়ে দিল, চারটে বিয়ে করবার অধিকার পেয়ে যারপরনাই খুশি সে। তবে আরও বেশি খুশি সে কামাল হাসানকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে। তাই তার পাওনা চারটে বিয়ে করবার অধিকার সে গোত্রপ্রধানকে দান করতে চায়। রানাকে আগেই জানানো হয়েছে কামাল হাসানের যুবতী স্ত্রীর সংখ্যা এত বেশি যে হঠাৎ কেউ গুণতে চাইলে তার ভুল হয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বন্ধুর ঔদার্যে আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না কামাল হাসান, রানাকে টেনে প্রায় কোলে তুলে ফেললেন।

পরিবেশে উত্তেজনা আর আনন্দের খোরাক এত বেশি যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তুলতে মাইকেলও লজ্জা পেল। কয়েক ঘণ্টা ধরে অনেকগুলো প্রশ্ন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তার জিভ পুড়িয়ে দিচ্ছে। শেষমেশ বলে ফেলল, ‘চকলেট, ওল্ড বয়, আমাদের জন্যে টাকা-পয়সা সব রেডি করে রেখেছ তো?’

মনে হলো মাইকেলের কথা শুনতে পায়নি প্রিন্স সালে, তবে

তার গ্লাসটা শ্যাম্পেনে ভরে দিল সে, তারপর রানার একটা কৌতুক অনুবাদ করে শোনানোর জন্য ঝুঁকে পড়ল তার বাবার দিকে। অগত্যা বাধ্য হয়ে তার একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরতে হলো মাইকেলকে।

হিস হিস করে বলল সে, 'টাকার কথা বলছি, চকলেট। সব বুঝে পেলে আর তোমাদের কষ্ট দিতে চাই না। কাল ভোরে নাচ-গানের মাধ্যমে তোমরা আমাদের বিদায় দেবে, কী?'

'প্রসঙ্গটা তোলায় সত্যি আমি খুশি হলাম,' চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স সালে, খুশির ভাবটুকু ছাড়া আর সব কিছুই রয়েছে তার চেহারায়। 'কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা দরকার।'

'দেখো, চকলেট, ওল্ড বয়, এটা আলোচনার কোন ব্যাপার নয়। আলোচনা যা হবার তা অনেক আগেই হয়ে গেছে।'

'মাথা গরম কোরো না, প্লিজ। আমি তোমাকে উদ্বিগ্ন হতেও নিষেধ করছি।'

দেনাদার টাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে উদ্বিগ্ন বোধ করা মাইকেলের একটা স্বভাব। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলোচনার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে টাকা শোধ না দিয়ে পারা যায়। কঠিন ভাষায়, চড়া গলায় প্রতিবাদ করতে যাবে মাইকেল, এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করলেন কামাল হাসান।

উঠে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু তাঁর পা কাঁপতে লাগল, মনে হলো টলে পড়ে যাবেন।

'আরেকটু কম খাওয়ালেও পারতে!' গম্ভীর, অসন্তুষ্ট চেহারা নিয়ে অভিযোগ করল প্রিন্স সালে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাইকেলের দিকে।

শুধু কাঁধ ঝাঁকাল মাইকেল, কোন জবাব দিল না, কারণ ইতিমধ্যে ভাষণ শুরু হয়ে গেছে।

দু'জন গার্ড শক্ত করে ধরে রাখল কামাল হাসানকে। তিনি কাঁপছেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে কথা বলে গেলেন। অবশ্য শেষ দিকে তাঁর গলা ভাবাবেগে বুজে এল। তাঁর ভাষণ বিদেশী অতিথিদের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করল প্রিন্স সালে।

প্রথম দিকে, রানার মনে হলো, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান তাঁর বক্তব্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। প্রথম সূর্য-রশ্মির পাহাড়চূড়া স্পর্শ করবার কথা বললেন তিনি, বললেন ভরদুপুরে মরু-বাতাসের একখানি পা যখন একজন মানুষের মুখে পড়ে তার কী অনুভূতি হয়, তারপর তিনি ওদেরকে মনে করিয়ে দিলেন ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই প্রথম সন্তানের কান্না তার বাপের কানে কী রকম শোনায়, আরও স্মরণ করতে বললেন, লাঙ্গলের আঘাতে এলোমেলো হওয়া মাটির গন্ধ। ধীরে ধীরে অবিশ্বাস্য নিস্তব্ধতা নেমে এল গুহার ভিতর, সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে বক্তব্য শুনছে তাঁর।

এই পর্যায়ে আপন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন কামাল হাসান, ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিলেন গার্ডদের হাত, এখন আর তিনি টলছেনও না। তাঁর কণ্ঠস্বর আবেদন আর আবেগে ভরে উঠল। প্রিন্স সালে অনুবাদ না করলেও রানার বুঝতে অসুবিধে হত না যে গোত্রপ্রধান পুরুষমানুষের গর্ব এবং তার স্বাধীনতা ভোগ করবার অধিকার নিয়ে কথা বলছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন, একজন সত্যিকার পুরুষ কি তার সেই স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দেবে না? প্রাণ দেবে না তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয় বন্ধু, স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের জন্য?

'খবর এসেছে শিফটারা এবার হামলা চালাবে বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে। তারা নাকি এবার শুধু লুঠপাট করেই ফিরে যাবে না, আমাদের এই প্রিয় জন্মস্থান দখল করে নিজেদের কব্জায়

রাখতে চায়। শোনা যাচ্ছে ছয় ডজন মেশিনগান, তিন ডজন মর্টার, দশ-বিশটা ট্যাংক আর হাজার হাজার রাইফেল নিয়ে রওনা হয়ে গেছে তারা। হ্যাঁ, ওরা শক্তিশালী। কিন্তু বাছারা, আমার প্রিয় শিষ্যরা, আমরাও অসহায় বা শক্তিহীন নই। খোদার অপার মেহেরবাণী, বিদেশী সাহায্য আমরাও পেয়েছি। তারা আমাদের জন্যে যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে এসেছেন, তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবেন। শত্রুদের দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে…।'

কী? ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। বিদেশী সাহায্য? মর্টার, মেশিনগান, ট্যাংক–ডজন ডজন? হাজার হাজার রাইফেল? সঙ্গত কারণেই হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। হঠাৎ করে একটা অপরাধবোধ জাগল মনে। অস্ত্রের যে চালান ওরা আদিবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছে সে-সব ওদের প্রায় কোন কাজেই আসবে না। জানে, ওরা চলে যাবার এক হপ্তার মধ্যে অচল হয়ে পড়বে আর্মারড কারগুলো, কামাল হাসানের অনুসারীরা লৌহমানবীদের মেজাজের সঙ্গে কোনভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে না নিজেদের। তা ছাড়া, ট্যাংক বা মর্টারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওগুলোর কর্ম নয়।

শংকিত বোধ করল রানা। বোকার মত এ কোথায় এসে পড়েছে ও, যেখানে প্রায় নিরস্ত্র একটা গোষ্ঠী অশুভ শক্তির কাছে মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে? কোন সন্দেহ নেই, এটাই হবে কামাল হাসান আর তাঁর প্রজাদের শেষ যুদ্ধ।

তারপর রানা নিজেকে বুদ্ধি দিল, ভুলে যাও। এটা ওদের যুদ্ধ, ওরাই সামলাক। এভাবেই তো হাজার হাজার বছর ধরে অত্যাচার সহ্য করছে ওরা, তোমার একার সাধ্য কী ওদের বাঁচাতে পারো। এই সময় ওর চোখ পড়ল দূরে বসা অ্যানি উইসপারের দিকে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে, চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে, কামাল

হাসানের ভাষণ যেন গিলছে সে, পাশে বসা রাহেলা বানুর একটা কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে।

অ্যানিও বুঝতে পারল, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। ঘাড় ফেরাল সে, চোখাচোখি হলো দু'জনের। মৃদু হেসে, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল সে, যেন বলতে চাইল রানা কী ভাবছে বুঝতে পেরেছে।

পাওনা টাকা নিয়ে চলে যাবে তুমি? নিজেকে প্রশ্ন করল রানা। অসহায় লোকগুলোকে বিপদের মধ্যে ফেলে? অ্যানি উইসপারকে রেখে? জানা কথা, ওদের সঙ্গে অ্যানিকে ফিরে যেতে বাধ্য করা যাবে না। তার জন্য এখানে একটা রিপোর্ট তৈরি হতে যাচ্ছে, এরইমধ্যে তার জড়িয়ে পড়া সম্পূর্ণ হয়েছে, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে সে। আর শেষটা যে কী রকম হবে ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারছে রানা।

বুদ্ধিমানের কাজ হবে ফিরে যাওয়া, বোকামি হবে আরেকজনের যুদ্ধ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া, শুরু হবার আগেই যে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে।

হঠাৎ থামলেন বৃদ্ধ কামাল হাসান, মৃদু হাঁপাচ্ছেন তিনি, ঘামে চকচক করছে তাঁর মুখ। শ্রোতারা এখনও তাঁর দিকে সম্মোহিতের মত অপলক তাকিয়ে আছে। গলা চড়িয়ে একটা নির্দেশ দিলেন গোত্রপ্রধান, দু'ধারী একটা তরোয়াল চলে এল তাঁর হাতে, ফলাটা লম্বা আর নগ্ন। পরমুহূর্তে কোত্থেকে যেন অনেকগুলো ড্রাম নিয়ে আসা হলো, বেজে উঠল রণডঙ্কা। প্রথমে এল কামাল হাসানের পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী ড্রাম। শুধু বড় ধরনের যুদ্ধ বা উৎসবের সময় বের করা হয় ওটা, শত শত বছর ধরে বংশপরম্পরায় হাতবদল হয়ে কামাল হাসানের হাতে পড়েছে। মাগডালায় নেপিয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বাজানো হয়েছে এই ড্রাম,

বাজানো হয়েছে অ্যাডোয়ায় ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসহ আরও কয়েকশো যুদ্ধের সময়।

একেকটা ড্রাম কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, ড্রামাররা ড্রামের ব্যারেল নিজেদের দুই হাঁটুর মাঝখানে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে গম্ভীর আর ভরাট আওয়াজ যে ড্রামের সেটা মন্থরগতি একটা ছন্দের সঙ্গে বাজতে লাগল, বাকি ড্রামগুলো একজোড়া ভরাট শব্দের মাঝখানে গুড়-গুড় আওয়াজ তুলল। ক্রমেই দ্রুত হলো ছন্দ, সেই সঙ্গে আরও ভরাট হয়ে উঠল আওয়াজ। কাঁপতে শুরু করল মাটি, ধাক্কা লাগল বুকে। তারপর মনে হলো গোটা দুনিয়া ড্রামের উন্মাদ করা গর্জনে ঝাঁকি খাচ্ছে। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। লক্ষ করল, ড্রামের তালে তালে দুলতে শুরু করেছে আদিবাসীদের মাথা আর কাঁধ।

তরোয়ালের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন কামাল হাসান। তাঁর মাথাটাও নুয়ে পড়েছে তরোয়ালের হাতলের উপর। ড্রামের ছন্দ এক সময় তাঁকে নাড়া দিল, ঝাঁকি খেতে শুরু করল তাঁর কাঁধ, তারপর হঠাৎ তিনি এক ঝটকায় উঁচু করলেন মাথা। সাদা একটা পাখি যে ভঙ্গিতে উড়াল দেয়, ঠিক সেভাবে লাফ দিয়ে ড্রামারদের সামনে পড়লেন, বিশাল তরোয়ালটা মাথার উপর বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে নাচতে শুরু করলেন।

প্রিন্স সালের একটা কব্জি চেপে ধরল মাইকেল, ড্রামের বজ্র-নিনাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য গলা চড়াল, ফিরে গেল ব্যবসা সংক্রন্ত আলোচনায়। 'চকলেট, তুমি আমাকে টাকা প্রসঙ্গে কী যেন বলছিলে।'

তার কথা শুনতে পেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, প্রিন্স সালে কী বলে শুনতে চায়। কিন্তু প্রিন্স সালে চুপ করেই থাকল, বাবার

লম্ফঝম্প তার মনোযোগ ধরে রেখেছে।

'অক্ষত অবস্থায় আমরা তোমাকে মাল ডেলিভারি দিয়েছি, ওল্ড বয়। চুক্তি চুক্তিই, কী?'

'আশি হাজার পাউন্ড,' থমথমে চেহারা নিয়ে বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স সালে।

'হ্যাঁ,' একমত হলো মাইকেল।

'বিপজ্জনক একটা অংক,' প্রিন্স সালের গলা আরও খাদে নেমে গেল। 'এরচেয়ে আরও অনেক কম টাকার জন্যে কত মানুষ খুন হয়েছে।'

ওরা কোন মন্তব্য করল না।

'বুঝতেই পারছ আমি তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছি,' বলে চলল হাসান সালে। 'তোমাদের নিরাপত্তা আর আমার গোত্রের অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা। দেখাশোনার জন্যে একজন মেকানিক না থাকলে, কী দাম গাড়িগুলোর? নতুন অস্ত্র কীভাবে চালাতে হয় তা যদি আমার লোকদের শেখানোর জন্যে কেউ না থাকে, কী হবে ওগুলো দিয়ে? পুরো টাকাটাই কি পানিতে ফেলা হবে না?'

'তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে—সত্যি হচ্ছে, ওল্ড বয়,' নিশ্চয়তা দিয়ে বলল মাইকেল। 'প্যারিসের কাফে রয়্যালে বসে ডিনার খাওয়ার সময় তোমার জন্যে চাই কি দুফোঁটা চোখের পানি ফেলতেও আমি রাজি আছি। তবে কি জানো, এ-সব কথা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

'আরে, কী বলো, ভাবিনি মানে? মাই ডিয়ার মাইকেল, বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ সময় গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছি আমি।' এই প্রথম মাইকেলের দিকে ফিরল প্রিন্স সালে, হাসল নিঃশব্দে।

‘ভেবেছি, দুনিয়ার কোথাও এমন বোকা নেই যে ইথিওপিয়ার বন-জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ী এলাকায় এসে, সাথে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নিরাপদে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারে–কামাল হাসানের ব্যক্তিগত অনুমতি এবং প্রোটেকশন ছাড়া।’

দু’জনেই ওরা তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

‘টাকা নিয়ে কোন দিকে যেতে চাও তোমরা? রাজধানী আদ্দিস আবাবার দিকে? পথে গেরিলারা আছে, জানো? যদি ভেবে থাকো ওরা তোমাদের জামাই আদর করবে, ভুলে যাও। টাকা তো টাকা, প্রাণটাও হারাতে হবে। তা ছাড়া শুধু কি গেরিলা, ওদিকে শিফটাদেরও ছোট ছোট দল আছে–স্রেফ আগুনে পুড়িয়ে তোমাদের খেয়ে ফেলবে–হ্যাঁ, এখনও একটু অসভ্য রয়ে গেছে লোকগুলো। ভুলে যেয়ো না, তোমরা আফ্রিকায় রয়েছ।’

‘ওরা জানবে, অবশ্যই, তাই না?’ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আমার ভয় হচ্ছে, অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবরটা ওরা পেয়েও যেতে পারে,’ রানার দিকে ফিরল প্রিন্স সালে।

‘আর আমরা যদি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে যেতে চাই?’

‘পায়ে হেঁটে মরু পেরোনো কি সম্ভব?’ হাসল হাসান সালে।

‘পাওনা টাকা পেলে তা থেকে উট কেনার জন্যে খরচ করতে পারব,’ সম্ভাবনার কথা বলল রানা।

‘আমার সন্দেহ হচ্ছে, মাইকেল,’ কলেজ জীবনের বন্ধুর দিকে ফিরল প্রিন্স, ‘উট কেনা তোমাদের জন্যে সাংঘাতিক কঠিন হবে। আমার আরও সন্দেহ হচ্ছে, সোনালি টহল পুলিশকেও তোমাদের ফেরার কথা জানানো হবে।’

ওরা দেখল বৃদ্ধ কামাল হাসান এখনও বিপুল বিক্রমে ড্রামারদের মাথার ছ’ইঞ্চি উপরে বন বন করে তরোয়াল

ঘোরাচ্ছেন।

'গড!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মাইকেল। 'তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম, চকলেট। মানে কথার মূল্য আর মর্যাদা, পুরনো বন্ধুর ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি...।'

'মাই ডিয়ার মাইকেল, অত্যন্ত দুঃখের সাথে তোমাকে আমি মনে রাখতে বলছি, এটা ইটনের খেলার মাঠ নয়।'

'তবু ঘুণাক্ষরেও আমি ভাবিনি তুমি আমার টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করবে।'

'ওহ্ ডিয়ার, কী লজ্জা! মাইকেল, আমি তোমার টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করছি না! যদি চাও এখুনি, এই মুহূর্তে তোমার টাকা তুমি পেতে পারো।'

'ঠিক আছে, প্রিন্স,' বাধা দিল রানা, 'বলো আর কী চাও তুমি আমাদের কাছে? খোলাখুলি বলো, টাকা নিয়ে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার নিরাপদ কোন উপায় সত্যি আছে কি?'

স্মিত হেসে রানার হাতে মৃদু চাপড় মারল প্রিন্স। 'হুজ্জুত-হাঙ্গামা পছন্দ করো না, সত্যিকার কাজের মানুষ, তোমাকে আমার ভারি পছন্দ...।'

'আমি একটা প্রশ্ন করেছি,' বিরক্তবোধ করল রানা।

'তোমরা যদি দু'মাসের একটা চুক্তিতে আমাদের সাথে কাজ করো, আমার বাবা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।'

'দু'মাস কেন?' কারণটা কী শুনতে চাইল মাইকেল।

'ততোদিনে হয় আমরা হারব নয়তো জিতব।'

'বলে যাও,' রানার তাগাদা।

'এই দু'মাস তোমরা তোমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে ব্যবহার করবে—শেখাবে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা বড়

বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে কীভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। গাড়িগুলোর রক্ষাবেক্ষণ, মেরামত এবং চালানোর দায়িত্ব নেবে...।'

'তার বদলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাজকীয় বেতন, ইথিওপিয়া থেকে নিরাপদে ফিরে যেতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি। টাকাগুলো আগেই লন্ডনের একটা ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়া হবে তোমাদের নামে।'

'রাজকীয় বেতন বলতে কী বোঝাতে চাও?' তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইল মাইকেল। 'জল্লাদের ছোরার নীচে মাথা পেতে দেব, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ কী হতে পারে?'

'লক্ষ করেছ, আমাদের এক একটা মেয়ের গায়ে কী পরিমাণ সোনা আছে?' হাসল প্রিন্স। 'বেতন পাবে টাকায়–প্রতি মাসে ত্রিশ হাজার পাউন্ড। সাথে করে নিয়ে যাবে এক সের সোনা। এটা আমাদের কোষাগার থেকে দিতে হবে না, প্রজারাই দান করবে।'

ঢিল পড়ল দু'জনের পেশীতে, নিজেদের মধ্যে দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় হলো।

'ষাট হাজার পাউন্ড, এক সের সোনা–প্রত্যেকে?' রুদ্ধশ্বাস মাইকেলের প্রশ্ন।

'প্রত্যেকে,' বলল হাসান সালে।

'চুক্তিপত্র তৈরি করার জন্যে আমার লইয়ারকে পাওয়া গেলে ভাল হত,' খেদ প্রকাশ করল মাইকেল।

'তার দরকার নেই,' হেসে উঠল প্রিন্স সালে, মাথা নাড়ল, আলখেল্লার ভিতর হাত গলিয়ে বের করে আনল দুটো এনভেলাপ। 'ব্যাংকের গ্যারানটি দেয়া চেক–লন্ডনের লয়েডস ব্যাংক। ডিজ-অনার হওয়ার কোন আশংকাই নেই, তবে তারিখ দেয়া আছে দু'মাস পরের।'

কৌতূহলের সঙ্গে চেক দুটো নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল মাইকেল। সত্যি তাই, আজ থেকে দু'মাস পরের তারিখ লেখা রয়েছে। এরপর সে টাকার অংকটা দেখল। প্রতিটি ষাট হাজার পাউন্ডের চেক। ঝট করে মুখ তুলল সে। 'কিন্তু আমাদের আর্মস আর ভেহিকেলের দাম?'

আলখেল্লার ভিতর থেকে আরও দুটো এনভেলাপ বের করল প্রিন্স সালে, তার চেহারায় হাসির বহর দেখে মনে হলো ওদের সঙ্গে সময় নিয়ে খেলছে সে। নতুন দুটো চেকও পরীক্ষা করল মাইকেল। একটায় আর্মসের দাম দেওয়া হয়েছে, অপরটায় ভেহিকেলের।

'সন্তুষ্ট?' তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল হাসান সালে।

'আর সোনা?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল মাইকেল। 'এ-ব্যাপারে তোমার প্রস্তাব কী হবে?'

'বললাম না, ওগুলো তোমরা যাবার সময় সাথে করে নিয়ে যাবে?'

'কিন্তু, ধরো, যুদ্ধে তোমরা হেরে গেছ–কার কাছ থেকে চাইব?' মনের আশংকা প্রকাশ করল মাইকেল।

'বলতে চাইছ যদি আমরা মারা যাই?' হাসান সালে গম্ভীর। 'আমরা মারা গেলেও তোমরা বেঁচে থাকবে, এমন কোন নিশ্চয়তা তুমি দিতে পারছ?'

'তোমার এই স্বভাবটা কিন্তু ইটনে আত্মপ্রকাশ করেনি,' বলল মাইকেল। 'কথার প্যাঁচ দেখছি ভালই শিখেছ। ওসব ধানাইপানাই বাদ দিয়ে পরিষ্কার করে বলো, সোনা ঠিক কবে পাব আমরা।'

'সংগ্রহ করতে যে ক'দিন লাগে,' বলল প্রিন্স। 'এই ধরো এক দেড় হপ্তা। ওগুলো তোমাদের কাছেই থাকবে, যাবার সময় নিয়ে

যাবে।’

সবিস্ময়ে রানার দিকে ফিরল মাইকেল। ‘নির্দিষ্ট তারিখ, নির্দিষ্ট টাকার অংক–বুঝতে পারছ, ওল্ড চ্যাপ? চকলেট সালে সব আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছিল। চিন্তা-চেতনার দিক থেকে কয়েক হপ্তা এগিয়ে ছিল আমাদের চেয়ে। এ-সম্পর্কে তোমার বিচক্ষণ মন্তব্য শুনতে পেলে খুশি হতাম।’

‘আমি বলব, এভাবে ব্ল্যাকমেইলিঙের পথ না ধরলেও চলত,’ শান্তকণ্ঠে বলল রানা। ‘প্রিন্সের উচিত ছিল মানবিকতার দোহাই দিয়ে সাহায্য চাওয়া। অন্তত আবেদন জানিয়ে দেখতে পারত আমরা কী করি।’

প্রিন্সের দিকে ফিরল মাইকেল। ‘গুড গড, চকলেট!’ তার বিস্ময় এখনও কাটেনি। ‘আমি আতংকিত ও হতভম্ব! আমি স্তম্ভিত!’

‘তার মানে কি তুমি প্রত্যাখ্যান করছ, মেজর সেভারস্?’

চট করে আরেকবার রানার দিকে তাকাল মাইকেল, সম্মতির একটা নিঃশব্দ বার্তা বিনিময় হলো। নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মাইকেল। ‘বলতে বাধ্য হচ্ছি, মাদ্রিদে আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সময় মত পৌঁছুতে না পারলে বিজনেসটা হারাব। কিন্তু…,’ থেমে ব্যাংকের চেকগুলোর উপর আবার একবার চোখ বুলাল সে, ‘…কিন্তু বিজনেস আর যুদ্ধ দুটো প্রায় একই ব্যাপার–আরও কথা হলো, তুমি আমাকে শক্তিশালী কিছু হেতু দিয়েছ থেকে যাওয়ার পক্ষে।’ মানিব্যাগটা পকেট থেকে বের করে চেকগুলো সযত্নে রাখল তাতে। ‘তারমানে কিন্তু এই নয় যে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আমার বিস্ময় আর আতংক তিল পরিমাণ কমল।’

‘আর তুমি, মি. রানা?’ জানতে চাইল প্রিন্স।

কী বলবে রানা? বলবে এই আনাড়ি, অসভ্য, অশিক্ষিত জংলীগুলোকে তার ভাল লেগে গেছে? বলবে অত্যাচারিত অসহায় একটা জনগোষ্ঠির মাঝখানে হঠাৎ এসে পড়ে, তাদের বিপদ বুঝতে পেরে, তার মহৎ হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে? ম্লান, বিষণ্ন একটু হেসে শুধু মাথা ঝাঁকাল ও, বলল, 'আমার পার্টনার যা বলল আমি তার সাথে একমত।'

মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স, আর তারপরই তার হাবভাব বদলে গেল, চেহারায় ফুটে উঠল ঠাণ্ডা নিষ্ঠুর একটা ভাব। 'আমি তোমাদেরকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, দয়া করে বোকার মত চুক্তির সময় পেরোনোর আগেই ইথিওপিয়া ত্যাগ করার চেষ্টা কোরো না। আমার বাবার প্রশাসন সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই, কথার সামান্য হেরফের হলেও জ্যান্ত কবর দেয়ার রীতি এখনও তিনি চালু রেখেছেন।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আলোচ্য ভদ্রলোক মাথার অনেক উপরে তুলে ধরলেন তাঁর তরোয়াল, তারপর সবেগে নামিয়ে এনে দু'পায়ের মাঝখানে নরম মাটিতে ঘ্যাঁচ করে গাঁথলেন ডগাটা। তরোয়ালের হাতল ছেড়ে দিলেন তিনি, গায়ে আগুনের প্রতিফলন নিয়ে কাঁপতে লাগল লম্বা ফলাটা, হোঁচট খেতে খেতে তাঁর নিজের জায়গায় অর্থাৎ রানা আর মাইকেলের মাঝখানে ফিরে এলেন।

দু'জনের কাঁধে হাড্ডিসার হাত রেখে নিজের পাঁজরের সঙ্গে ওদেরকে চেপে ধরলেন কামাল হাসান, চিৎকার করে বললেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

দম ফেলবার ফুরসৎ পেয়েই চোখ কুঁচকে বৃদ্ধের দিকে তাকাল মাইকেল। 'রামি খেলায় আপনার ভাগ্য খুলে যেতে পারে, শিখবেন নাকি, ওল্ড বয়?' দু'মাস যথেষ্ট লম্বা সময়, একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত

থাকা দরকার, আর সেটা থেকে যদি কিছু লাভের মুখ দেখা যায়, মন্দ কী?

বারো

গুরুগম্ভীর ড্রাম পেটানোর শব্দে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠছে কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠে পাশ ফিরল সে, শুনল কিছুক্ষণ, ভরাট একঘেয়ে আওয়াজ আর মৃদু কাঁপুনি তার কাছে পৃথিবীর পালস্ বলে ভ্রম হতে লাগল। পুরোপুরি সজাগ হলো অকস্মাৎ, একলাফে বিছানা থেকে নেমে তাঁবুর ভিতর সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ছুটোছুটি শুরু করল। ড্রাম পেটানোর এই বিশেষ ছন্দটা তার অত্যন্ত পরিচিত, আদিবাসীরা যুদ্ধযাত্রার সময় বাজায়।

কাউন্টের আর্তনাদ শুনে আশপাশে যারা ছিল তাদের সবার ঘুম ভেঙে গেল। বানানটো সাতা তাঁবুর ভিতর ঢুকে যত না লজ্জা পেল তারচেয়ে বেশি পেল ভয়। তাকে দোষ দেওয়া যায় না, এ-ধরনের একটা দৃশ্য দেখে যে কেউ লজ্জা আর ভয় দুটোই পাবে। সাতা দেখল তার প্রভু সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তাঁবুর মাঝখানে সঙের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখ বিস্ফারিত, এক হাতে হাতির দাঁতের তৈরি বাঁটসহ বেরেটা, অপর হাতে অলংকৃত ছোরা।

ড্রামের শব্দ শুরু হওয়ামাত্র দেরি করেনি মেজর লুইগি রাকা, কাউন্টের তাঁবুর দিকে রওনা হয়ে গেছে, কারণ তার জানা আছে ভাঁড়টার কাছ থেকে ঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করা যায়। তাঁবুতে ঢুকে কর্নেল ডিকানডিয়াকে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় পেল সে। কাউন্ট ইতিমধ্যে পঞ্চাশজন বডিগার্ডকে ঘুম থেকে তুলে নিজের পাহারায় নিয়োগ করেছে। রোলস-রয়েস স্টার্ট

দেওয়া হয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে তাতে চড়ে বসবে কাউন্ট।

মেজরকে দেখে মোটেও খুশি হতে পারল না সে, তার ইচ্ছে ছিল লোকটা বাধা দেওয়ার জন্য এসে পৌঁছুনোর আগেই বিপজ্জনক এলাকা ছেড়ে কেটে পড়বে। ইচ্ছেটা আগের মতই জোরাল থাকল, দু'সেকেন্ড চিন্তা করে একটা অজুহাত খাড়া করতে হলো তাকে, এই যা। 'মেজর, তুমি এসে ভালই করেছ। শোনো, কমান্ড করার অধিকার তোমার ওপর ছেড়ে যাচ্ছি আমি। সশরীরে উপস্থিত হয়ে জেনারেল ফাদকে রিপোর্ট করতে আসমারায় যাচ্ছি আমি।' কথা শেষ করবার আগেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, অপেক্ষারত গাড়ির দিকে এগোল।

তার পথরোধ করল মেজর রাকা, ঠকাস করে স্যালুট ঠুকে গোপন করবার চেষ্টা করল তার উদ্দেশ্য। 'মাই কর্নেল, ওয়েলস অভ চাল্ডির ডিফেন্স আমরা সম্পূর্ণ করেছি,' রিপোর্ট করল সে। 'গোটা এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, আমরা সবাই এখানে নিরাপদ।'

'জেনারেল ফাদকে আমি রিপোর্ট করব, আমাদের চেয়ে বিশগুণ সৈন্য নিয়ে হামলা করেছে শত্রুপক্ষ,' গর্জে উঠল কাউন্ট, মেজরের বগলের তলা দিয়ে বাউলি কেটে গাড়ির দিকে এগোতে চেষ্টা করল সে।

দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে কাউন্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিল মেজর রাকা। তারপর এক পা সামনে বাড়ল সে। 'আপনার বাহিনী নিরাপদ পজিশন নিয়ে রয়েছে, সবাই সুস্থ এবং উৎসাহী...।'

'আমার অনুমতি দেয়া থাকল, যখন দেখবে রক্তপিপাসা নিয়ে শত্রুপক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, দেরি না করে প্রত্যাহার করে নিয়ো বাহিনীকে।' কাউন্টের তরফ থেকে এটা একটা ঘুষ বা

টোপ, যুদ্ধ না করে পালানোর লোভ দেখাচ্ছে। তারপরই সে মেজরকে পাশ কাটিয়ে রোলস-রয়েসের নাগাল পাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু মেজর রাকা মামবার মতই ক্ষিপ্রগতি, এক লাফে আবার কাউন্টের সামনে চলে এল। এভাবেই শুরু হলো ব্যাপারটা। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা অফিসার আর সৈনিকরা অবাক বিস্ময়ে দেখল কাউন্ট আর মেজর পালা করে লাফ দিয়ে একবার সামনে বাড়ছে, একবার পিছু হটছে, ঠিক যেন একজোড়া শিকারী মোরগের লড়াই চলছে দু'জনের মধ্যে। জনসমর্থন অবশ্য কাউন্টের তরফেই ভারি, কারণ ভাড়াটে সৈনিকরা যুদ্ধ না করলেও বেতন পাবে, আর শিফটা সৈনিকরা ডাকাতি করতে অভ্যস্ত, যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা তাদের নেই। কাউন্ট গাড়ি নিয়ে পালাতে সমর্থ হলে, তার পিছু নিয়ে তারাও ভেগে যেতে পারে।

'কোথায় শত্রু? ড্রাম যখন বাজছে, কিছু লোকজন থাকতে পারে ওদিকে,' বলল মেজর রাকা, 'কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে আসছে বলে মনে হয় না।' কাউন্টের হম্বিতম্বি তার ধমকে চাপা পড়ে গেল। 'সে যাই হোক, এই মুহূর্তে আমার কর্নেলকে আমি বাহিনী ছেড়ে কোথাও যেতে দিতে পারি না। শিফটা সৈনিকরা আপনাকে ভয় পায়, আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনার বীরত্বের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। শত্রু হামলা করুক বা না করুক, বিজয় আমাদেরকে ছিনিয়ে আনতে হবে, কাজেই আপনার শারীরিক উপস্থিতি এবং কমাণ্ড একান্ত দরকার আমাদের।' কথা বলছে, সেই সঙ্গে এক পা এক পা করে সামনে বাড়ছে মেজর। 'সত্যি যদি আক্রমণ হয়ই, কাউন্ট তথা নেতৃত্ববিহীন থার্ড ব্যাটালিয়ান এতিম হয়ে পড়বে, তখন কে তাদেরকে পথ দেখাবে?' পিছু হটতে হটতে হঠাৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছুল কাউন্ট, ব্যাপারটা তার জন্য অপমানকর হয়ে

দাঁড়াচ্ছে, কাজেই সে এবার দাঁড়িয়ে পড়ল, ফলে বিশালদেহী মেজরের পেট তার পেটের সঙ্গে এক হলো, প্রায় এক হলো দুটো নাকও। 'ভুলে গেলে চলবে না, এটা ফরম্যাল কোন যুদ্ধ নয়। আমরা এমনকী কোন দেশেরও প্রতিনিধিত্ব করছি না। তাই দুর্নাম, পরাজয়, দুর্ভোগ যদি কপালের লিখন হয়–কর্তাব্যক্তির সাথে একযোগে ভাগ করে নেয়ার পক্ষপাতী আমরা।'

দাঁড়িয়ে পড়বার সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল, উপলব্ধি করে আবার পিছু হটতে গেল কাউন্ট, অনুভব করল তার পিঠে কী যেন ঠেকছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সৈন্য বোঝাই একটা ট্রাক রয়েছে পিছনে।

'ওরা ভাড়াটে সৈনিক, আমার বাছাই করা,' ফিসফিস করে বলল মেজর। 'রোলস-রয়েস কোথাও যাচ্ছে দেখলে ওই ট্রাক নিয়ে ধাওয়া করবে ওরা। অনুমতি দেয়া আছে, থামাতে না পারলে গাড়িটার ওপর দিয়ে চালানো হবে।'

কাউন্ট চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল, 'বিদ্রোহী! নরাধম! আমি তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব!'

মেজর যেন কাউন্টের কথা শুনতে পায়নি। 'আর এক ঘণ্টা পর ভোর। দিনের আলো ফুটলে পরিস্থিতি আঁচ করা সম্ভব হবে।'

এই সময় ড্রামের আওয়াজ থেমে গেল। উপত্যকার উপরদিকে গোত্রপ্রধান বৃদ্ধ কামাল হাসান প্রতিরক্ষাসূচক নৃত্য থামিয়েছেন। নিস্তব্ধতা নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কাউন্ট ডিকানডিয়ার চেহারা, শিরদাঁড়া খাড়া করে সিধে হলো। রক্তচক্ষু মেলে মেজরের দিকে তাকাল সে। 'মেজর রাকা! বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চিও পিছু হটব না আমরা। থার্ড ব্যাটালিয়ানকে নির্দেশ দাও, সামনের সমস্ত বাধা খড়-কুটোর মত উড়িয়ে দিয়ে

অগ্রসর হতে হবে। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী! মেজর ভিটোরা, এখানে উপস্থিত ডিটাচমেন্টের কমান্ড তোমার হাতে তুলে দেয়া হলো। বাধার প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে ওদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হও তুমি। বাকি সবাই আমার চারপাশে থাকো। সবাই দেখো, আমার যুদ্ধযাত্রা শুরু হলো।'

সশস্ত্র সৈনিকদের তৈরি ঘেরের মধ্যে অবস্থান নিয়ে উপত্যকা থেকে নামতে শুরু করল কাউন্ট। নীচের দিকে আগেই মেজর রাকার তত্ত্বাবধানে মেশিনগান আর মর্টার বসানো হয়েছে।

কামাল হাসানের অসংখ্য সহিসের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটার বয়স মাত্র পনেরো। আগের দিন গোত্রপ্রধানের প্রিয় একটা ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিল সে, রশি ছিঁড়ে ছুট দেয় ঘোড়া, গিয়ে পড়ে খাঁ খাঁ মরুতে। পুরোটা দিন আর রাতের অর্ধেকটা ঘোড়ার পিছু পিছু চক্কর খায় ছেলেটা, অবশেষে ক্লান্ত ঘোড়ার লম্বা রশিটা নাগালের মধ্যে পায় সে।

সারাদিন খাওয়া নেই, রোদের মধ্যে ছুটোছুটি করেছে, তার উপর রাতের ঠাণ্ডা বাতাস, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেচারা একেবারে নেতিয়ে পড়ল। বাহনের কেশর ধরে ঘাড়ের উপর মাথা রাখল সে, ঘুম এসে গেল চোখে। জানে একবার যখন ধরা দিয়েছে, পথ চিনে নিজেই পানির কাছে পৌঁছে যাবে তার ঘোড়াটা। কিন্তু ওটা যে হাঁটতে হাঁটতে শত্রুঘাঁটির ভিতর ঢুকে পড়বে তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

নার্ভাস একজন সেন্ট্রি হেঁড়ে গলায় চ্যালেঞ্জ করল, চমকে উঠে ছুট দিল ঘোড়া, সেই সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল সহিসের। অন্ধকারের ভিতর সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক আর সামরিক তাঁবুগুলোকে চিনতে পেরে ছানাবড়া হয়ে গেল তার চোখ। ঘোড়ার পিঠে লম্বা

হয়ে সেঁটে থাকল সে, আল্লাহ আল্লাহ করছে। তারার আলোয় চকচকে একটা স্তূপ দেখতে পেল। স্তূপটার একেবারে গা ঘেঁষে ছুটল ঘোড়া। জিনিসগুলো চিনতে পেরে দম বন্ধ হয়ে এল তার। একসঙ্গে এতগুলো রাইফেল এই প্রথম দেখল সে। ঘাঁটি থেকে বেরুবার মুখে হেলমেট পরা আরেকজন সেন্ট্রি চ্যালেঞ্জ করল তাকে। হাতের ফাঁক দিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই ঝলসে উঠতে দেখল রাইফেলের মাজল। সহিসের নিচু করা মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। পা আর হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পিঠে গুঁতো মারল সে।

গভীর নালায় সহিস যখন ফিরে এল, কামাল হাসানের বেশিরভাগ অনুসারী রাতব্যাপী উৎসব শেষে ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাদের অনেকে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়েছে ঘুমানোর একটা জায়গা পাবার আশায়, বাকিরা যেখানে বসে খেয়েছে সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। অল্প কয়েকজন যুবক অবশ্য তখনও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে, মাংস আর মদ দুটোই। আগুনের ধারে বসে আস্তে ধীরে খাচ্ছে তারা, স্বর্ণালংকার পরা যুবতী মেয়েদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে–সদ্য ঘুম থেকে উঠে সকালের নাস্তা তৈরি করতে বসেছে তারা।

গুহামুখের কাছে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে একজন প্রহরীর ঘাড়ে চড়াও হলো কিশোর সহিস। দু'জনেই ধরাশায়ী হলো সশব্দে। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ গলায় প্রলাপ বকতে শুরু করল সহিস। ভাগ্যিস উপস্থিত রয়েছে প্রিন্স হাসান সালে, কাজ হলো তার ধমকে।

ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মধ্যে মহা শোরগোল পড়ে গেছে। ঠিক কী দেখেছে সহিস তা একমাত্র প্রিন্স বুঝতে পারল, বাকিরা

যতটুকু শুনল তারচেয়ে বেশি নিজেদের মনমত বানাল। একদল আদিবাসী চিৎকার করে আরেক দলকে জানাল, এভাবে সবগুলো গুহা আর গোটা নালায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা, বিকৃত হয়ে। দেখতে না দেখতে গোটা এলাকা জুড়ে শুরু হয়ে গেল অবিশ্বাস্য ছুটোছুটি।

ঘুম থেকে জেগে উঠল সবাই, প্রতিটি পুরুষ যে যার অস্ত্রে সজ্জিত হলো। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও কৌতূহলী, এমনকী শিশুরাও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। ছোট বড় সব ক'টা গুহা থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল তারা, বেরিয়ে এল তাড়াহুড়োর সঙ্গে খাড়া করা তাঁবুগুলো থেকে। এমন একজন কেউ নেই যে ওদেরকে বুদ্ধি দেবে বা সতর্ক করবে, ভাল-মন্দ বিবেচনাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, ঝাঁক ঝাঁক মাছের মত সবাই একদিকে ছুটল।

একদিকে ছুটল একটা মাত্র উদ্দেশ্যে। ছড়িয়ে পড়া খবরটা সম্পর্কে সবাই যে যার বিজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করছে, তর্কেরও বিরাম নেই, এমনকী বুড়োরা পর্যন্ত শত্রুকে কীভাবে নিধন করবে অঙ্গভঙ্গি সহকারে বর্ণনা করতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। বোধবুদ্ধিহীন জনতার ঢল এগিয়ে চলেছে, হাঁটতে হাঁটতেই তারা কব্জিতে বেঁধে নিচ্ছে লাল কাপড়ের পট্টি, বর্শার ফলায় আঙুল ঠেকিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছে ধার, মান্ধাতা আমলের আগ্নেয়াস্ত্রে বুলেট ভরছে। মায়ের কোলে খিলখিল করে হাসছে শিশুরা, যারা হাঁটতে পারে তারা বড়দের চারদিকে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মশগুল, বুকে কাল্পনিক বর্শা নিয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। এভাবেই তারা ভাঙাচোরা এবড়োখেবড়ো নালা থেকে বেরিয়ে নেমে এল ওয়েলস অভ চান্ডির পিরিচ আকৃতির উপত্যকায়।

বড় গুহাটায় প্রিন্স হাসান সালে এখনও বিদেশীদের উদ্দেশে সহিসের গল্পটা ব্যাখ্যা করছে, উত্তর দিচ্ছে তাদের প্রশ্নের। গোত্রপ্রধান কামাল হাসানও উপস্থিত রয়েছেন, কিন্তু তিনি ঠিক

মনোযোগী হতে পারছেন না, কারণটা মাইকেলই ভাল বলতে পারবে। বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল একা শুধু রানা।

'শিফটারা যদি কুয়া দখল করতে এসে থাকে, ধরে নিতে হয় ওরা তৈরি হয়ে আছে। ওরা হামলা করার অজুহাত খুঁজছে, প্রিন্স। তোমার লোকদের কড়া নির্দেশ দাও, ভুলেও যেন ওদিকে কেউ না যায়। প্রথমে পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে আমাদের...।'

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভোরের প্রথম আভাস এখনও অস্পষ্ট, এ-সময়ের ক্ষীণ আলো মানুষের চোখের সঙ্গে ভৌতিক চাতুর্য নিয়ে খেলা করে—প্যারাপেটের কিনারায় উঁকি দিয়ে থাকা থার্ড ব্যাটালিয়ানের সেন্ট্রিরা দেখল অন্ধকারের ভিতর মানুষের একটা সচল পাঁচিল অসমান নালা থেকে উপত্যকায় বেরিয়ে আসছে। এখনও অস্পষ্ট, তবু শত শত মানুষের সম্মিলিত হৈ-হল্লাও শুনতে পেল তারা।

রাতে ড্রামের শব্দ যখন শুরু হয়, কালো শার্ট পরা অনেক সৈনিক যে যার ট্রেঞ্চের ফায়ারিং স্টেপ-এর নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ তার আগে সারাটা দিন মার্চ করে এখানে পৌঁচেছে তারা, তারপর গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। সেন্ট্রির দায়িত্ব পালন করছে ভাড়াটে সৈনিকরা, লাথি মেরে শিফটা সৈনিকদের ঘুম ভাঙাল তারা, ঠ্যালা-গুঁতো দিয়ে সবাইকে দাঁড় করাল প্যারাপেট বরাবর সার সার পজিশনে। চোখে ঘুম নিয়ে নীচের উপত্যকার দিকে তাকাল শিফটারা।

মেজর রাকা আর মেজর ভিটোরাকে নিয়ে থার্ড ব্যাটালিয়ানে পুরোদস্তুর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে খুব বেশি হলে ত্রিশ-বত্রিশজনের, বেশিরভাগই তারা ভাড়াটে সৈনিক। তাদের মধ্যে

কয়েকজন সেন্ট্রির দায়িত্ব পালন করছে, বাকি সবাইকে নিজের চারদিকে আটকে রেখেছে কাউন্ট ডিকানডিয়া। সদ্য ঘুম থেকে উঠবার পর শিফটারা হতচকিত, তা ছাড়া এমনিতেও তো রাতের শেষ প্রহরে মানুষের দেহ ও মনে সবচেয়ে বেশি জড়তার ভাব থাকে, তার উপর মরু থেকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করছে ওরা। ভোরের অনিশ্চিত উপত্যকার আলোয় বেরিয়ে আসা লোকগুলোকে মরুর বালির মত অগুনতি বলে মনে হলো, প্রতিটি লোক ওদের চোখে ধরা পড়ল একেকটা দানব হিসাবে।

ঠিক এই সময় উত্তেজনা আর পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে, সরু কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ থেকে উদয় হলো কাউন্ট ডিকানডিয়া। কামান বসানো মঞ্চে হোঁচট খেতে খেতে উঠল সে, দাঁড়াল ফায়ারিং প্ল্যাটফর্মে। সার্জেন্ট-ইন-কমান্ড তাকে চিনতে পেরেই স্বস্তিসূচক একটা চিৎকার ছাড়ল। 'মাই কর্নেল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসেছেন।' পদ আর সম্মানের কথা ভুলে কাউন্টের একটা কব্জি চেপে ধরল সে।

সার্জেন্টের নোংরা ঘর্মাক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কাউন্ট। বিশ সেকেন্ড পর আংশিক সফল হয়েছে সে, এই সময় তার নজর পড়ল উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়া জনারণ্যের দিকে। 'দয়াবতী ঈশ্বরের মা!' আঁতকে উঠল সে। হাঁটুতে একদম জোর পাচ্ছে না, পেটের ভিতর নাড়িভুঁড়ি সব যেন তরল পদার্থে পরিণত হলো। 'সব শেষ! আমরা হেরে গেছি! ওরা চড়াও হয়েছে আমাদের ওপর!' কাঁপা হাতে হোলস্টারের ফ্ল্যাপ খুলল সে, পিস্তল হাতে চলে আসবার আগেই মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে নিচু হলো, এক হাতে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম ধরে থাকল। 'ফায়ার!' নির্দেশ দিল। 'ওপেন ফায়ার!' প্যারাপেটের কিনারা থেকে অনেক নীচে মাথা নামিয়ে গুলি করল সে, সরাসরি ভোরের আকাশে।

প্যারাপেট বা নিচু পাঁচিলের পিছনে শিফটাদের মোট সংখ্যা চারশোরও বেশি, তাদের মধ্যে সাড়ে তিনশো রাইফেল চালাতে জানে, প্রত্যেকের হাতে রয়েছে ম্যাগাজিন ভরা বোল্ট-অ্যাকশন আগ্নেয়াস্ত্র। আরও ষাটজন রয়েছে মেশিনগানের দায়িত্বে, পাঁচজন করে বারোটা দলে ভাগ হয়ে।

শুধু যে পরিশ্রমে তা নয়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকবার কারণে এবং নানা ধরনের অবিশ্বাস্য গুজব কানে আসায় সবাই ওরা টেনশনে ভুগছে। রাতে ড্রামের শব্দ ওদেরকে প্রায় অবশ করে তুলেছিল। যে যার অস্ত্রের পিছনে হুমড়ি খেয়ে থাকল ওরা, ট্রিগারে আঙুল, বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই।

কাউন্টের আর্তচিৎকার আর পিস্তলের আওয়াজটাই যেন দরকার ছিল ওদের, সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে গেল ভয়ের যে বাঁধনটা ওদেরকে পঙ্গু করে রেখেছিল। গুলিবর্ষণ শুরু হলো কাউন্টের চারধার থেকে, কারণ আশপাশে যারা রয়েছে তারাই শুধু শুনতে পেয়েছে কর্নেলের নির্দেশ। উপত্যকার সামনের ঢালে দীর্ঘ একটা রেখা ধরে ঝলসে উঠল মাজলগুলো, তারই সঙ্গে গর্জে উঠল তিনটে মেশিনগান। কাপড় ছিঁড়বার একটানা শব্দ তুলে তির্যক পথ ধরে ছুটল মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, রাইফেল বা অন্যান্য ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল, ট্রেসার বুলেটগুলো সাঁ সাঁ করে উঠে গেল উপত্যকার মাথায়, বিস্ফোরিত হয়ে আলোকমালায় পরিণত হলো।

পাশের ঢাল থেকে গুলিবর্ষণ হতে দেখে জনতার ঢলে ভাঙন ধরল, আহত সঙ্গী-সাথীদের মাড়িয়ে উপত্যকার দূরবর্তী অন্ধকার নিস্তব্ধ ঢালের দিকে স্রোতের মত ধাবিত হলো তারা–চোখ ধাঁধানো ট্রেসার আর রাইফেল ফায়ারের লাল সারি থেকে দূরে সরে যেতে

চাইছে। পিছনে পড়ে থাকল নিহত ও আহতরা, যারা জীবিত তারা ছড়িয়ে পড়ল উপত্যকার চওড়া মেঝেতে।

দূরবর্তী ঢালে গানাররা চুপচাপ রয়েছে, তাদের দিশেহারা ও বিমূঢ় ভাব আরও কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো, তারপর যখন দেখল আদিবাসীরা এবার সরাসরি তাদের জন্য হুমকি হয়ে ছুটে আসছে, কোন নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তারাও ফায়ার ওপেন করল।

শুরু হলো খোলা উপত্যকায় পাইকারী নিধনযজ্ঞ। পিছনের মেশিনগানগুলো এখনও রেঞ্জের মধ্যে পাচ্ছে আদিবাসীদের, তারা সামনের মেশিনগানের রেঞ্জের ভিতরও চলে এসেছে। সামনে থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ল সবাই, জানে না কোথায় যাবে, কোথায় গেলে নিরাপদ আশ্রয় পাবে। শিশুদের বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে ছুটোছুটি শুরু করল মায়েরা, অল্প কয়েকজন আদিবাসী যোদ্ধা মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে পাল্টা গুলি করল ঢাল লক্ষ্য করে, কিন্তু ট্রেঞ্চের ভিতর পজিশন নিয়ে থাকায় তাদের একটা বুলেটও শত্রুপক্ষের কারও গায়ে লাগল না। লাভ হলো শুধু এই যে শিফটারা গুলিবর্ষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

নিয়ন্ত্রণবিহীন জনতার ঢল নিজেদের চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করল। দ্রুত মন্থর হয়ে এল তাদের গতি। এক সময় থেমে গেল তারা। নিরস্ত্র মায়েরা এখনও যারা বেঁচে আছে, যার যার নিজের বাচ্চাকে মাটিতে শুইয়ে পরনের ঢোলা কাপড় দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করল, নিজেদের শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখল বুকের মাণিককে। পুরুষরাও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, গুলি করল এলোপাতাড়ি ঢালের গায়ে লাল হয়ে ফুটে থাকা ঝলসানো মাজল লক্ষ্য করে। অবশ্য লাল আগুনের ঝলক আগের চেয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, দিগন্তরেখার কাছে উঁকি দিতে যাচ্ছে দিনের প্রথম সূর্য।

বারোটা মেশিনগান, একেকটা প্রতি মিনিটে সাতশো করে বুলেট ছুঁড়ছে, তার সঙ্গে তিনশো পঞ্চাশটা রাইফেল বুলেটের চাদর বিছিয়ে দিল উপত্যকার উপর। মিনিটের পর মিনিট ধরে অব্যাহত থাকল তুমুল গুলিবর্ষণ, উপত্যকার নীচে এখনও যারা বেঁচে আছে, ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকা দিনের আলো তাদের নড়াচড়া ফাঁস করে দিতে থাকল নিষ্ঠুরের মত।

আক্রমণকারীদের মেজাজ বদলে গেল। এত সহজে, ট্রিগার টিপলেই, এতগুলো লোককে একসঙ্গে মেরে ফেলতে পারে দেখে ভয় কেটে গেল তাদের। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ল শিফটারা, আরও নির্দয় হয়ে উঠল। নীচের খোলা উপত্যকায় মান্ধাতা আমলের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এখনও যারা পাল্টা গুলিবর্ষণের চেষ্টা করছে তারা সংখ্যায় এতই কম যে শিফটাদের মধ্যে একজনও এতটুকু ভয় পেল না। এমনকী কাউন্ট ডিকানডিয়া পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিস্তল নেড়ে চিৎকার করছে সে, ‘শত্রুদের আমি শেষ দেখতে চাই! ফায়ার!’ সতর্কতার সঙ্গে প্যারাপেটের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল সে। ‘খুন করো ব্যাটাদের। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।’

সূর্যের প্রথম রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে, ধরাশায়ী অসাড় মানুষ আর লাশে ফুলে উঠেছে উপত্যকার মেঝে। এদিক সেদিক নিঃসঙ্গভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, যেন নিক্সন মার্কেটে এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা পুরানো কাপড়ের একেকটা স্তূপ।

উপত্যকার মাঝখানে এখনও বেঁচে আছে কিছু মানুষ। মাঝে মধ্যে হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হলো দু’একজন, পিছনে ঢোলা কাপড় উড়িয়ে খিঁচে দৌড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নিল মেশিনগান, ধুলোর বিস্ফোরণ দ্রুত বৃত্ত রচনা করল তার ছুটন্ত পায়ের

চারদিকে, বুলেটের আঘাতে সেই ধুলোর মধ্যে আছাড় খেলো লোকটা, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত আর ধুলো মিশে একাকার হয়ে গেল, ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল এক সময়।

আদিবাসী যোদ্ধারা, যারা এখনও পুরানো রাইফেল আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছে, কালো মুখ ঢালের দিকে তোলা, হাত পাকানোর জন্য শিফটা রাইফেলধারীদের আদর্শ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। ভাড়াটে ক্যাপটেন বা সার্জেন্টের তীক্ষ্ণকণ্ঠ নির্দেশ পেয়ে রাইফেলধারীরা টার্গেটের উপর নিশানা স্থির করল যথেষ্ট সময় নিয়ে। একেকবার একেকজন রাইফেলধারীকে সুযোগ দেওয়া হলো, লক্ষ্যভেদের সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ল শিফটা সৈনিকরা। দীর্ঘ কয়েক হপ্তার ট্রেনিং বৃথা যায়নি, অবশেষে ডাকাত থেকে যোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছে তারা।

প্রথম গুলিবর্ষণের পর প্রায় বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, যাকে গুলি করা যায় এমন কেউ উপত্যকায় নেই বললেই চলে। মেশিনগানের মাজল আগ্রহ আর প্রত্যাশা নিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে আসা-যাওয়া করছে, আর কিছু না পেয়ে অকারণে গুলি করছে লাশের স্তূপে, কিংবা বুলেট ছুঁড়ে ধুলো ওড়াচ্ছে গভীর কুয়াগুলোর গোলাকৃতি ঠোঁটের চারপাশে, শুধু ওগুলোর আড়াল থেকেই মাঝে মধ্যে এখনও পাল্টা জবাব দিচ্ছে আদিবাসীরা।

'মাই কর্নেল।' কাউন্ট ডিকানডিয়ার মনোযোগ আকৃষ্ট করবার জন্য তার হাত স্পর্শ করল মেজর লুইগি রাকা।

দু'তিনবার ডাকবার পর অবশেষে মেজরের দিকে ফিরল কাউন্ট, তার চোখ আনন্দে আর উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। 'দেখছ, মেজর? দেখছ কী একখানা বিজয় তোমাদেরকে আমি

উপহার দিলাম? গ্রেট ভিক্টরি, তাই না? আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ওদের আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।'

'কর্নেল, আমি কি যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেব?' জিজ্ঞেস করল মেজর।

কাউন্ট ভাব দেখাল সে তার কথা শুনতে পায়নি। 'এখন ওরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে কী ধরনের যোদ্ধা আমি। এই বিজয়ের পর অবশ্যই ইটালিতে আমার ফিরে যাওয়া উচিত–,' মাফিয়া চক্রের নেতা, তার শালা, দুলাভাইয়ের এই কৃতিত্ব আর বীরত্বকে ছোট করে দেখতে পারবে না, চক্রের নেতৃস্থানীয় একটা পদ দাবি করলে প্রত্যাখ্যান করবার উপায় কী তার?

'কর্নেল! কর্নেল! এই মুহূর্তে গোলাগুলি থামানো উচিত আমাদের। যুদ্ধ কোথায়, এ তো নিরীহ মানুষকে একতরফাভাবে খুন করা হচ্ছে। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ওয়েলস অভ চাল্ডি দখল করার পর সামনে যতদূর পারা যায় এগিয়ে যাওয়া...।'

মেজরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল কাউন্ট, রাগে তার চেহারা লাল হয়ে উঠল। 'এই ব্যাটা, হাঁদারাম!' গর্জে উঠল সে। 'এটা যুদ্ধ নয়?'

'ঠিক আছে, যুদ্ধই,' সময় বাঁচানোর জন্য তর্ক এড়াতে চাইল মেজর রাকা। 'কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, শত্রুরা প্রায় সবাই মারা পড়েছে, এবার আমাদের উচিত...'

'উচিত চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা,' চেঁচিয়ে উঠল কাউন্ট। 'জানো না শত্রুর শেষ রাখতে নেই? প্রমাণ করতে হবে আমি অজেয় অমর! তোমার এত সাহস, বীরত্ব প্রদর্শনের এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও? দেখতে পাচ্ছ না, কুয়াগুলোর আড়ালে জড়ো হয়েছে শত্রুরা? ওদেরকে বের করে

এনে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে! মর্টার, লুইগি, মর্টার! কামান দাগো, ওদের বাপের নাম ভুলিয়ে দাও! বুঝিয়ে দাও, কার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে ওরা!'

না, ব্যাপারটার ইতি ঘটানোর কোন ইচ্ছে তার নেই। এটা তার জীবনের গভীরতম তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা। এই যুদ্ধ তাকে এতদিনে উপলব্ধি করতে শেখাল যুগ যুগ ধরে কেন কবিরা বীরশ্রেষ্ঠদের জয়গান গেয়ে গেছে। যুদ্ধ, সে তো সত্যিকার একজন পুরুষ মানুষের প্রিয়তম নেশা, আর কাউন্ট ডিকানডিয়া জানে তার জন্মই হয়েছে এই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবার জন্য।

দুঃসাহসের সঙ্গে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল মেজর রাকা, ধমকের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করল কাউন্ট, 'আমার নির্দেশ তুমি অমান্য করতে চাও? এই মুহূর্তে কামান দাগো!'

'এই মুহূর্তে,' তিক্তকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল মেজর, ঘুরে দাঁড়ানোর আগে দীর্ঘ এক সেকেন্ড ধরে পাথুরে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল কাউন্টের দিকে।

প্রথম মর্টার বোমাটা পরিষ্কার মরুপ্রভাতের উঁচু আকাশে উঠে গেল, বাঁক নেওয়া শেষ করে উপত্যকায় নামতে শুরু করল খাড়াভাবে। সবচেয়ে কাছের কুয়ার ঠোঁটে বিস্ফোরিত হলো ওটা। ধোঁয়া আর ধুলো লাফিয়ে উঠল, তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল বোমার টুকরোগুলো। দ্বিতীয় বোমাটা নিখুঁতভাবে গভীর গোলাকৃতি গর্তের ভিতর পড়ল, বিস্ফোরিত হলো দৃষ্টিপথের বাইরে। কুয়ার ভিতর থেকে উথলে উঠল কাদা আর ধোঁয়া, ভিতরের গায়ে আশ্রয় নিয়ে থাকা আদিবাসী যোদ্ধারা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল খোলা মাটিতে, তাদের নোংরা সাদা আলখেল্লা পতাকার মত উড়ছে বাতাসে।

সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান আর রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল,

তাদের চারদিকে বিস্ফোরিত ধুলোর ঘূর্ণি সৃষ্টি হলো, ধুলো শান্ত হবার পর কাউকে নড়তে দেখা গেল না।

চারদিকে থুথু ছিটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল কাউন্ট ডিকানডিয়া। যুদ্ধ জেতা পানির মত সহজ আর আনন্দদায়ক। 'বাকি গর্তগুলোয়, লুইগি!' নির্দেশ দিল সে। 'বের করো শালাদের! সব ক'টাকে!'

প্রতিবার একটা করে কুয়া লক্ষ্য করে কামান দাগা হলো। দু'একটা কুয়া থেকে কেউ বেরুল না, ভিতরে পড়ে লোকজনের উপরই বিস্ফোরিত হলো গোলা। বাকি প্রায় সবগুলো থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল অসহায় আদিবাসীরা, বোমার টুকরো অর্থাৎ ধারাল ছোট ছোট ইস্পাত তাদের সারা শরীরে গেঁথে আছে। বেরিয়ে এসে পাঁচ গজও এগোতে পারল না কেউ, অপেক্ষারত রাইফেল আর মেশিনগান ঝাঁঝরা করে দিল তাদের।

সাহস বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছুল, উপত্যকা আর কুয়াগুলো ভাল করে দেখবার জন্য প্যারাপেটের উপর উঠে দাঁড়াল কাউন্ট ডিকানডিয়া, বাকি কুয়াগুলোর দিকে হাত তুলে গানারদের দিক-নির্দেশ দিচ্ছে।

পরবর্তী টার্গেট নালার কাছাকাছি, অসমান মাটির সামনে, উপত্যকার একেবারে শেষ মাথায়। প্রথম বোমাটা বিস্ফোরিত হলো, স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে উঠল ম্লান অগ্নিশিখা আর ধুলো। দ্বিতীয় বোমাটা পড়বার আগে, কুয়ার ঠোঁট থেকে লাফ দিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো এক যুবতী, ছুটল, জানে নালার মুখে একবার পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ আড়াল পেয়ে যাবে।

তার পিছনে দুই কি তিন বছরের একটা নগ্ন বাচ্চা। বাচ্চাটার পা দুটো বাঁকা, সম্ভবত জন্ম থেকেই, আর পেটটা ধূসর রঙের বেলুনের মত ফোলা। তার হাত ধরে ছুটছে মা, সঙ্গে করে নিয়ে

আসতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সমান তালে অতটুকু বাচ্চা ছুটতে পারবে কেন, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে, কিন্তু তার মা তাকে ছাড়ল না।

বাচ্চাটা যন্ত্রণাকাতর চিৎকার জুড়ে দিল, তার মা তাকে একটা বস্তার মত মাটির সঙ্গে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে। যুবতী মায়ের কোমর দু'পায়ে জড়িয়ে আরেকটা দুধের বাচ্চা সেঁটে রয়েছে বুকের সঙ্গে। সে-ও নগ্ন, সে-ও তারস্বরে চিৎকার করছে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ভারবাহী ছুটন্ত মায়ের দিকে কোন বুলেট ছুটে এল না। যখন এল তখন ঝাঁক বেঁধে এল, আর লাগল মাত্র একটা, প্রথম বাচ্চার কব্জি ধরে থাকা হাতের কনুই চুরমার হয়ে গেল। হাড় গুঁড়িয়ে গেল, কনুইয়ের কাছ থেকে নীচের দিকে হাতটা ঝুলে থাকল শুধু চামড়া আর শিরার সঙ্গে। পরবর্তী ঝাঁকটা এল সঙ্গে সঙ্গেই, অনেকগুলো ঝাঁকি খেলো যুবতী, একটা বুলেট দ্বিতীয় শিশু আর মায়ের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

আবার স্তব্ধ হয়ে গেল মেশিনগান আর রাইফেল। মায়ের লাশের পাশে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে প্রথম বাচ্চাটা।

আবার তার কান্না শুরু হলো, বাঁকা পা নিয়ে টলতে টলতে দাঁড়াল সে, শক্তভাবে ফুলে থাকা গালে মুক্তোর মত দু'ফোঁটা পানি, গলা থেকে পেটে নেমে এসেছে নীল পুঁতির মালা।

নালার মুখ থেকে ভোজবাজির মত উদয় হলো ছুটন্ত একটা ঘোড়া। মেদহীন, পেশীবহুল সাদা স্ট্যালিয়ন, বালি মেশানো অসমান মাটির উপর দিয়ে তীরবেগে উড়ে গেল সেটা, তার কাঁধ আঁকড়ে ধরে পিঠে লম্বা হয়ে প্রায় শুয়ে রয়েছে এক নারীমূর্তি। পিছনে পতপত করে উড়ছে কালো একটা আলখেল্লার দীর্ঘ প্রান্ত। ঘোড়সওয়ার তার স্ট্যালিয়ন নিয়ে ছেলেটা যেদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সেদিকে ছুটে চলেছে। কী ঘটছে গানাররা ভাল করে বুঝে

উঠবার আগেই খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে গেল সে।

প্রথম মেশিনগান বিস্ফোরিত হলো, কিন্তু বুলেটগুলো উড়ে গেল স্ট্যালিয়নের মাথার অনেকটা উপর দিয়ে, একটাও লাগল না। এই সময় বাচ্চাটার কাছে পৌঁছে গেল ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার হ্যাঁচকা টান দিল লাগামে, অকস্মাৎ বাধা পেয়ে পিছনের পায়ে খাড়া হলো স্ট্যালিয়ন, আর ঘোড়সওয়ার স্যাঁৎ করে নিচু হলো ছেলেটাকে ছোঁ দিয়ে তুলবার জন্য।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্থির টার্গেট লক্ষ্য করে একসঙ্গে গর্জে উঠল আরও দুটো মেশিনগান।

তেরো

সমর উপকরণে সুসজ্জিত হয়ে নিঃশব্দে কুয়ার কাছে চলে এসেছে শিফটা বাহিনী, এটা উপলব্ধি করবার সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হয়ে উঠল রানা। আদিবাসীরা শুধু যে আনাড়ি তাই নয়, তাদের শৃংখলাজ্ঞান বলতেও কিছু নেই। শিফটাদের সামনে পড়লে সব কচু-কাটা হয়ে যাবে। এই আত্মহত্যার পথ থেকে ওদেরকে সরিয়ে আনবার একটাই মাত্র পথ আছে।

অস্ত্র আর গোলাগুলির যুদ্ধ কখন শুরু হবে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এদিকে কথার যুদ্ধ থামবার কোন লক্ষণ নেই। মহা শোরগোলের মধ্যে যতই গলা ফাটাক রানা, কেউ ওর কথা শুনতে পাবে না। কামাল হাসানের পঞ্চাশজন সশস্ত্র সহচর যোদ্ধা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছে, অ্যামহারিক ভাষায় একযোগে চিৎকার করছে তারা, উদ্দেশ্য আশু করণীয় সম্পর্কে গোত্রপ্রধানকে

পরামর্শদান। আশ্চর্য, এই কণ্ঠশক্তি প্রতিযোগিতার মধ্যে কামাল হাসানের গলাও শোনা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে, তিনিও নির্দেশ দিচ্ছেন কাকে কী করতে হবে। সমস্যা একটাই, কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না।

রানার একজন দোভাষী দরকার। ভিড় ঠেলে সামনে এগোল ও, খপ করে আব্বাস খায়েরের কব্জি ধরল, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল গুহার বাইরে। যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করতে হলো রানাকে, কারণ আর সবার মত আব্বাসও নিজের কথা বাতাসে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, ভয়ানক উত্তেজনায় পাথুরে স্তম্ভের মত নিরেট আর শক্ত হয়ে আছে তার শরীর।

গুহার বাইরে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে দেখে অবাক হয়ে গেল রানা, ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগল, এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল রাতটা! ভোর হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। গুহার বাইরে মরুর ঠাণ্ডা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিল ও।

ম্লান আকাশ আর ক্যাম্প ফায়ারের আলোয় দেখতে পেল, জনতার ঢল নালা থেকে নেমে কুয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই এত হাসিখুশি আর উত্তেজিত, যেন সামনে কোথাও মেলা বসেছে।

'ওদের থামাও, আব্বাস,' জরুরী ভঙ্গিতে বলল রানা। 'এসো, ওদের বাধা দিই।' আব্বাসের হাত ধরে ছুটল ও।

'কী ব্যাপার, মাসুদ ভাই?'

'নালা থেকে নেমে কোথায় ওরা গিয়ে পড়বে, বুঝতে পারছ না?' ছুটতে ছুটতেই বলল রানা। 'শিফটারা স্রেফ কচু-কাটা করবে ওদের।'

লোকারণ্যের পিছনে পৌঁছুল ওরা, ভিড়ের নিরেট পাঁচিল ভেদ করে ভিতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কনুই আর হাঁটু চালাল

ওরা, যাকে সামনে পেল তারই চুল বা জামা মুঠোর মধ্যে নিয়ে টান দিল হ্যাঁচকা। 'পিছোও, পিছু হটো, ফেরত যাও!' অ্যামহারিক ভাষা কিছুই জানে না রানা, ও শুধু আব্বাসের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

আব্বাসকে পাশে নিয়ে নালার সরু মুখে পৌঁছুল ও। মুখটা লম্বা, শেষ মাথায় কুয়াগুলোকে বুকে নিয়ে পিরিচ আকৃতির উপত্যকা। পরস্পরের একটা করে হাত ধরে পাঁচিল তৈরি করল ওরা, জনস্রোত ঠেকানোর এটাই একমাত্র উপায়। বিশ কি ত্রিশ সেকেন্ড থেমে থাকল মিছিলের গতি। বাধা পেয়ে যারা দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছন থেকে জনতার নিরেট চাপ পড়ল তাদের পিঠে। ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মেজাজ বদলে গেছে, হাসিখুশি মানুষগুলো খেপে গিয়ে একবাক্যে রায় দিল সামনের বাধা উপড়ে ফেলো। কয়েকশো আদিবাসী ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে উপত্যকায়, বাকি সবাই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে চায়।

জনতার চাপ ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হলো ওরা, পিছু হটছে। যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে দু'জনেই, অসংখ্য পায়ের তলায় পিষে মারা যাবে। ঠিক এই সময় উপত্যকার উঁচু ঢাল থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল মানুষের ঢল, থেমে গেল চেঁচামেচি।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, নালার খাড়া গা বেয়ে খানিকটা উঠল উপত্যকায় কী ঘটছে ভাল করে দেখবার জন্য।

নালার সরু মুখের কিনারায় শুয়ে আদিবাসীদের নিধনযজ্ঞ চাক্ষুষ করল ও। মিনিটের পর মিনিট ধরে চলল অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ড, চোখের সামনে দ্রুত বদলে যেতে লাগল দৃশ্যগুলো। নিজের অসহায়ত্ব এতই প্রবল হয়ে উঠল যে বমি পেল ওর, নিষ্ফল

আক্রোশে অসুস্থবোধ করল। অসহায় মানুষের দুর্গতি যেখানেই দেখুক রানা, অদ্ভুত একটা অভিমান হয় ওর, কার প্রতি জানে না—নিজেকে সামলানোর সময় পায় না, তার আগেই পানি এসে যায় চোখে। সেজন্যই, মাঝে মাঝে নিজেরই সন্দেহ হয়, মনের গহীনে কোথাও বোধহয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও। কিন্তু আজ কোন অভিমান নয়, চোখও ভিজে উঠল না, প্রচণ্ড আক্রোশের অদৃশ্য আগুনে পুড়ে ছাই হতে থাকল শুধু, টেরও পেল না কেউ একজন ওর কাঁধ খামচে ধরেছে, শার্ট ভেদ করে মাংসের ভিতর দেবে গেছে তার নখগুলো।

আরও প্রায় দু'মিনিট পর রানা দেখল ওর পাশে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে মাথা ভর্তি সোনালি চুল নিয়ে অ্যানি উইসপার। মাত্র এক পলক তাকাল, তারপর আবার রক্তাক্ত উপত্যকায় ফিরে গেল ওর চোখ, যেখানে মানুষের দয়া-ধর্ম-শুভবুদ্ধি-বিবেক-মহত্ত্ব ইত্যাদি বোধ আর অনুভূতিগুলোকে চরমভাবে অপমানিত করে পুনর্মঞ্চস্থ হচ্ছে 'জোর যার মুল্লুক তার' নাটকটি।

অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল রানা, ওর পাশে ফোঁপাচ্ছে অ্যানি। আক্রোশে প্রায় অন্ধ হলেও, উপত্যকার পরিধি আর শিফটাদের পজিশনগুলো খুঁটিয়ে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মনে গেঁথে নিল রানা। ওর আরেক পাশে রয়েছে আব্বাস, বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছে সে, পরিচিত শব্দগুলো মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ-নিঃশ্বাসের মত বেরিয়ে আসছে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক গলে।

'ওহ্ গড!' কামান দাগা শুরু হতে রুদ্ধকণ্ঠে ফিসফিস করল অ্যানি। খোলা উপত্যকায় সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করছে মানুষ, কিন্তু নাগালের মধ্যে কোন আশ্রয় নেই। 'ওহ্ গড, রানা, কী করব আমরা?'

রানার কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। অ্যানিকে ও সান্ত্বনা

দেবে কী, নিজেকে সান্ত্বনা দেবারও তো কিছু নেই। আরও অনেকক্ষণ ধরে চলল নির্মম হত্যাযজ্ঞ, তারপর ওরা দেখতে পেল যুবতী মা আর তার দুই বাচ্চাকে। ওদের কাছ থেকে মাত্র তিনেশা গজ দূরে, কুয়ার আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়।

'ওহ্ গড! ওহ্ প্লিজ, জেসাস!' ফুঁপিয়ে উঠল অ্যানি। 'দয়া করো, থামাও এবার! প্লিজ, এটা ঘটতে দিয়ো না, প্লিজ!'

মেশিনগানের বুলেট খুঁজে নিল যুবতী মাকে, নিষ্পলক চোখে তাকে ওরা মরতে দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটা, চেহারায় হারিয়ে যাওয়া ভাব, ভয়ে-বিস্ময়ে হতভম্ব, পাশে মায়ের লাশ পড়ে আছে। ওদের পিছনে, নীচ থেকে ভেসে এল ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ঝট করে ঘাড় ফেরাল আব্বাস, চেঁচিয়ে উঠল, 'বানু! না!' নালার খাড়া গা একলাফে পেরিয়ে গেল স্ট্যালিয়ন, ওদের মাথার উপর দিয়ে। ঘোড়ার পিঠে লম্বা হয়ে সেঁটে রয়েছে ঘোড়সওয়ার। বোধহয় সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে রাহেলা বানু, আলখেল্লাটা ভাল করে বাঁধা হয়নি কোমরে, পিঠটা সম্পূর্ণ উদোম–সাদা বিশাল ঘোড়ার পিঠে খুদে একটা গাঢ় রঙের মূর্তি।

ভয়ে নয়, আশংকায় নয়, প্রশংসা আর মুগ্ধবিস্ময়ে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে বানু, জানে, কিন্তু কে অস্বীকার করবে এ-ধরনের অন্ধ ভাবাবেগই যুগে যুগে মানবকল্যাণে অবদান রেখেছে?

'বানু!' আবার চেঁচিয়ে উঠল আব্বাস, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছুটল সে-ও। ডাইভ দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরল রানা, ধপাস করে পড়ে গেল দু'জনেই। মাটিতে পড়ে ধস্তাধস্তি শুরু করল ওরা। রানার একটা চড় খেয়ে শান্ত হলো আব্বাস।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেটবৃষ্টির ভিতর দিয়ে ছুটে গেল বানু, শরীরে আঁচড়টিও লাগল না, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে এল অ্যানি উইসপারের। বাচ্চাটার কাছে পৌঁছে আবার ফিরে আসবে বানু, এ অসম্ভব একটা ব্যাপার। সাংঘাতিক একটা বোকামি করে ফেলেছে বানু, যে বোকামির কোন সংশোধন হয় না–চিন্তাটা অ্যানির মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। তবে রানার মত দৃশ্যটার সৌন্দর্য তাকেও অভিভূত করল, কী অপরূপ সাহসের সঙ্গে নিজের মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে তরুণী মেয়েটা। আবেগে আর কান্নায় কাঁপতে লাগল অ্যানির শরীর। এমনকী এই মুহূর্তে যখন বানুর অকুতোভয় আচরণে একজন নারী হিসাবে সে-ও গর্বিত, তিক্ত বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করল, তার দ্বারা এই আত্মত্যাগ কখনোই সম্ভব হবে না।

দেখল পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হলো স্ট্যালিয়ন, বাচ্চাটাকে ছোঁ দিয়ে তুলবার জন্য নীচের দিকে ঝুঁকল বানু। দেখল মেশিনগানের বুলেট অবশেষে ভেদ করেছে লক্ষ্য, চিঁ হিঁ-হিঁ করে উঠে শূন্যে ডিগবাজি খেলো স্ট্যালিয়ন, চার পা আকাশের দিকে তুলে ধরাশায়ী হলো, তার নীচে চাপা পড়ল বানু আর বাচ্চা। দেখল তারপরও ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ওদের চারপাশে ধুলো ওড়াচ্ছে, সশব্দে ঢুকে যাচ্ছে স্ট্যালিয়নের নিথর গায়ে।

ইতিমধ্যে আবার নালার খাড়া গা বেয়ে উঠবার জন্য মোচড় খেতে শুরু করেছে আব্বাস, রানার আরেকটা চড় খেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল সে। 'স্টপ দ্যাট!' খেঁকিয়ে উঠল রানা, নিজের উপর অকারণ রাগ ওকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে। 'বুঝতে পারছ না, একবার বেরুলে আর ফেরা সম্ভব নয়?'

'কিন্তু বানুকে...,' কথা বলতে পারছে না অ্যানি, হাঁপিয়ে উঠছে, '...বানুকে ফেরত আনতে হবে না, রানা? প্লিজ, রানা!

আমাকে বাধা দিয়ো না, প্লিজ!’ নিজেও বোধহয় জানে না কী করছে সে, রানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল, অদ্ভুত এক শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পা বাড়াল উপত্যকার দিকে।

ধমক দিল রানা, ‘আগে দেখো আমি কী করি!’ হ্যাঁচকা টানে আব্বাসকে দাঁড় করাল ও, তার পিঠে কনুইয়ের নিষ্ঠুর গুঁতো দিয়ে নামিয়ে আনল নালার গা থেকে, এক হাতে কব্জি ধরে টেনে আনছে অ্যানিকে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল অ্যানি, রানার হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইছে, ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে আছে উপত্যকার দিকে, ঝুরঝুরে মাটিতে বারবার পিছলে যাচ্ছে অনিচ্ছুক পা। ‘রানা, ছাড়ো আমাকে! ছাড়ো, প্লিজ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে? কী করতে চাও তুমি?’

‘তোমরা সাহায্য করবে,’ বলল রানা, ‘তা হলে সময় খুব কম লাগবে–কারে ভিকার্স তুলব।’ গুহাগুলোর সামনে রয়েছে আর্মারড কারগুলো, রাগ আর আক্রোশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি করছে ও। ‘অ্যানি, আমার গাড়িটা তুমি চালাবে, মেশিনগানের দায়িত্ব আমার। আব্বাস, মাইকেলের গাড়িটা তুমি চালাবে।’

ওর কথা শুনে পিছন থেকে পাশে চলে এল অ্যানি, তিনজনই ওরা ছুটতে শুরু করল।

‘তোমরা দু’জন ছাড়া আমাদের ড্রাইভার নেই–একটা গাড়ি ডাইভারশন হিসেবে ব্যবহার করব। মাইকেলকে নিয়ে তুমি যাবে দক্ষিণ দিকে, রিজ-এর পিছন দিয়ে। তোমাদের নিয়ে ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে আমি আর অ্যানি বানুসহ আরও যারা বেঁচে আছে তাদের যে-ক’জনকে পারি তুলে নেব।’

কোন প্রশ্ন নয়, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সমর্থন করল

ওরা। নালার অনেকটা ভিতর চলে এসেছে, এই সময় আবার এক পশলা মেশিনগানের গুলি হলো উপত্যকায়, পরমুহূর্তে দু'তিনবার গর্জে উঠল শিফটাদের কামান। কাউকে লক্ষ্য করে নয়, সম্ভবত সমাপ্তিসূচক বা সতর্কতামূলক বার্তা প্রচার করা হলো।

নালার শেষ বাঁকটা ঘুরল তিনজন, সেই সঙ্গে যেন কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করল। গোটা নালা আদিবাসীদের ভিড়ে গিজগিজ করছে। এরা সবাই ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে শিফটাদের হাত থেকে। ভয়ানক ব্যস্ত তারা, কারও দিকে তাকানোর এক মুহূর্ত সময় নেই কারও। যে-যার জিনিস-পত্র বেঁধে-ছেঁদে জড়ো করছে এক জায়গায়, গাধা আর খচ্চরের পিঠে তুলছে। গুটানো তাঁবু কাঁধে করে নিয়ে আসছে কিছু লোক, কিছু লোক এরই মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেছে গ্রামের পথে। উটের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সদ্য বিধবারা, চারদিক থেকে তারস্বরে চিৎকার করছে গাধা আর খচ্চরগুলো, ভয় পেয়ে ব্যা ব্যা করছে ছাগলের পাল, পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে গলায় রশি বাঁধা বানর। বাচ্চা কোলে ছুটোছুটি করছে মায়েরা, স্বামীদের খুঁজে পাচ্ছে না। আর এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এখনও এখানে-সেখানে কাল রাতের আগুনগুলো জ্বলছে, ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে গোটা নালা।

ভিড়ের ফাঁকে চকচকে সাদা গাড়িগুলো দেখতে পেল ওরা, সাদার উপর জ্বলজ্বল করছে লাল ক্রস-চিহ্ন।

কনুই চালিয়ে, ধমক দিয়ে ভিড়ের ভিতর পথ করে নিল ওরা। সবচেয়ে কাছের গাড়ির পাশে পৌঁছে অ্যানির কোমরে দুই হাত রাখল রানা, তুলে দিল গাড়ির উপর। এক মুহূর্তের জন্য নরম হলো ওর চেহারা। 'তুমি ইচ্ছে করলে না গেলেও পারো, অ্যানি। তখন কিছু না ভেবেই চাইছিলাম তুমিও যাবে। তোমাকে গাড়ি চালাতেই হবে এমন কোন কথা নেই, মাইকেল আর আমি একটা

গাড়ি নিয়েও কাজটা করতে পারব।'

রাত জেগেছে অ্যানি, উপত্যকার নারকীয় দৃশ্য দেখে কেঁদেছে, ম্লান আর নোংরা হয়ে আছে তার চেহারা। সবেগে মাথা নাড়ল সে। 'কী বলছ! কেউ না গেলেও আমি যাব!' এমন ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, রানা যেন তাকে অপমান করেছে। 'তোমার গাড়ি আমিই চালাব।'

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল রানা। 'ট্যাংক ভর্তি ফুয়েল দরকার হবে আমাদের, আব্বাসকে সাহায্য করো।' ঘুরে দাঁড়াল রানা, আব্বাসকে চিৎকার করে বলল, 'নিতম্বিনী আর ভাগ্যদেবীকে নিচ্ছি আমরা...অ্যানি তোমাকে সাহায্যে করবে।'

কামাল হাসানের দেহরক্ষীদের কয়েকজন এরইমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ভরা কাঠের বাক্সগুলো একটা গুহা থেকে বের করে এনে এক জায়গায় জড়ো করছে, এই সময় ওখানে পৌঁছুল রানা। একেকটা বাক্স চারজন দেহরক্ষী ধরাধরি করে হাঁটু মুড়ে থাকা উটের পিঠে তুলছে, তুলবার পর কুঁজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে বাক্সগুলো।

'এই যে, তোমরা!' চারজনের একটা দলকে দেখে ডাকল রানা, ভিকার্স ভরা একটা বাক্স বয়ে নিয়ে আসছে তারা। 'ওটা নিয়ে আমার সাথে এসো।' দলটা দাঁড়িয়ে পড়ল, রানার ভাষা বুঝতে পারছে না। হাত নেড়ে, ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করল ও। এই সময় কোত্থেকে একজন আদিবাসী যোদ্ধা ছুটে এল, দেহরক্ষীদের উপর হম্বিতম্বি করতে দেখে বোঝা গেল কামাল হাসানের ঘনিষ্ঠ কেউ হবে। চারজনের দলটাকে রানার পিছু নিতে বাধা দিল সে, অঙ্গভঙ্গি করে দেখাল বাক্সটা কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না, উটের পিঠেই তুলতে হবে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল

রানা, কিন্তু কেউ কারও ভাষা না জানায় সমস্যার কোন সুরাহা হলো না; লোকটা গোঁয়ার, এদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে।

'দুঃখিত, বন্ধু,' ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ধাঁ করে লোকটার কানের পাশে ঘুসি মারল রানা, লোকটা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তর্কাতর্কিরও সমাপ্তি ঘটল। 'এসো তোমরা,' দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিল ও। ভিড় ঠেলে হন হন করে এগোল গাড়িগুলোর দিকে। উপত্যকায় আহত হয়ে পড়ে আছে বানু, এই চিন্তাটা উন্মাদ করে তুলছে ওকে। কল্পনায় দেখতে পেল রক্তক্ষরণে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, বালি মেশানো মাটি শুষে নিচ্ছে তাজা লাল রক্ত।

ফিরে এসে দেখল নিতম্বিনীর ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে আব্বাস। প্রথমবারেই স্টার্ট নিল কার। আস্তে করে ইগনিশন টেনে নিল অ্যানি।

'মাইকেল কোথায়?' চিৎকার করল রানা।

'কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না,' জবাব দিল আব্বাস। 'একটা গাড়ি নিয়ে যেতে হবে...।' হঠাৎ হাসির শব্দে দু'জনেই ওরা ঘাড় ফেরাল।

শিথিল ভঙ্গিতে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল সেভারস্। সম্পূর্ণ শান্ত সে, আগের মতই ধোপদুরস্ত—চুলগুলো পরিপাটি করে ব্রাশ করা, সুটের ভাঁজ এত নিখুঁত, যেন এইমাত্র দর্জির দোকান থেকে ডেলিভারি আনা হয়েছে।

'তা হলে এই ব্যাপার!' বলে ভুরু নাচিয়ে হাসল সে, কৌতুক ভরা মুখটা ঠোঁটের ফাঁকে ধরা চুরুটের নীল ধোঁয়ায় মুহূর্তের জন্য ঢাকা পড়ে গেল। 'বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ রানা আর তার দুই হাঁসের ছানা শিফটা বাহিনীর সাথে লড়তে যাচ্ছে?'

ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে মাথা বের করল অ্যানি। চিৎকার করে বলল, 'তোমাকে আমরা কখন থেকে খুঁজছি!'

'নাও,' হালকা সুরে রসিকতা করল মাইকেল, 'এবার গার্লস গাইড এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ভাষণ শোনো!'

'নালা থেকে বেরিয়ে গেছে বানু!' এক ছুটে মাইকেলের সামনে চলে এল আব্বাস। 'আমরা তাকে তুলে আনতে যাচ্ছি। আপনি আর আমি এক গাড়িতে থাকব, মাসুদ ভাই আর অ্যানি...'

আব্বাসের কথা শেষ হলো না, বাধা দিল মাইকেল। 'কেউ আমরা কোথাও যাচ্ছি না।' মাথা নাড়ল সে।

আবেগের বশে মাইকেলের বুকের কাছে কোট ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল আব্বাস। 'বানু! বানু! আপনি বুঝতে পারছেন না! বানু আহত হয়েছে! উপত্যকায়! ওকে আমাদের তুলে আনতে হবে!'

'জিজ্ঞেস করি, ওল্ড বয়, কোট থেকে হাত সরাতে বললে তুমি কিছু মনে করবে?' বলে আব্বাসের হাতটা সরিয়ে দিল মাইকেল বুক থেকে। 'হ্যাঁ। বানুর ব্যাপারটা আমরা জানি। কিন্তু...'

ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে চেঁচিয়ে বলল অ্যানি, 'বাদ দাও, আব্বাস। ভীতু কোন লোককে দিয়ে আমাদের কাজ হবে না। চলে এসো...।'

গাড়ির গা থেকে পিঠ তুলে এক ঝটকায় সিধে হলো মাইকেল, এক নিমেষে থমথমে হয়ে উঠল চেহারা, চোখে ধারাল দৃষ্টি। 'বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে আমাকে, মাই ডিয়ার লেডি। স্বীকার করি, তার মধ্যে কিছু কিছু সঙ্গত ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে কাপুরুষ বলে ডাকেনি!'

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন, সবার জন্যেই প্রথমবার বলে একটা ব্যাপার থাকে!' রাগে লালচে হয়ে উঠল অ্যানির মুখ, চোখ থেকে

গড়ানো পানি শুকিয়ে যাওয়ায় নোংরা দাগ ফুটে উঠেছে তার গালে, বাতাসে উড়ে এসে চোখে লাগছে সোনালি চুল। মাইকেলের দিকে তর্জনী তাক করে আবার বলল, 'তোমার জন্যে এটা প্রথমবার!'

পরস্পরের দিকে দীর্ঘ দুই সেকেন্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওরা, এই সময় দৃঢ় পায়ে দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল প্রিন্স হাসান সালে, তার গাঢ় চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব। 'মেজর সেভারস্ আমার নির্দেশ পালন করছে, মিস উইসপার। আমি অর্ডার দিয়েছি, গাড়িসহ আমার বাবার বাহিনী ইমিডিয়েটলি পিছু হটবে।'

'গুড গড, ম্যান!' অ্যানির সমস্ত রাগ দিক বদলে এবার প্রিন্সের উপর পড়ল। 'ওখানে তোমার মেয়ে পড়ে আছে!'

'হ্যাঁ,' হাসান সালে নরম সুরে বলল। 'এক দিকে আমার মেয়ে, আরেক দিকে আমার দেশ। কোন সন্দেহ নেই কোনটা আমি বেছে নেব।'

'নিজেও জানো না তুমি কী বলছ!' গলা ভেঙে গেল অ্যানির।

'আমার বিশ্বাস, জানি।' ওর দিকে ঘুরতেই লোকটার চোখে যন্ত্রণাদগ্ধ একজন বাবার সমস্ত কষ্ট আর অসহায়ত্বের গাঢ় ছায়া দেখতে পেল রানা। 'আমার হাত-পা বাঁধা, শিফটাদের উসকানি দেওয়া হয় এমন কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। সেটার অপেক্ষাতেই আছে ওরা। একটা অজুহাত পেলে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই মুহূর্তে অবশ্যই আমরা আরেক গাল বাড়িয়ে দেব, এই বর্বর নৃশংসতাকে ব্যবহার করব আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের কাজে।'

'কিন্তু বানু,' বাধা দিল অ্যানি, 'তাকে আমরা এক মিনিটের মধ্যে তুলে আনতে পারি!'

'না।' প্রিন্স তার চিবুক দৃঢ়ভঙ্গিতে উঁচু করল। 'শত্রুকে আমি

আমাদের নতুন অস্ত্র দেখতে দিতে পারি না। পাল্টা আক্রমণ করার উপযুক্ত সময় না হওয়া পর্যন্ত ওগুলো অবশ্যই লুকিয়ে রাখতে হবে।'

'বানু!' আর্তনাদ করে উঠল আব্বাস। 'বানুর কী হবে?'

'আগে এই মেশিন আর নতুন গানগুলো নিরাপদে সারডি গিরিসংকটে ফিরে যাক, আমি নিজে তার লাশ আনার জন্যে যাব,' শান্ত প্রতিজ্ঞার সুরে বলল প্রিন্স হাসান সালে। 'কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কর্তব্যটাই আমার কাছে প্রথম বিবেচ্যবিষয়।'

'একটা গাড়ি,' মিনতি করল আব্বাস। 'শুধু বানুর জন্যে!'

'না, এমনকী একটা কার-ও আমি ব্যবহার করতে দিতে পারি না।' প্রিন্স তার কথায় অনড়।

'বেশ, কিন্তু আমি পারি,' তীক্ষ্ণ বাঁশির মত শোনাল অ্যানি উইসপারের কণ্ঠস্বর, তার এলোমেলো সোনালি চুলসহ মাথাটা হ্যাচের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল, পরমুহূর্তে গর্জে উঠল নিতম্বিনীর এঞ্জিন। মানুষ আর পশুর ভিড়টাকে ছত্রখান করে দিয়ে বাঁক নিল গাড়ি, দিক বদলে নালার দূরপ্রান্ত অভিমুখে ছুটল।

একা এবং নিরস্ত্র, মেশিনগান আর মর্টারের সামনে দাঁড়ানোর জন্য রওনা হয়ে গেল অ্যানি উইসপার, আর সময় থাকতে ওদের মধ্যে মাত্র একজন লোকই তৎপর হয়ে উঠল।

কাঁধের ধাক্কায় প্রিন্সকে সরিয়ে দিয়ে ছুটল রানা, গাড়ির রচিত অর্ধবৃত্ত শেষ হওয়ার মুহূর্তে পাশে চলে এল ওটার। সরু নালায় নামতে যাচ্ছে নিতম্বিনী, এঞ্জিন কাউলিঙের উপর আঙটাটা ধরে ফেলল ও, কিন্তু পা মাটিতে থাকতেই প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান খেলো। শোল্ডার জয়েন্ট সকেট থেকে যেন বেরিয়ে আসছে, তবু আঙটা না ছেড়ে ছোট্ট এক লাফে গাড়ির গায়ে ঝুলে পড়ল ও।

গাড়ির সঙ্গে ঝাঁকি খেতে খেতে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল রানা, অবশেষে ড্রাইভারের হ্যাচ দিয়ে নীচে তাকাল। 'তুমি কি পাগল হলে?'

মাথার উপর গর্জন শুনে মুখ তুলল অ্যানি, ক্ষীণ নিঃশব্দ হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, যা সম্ভবত স্বর্গীয় কোন দেবীর মুখেই শোভা পায়। 'হ্যাঁ, পাগল হয়েছি। তোমার কী খবর?'

মস্ত একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগায় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো নিতম্বিনী, মুহূর্তের জন্য রানার ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস, জবাব দেওয়া হলো না। তার বদলে নখ দিয়ে টারিটের গা আঁচড়া-আঁচড়ি করে উপরে উঠবার চেষ্টা করল ও, পরের ঝাঁকিটায় আলগা হ্যাচ কাভার সশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারটে আঙুল প্রায় অকেজো হয়ে গেল।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার সেটাকে তুলল রানা, নেমে এল ক্যাবে। ঘড়ির কাঁটা ধরে একেবারে ঠিক মুহূর্তটিতে পৌঁছুল ও, স্থিরভাবে দাঁড়াবার আগেই দেখতে পেল ফুল থ্রটল দিয়ে নিতম্বিনীকে খোলা উপত্যকায় তুলে ফেলেছে অ্যানি।

সূর্য ইতিমধ্যে দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে উপরে, সোনালি বালির বিস্তৃতির উপর ঘন লম্বা ছায়া পড়েছে। রিজ-এর উপর এখনও ভাসছে ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ, খোলা প্রান্তরে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে লাশগুলো। একরঙা মরুর গায়ে মেয়েদের কাপড়গুলো উজ্জ্বল বহুবর্ণের ছিটার মত লাগল।

একটা বিশেষ রিজ অর্থাৎ ঢালের উপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা, গোটা উপত্যকা ওখান থেকে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঢালের গায়ে অনেক ট্রেঞ্চ, শিফটারা অনেকেই ট্রেঞ্চ ছেড়ে উঠে এসেছে উপরে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে খোলা কসাইখানার কিনারা ধরে ঘোরাফেরা করছে তারা, হাঁটাচলার

ভঙ্গির মধ্যে আড়ষ্ট ভাব, যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে—ছেঁড়া-ফাড়া শরীর আর ঝাঁঝরা লাশ দেখে এখনও অভ্যস্ত নয় তারা।

আকস্মিক বিস্ফোরণের মত নালা থেকে গাড়িটাকে বেরিয়ে আসতে দেখে থ হয়ে গেল শিফটারা। গাড়ির দু'পাশে ধুলোর ডানা গজিয়েছে, সবচেয়ে কাছের কুয়াটা লক্ষ্য করে উড়ে আসছে সেটা। হুঁশ ফিরে পেতে অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেল তাদের, তারপর একজন নড়ে উঠতে বাকি সবাই নড়ল, ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে ঝেড়ে দৌড় দিল সবাই—গাঢ় রঙের ইউনিফর্ম পরা ক্ষুদে একদল মূর্তি, বিদ্যুৎবেগে ওঠা-নামা করছে হাত আর পা।

'গাড়ি ঘোরাও,' নির্দেশ দিল রানা, ফুলে উঠল গলার রগ। 'ক্রস-টা দেখাও ওদের।'

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে তীক্ষ্ণ কোণ সৃষ্টি করে বাঁক নিল অ্যানি, কয়েক সেকেন্ড মাত্র দুটো চাকার উপর সচল থাকল গাড়ি, বিশাল লাল ক্রস চিহ্নটা শিফটাদের দিকে ঘুরে গেল।

'তোমার শার্টটা দাও,' আবার নির্দেশ দিল রানা, ওদের সঙ্গে ওটাই একমাত্র সাদা কাপড়। 'শান্তি চাই বোঝাবার জন্যে আমার একটা পতাকা দরকার।'

'আমার গায়ে শুধু শার্ট,' পাল্টা চিৎকার করে জানাল অ্যানি। 'ভেতরে আর কিছু নেই।'

'লজ্জা ঢাকার বিনিময়ে মরতে চাও?' ধমক দিল রানা। 'যে-কোন মুহূর্তে গুলি করবে ওরা।'

স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত তুলে নিল অ্যানি, শার্টের বোতাম খুলল, স্কার্টের ভিতর থেকে শার্টের কিনারা টেনে বের করবার জন্য ঝুঁকে পড়ল সিট থেকে সামনের দিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে শার্টটা গা থেকে নামাল, দলা পাকিয়ে তুলে দিল মাথার দিকে। যতবার

ঝাঁকি খেলো গাড়ি, রাবার বলের মত ওঠা-নামা করল তার স্তন, ভব্যতা আর কর্তব্য ডাক দেওয়ার আগে, সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময় রানার মনোযোগ কেড়ে নিল দৃশ্যটা। টারিটে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, হাত দুটো মাথার উপর ছড়ানো, শার্টটা পতাকার মত বাতাসে ওড়াল, গাড়ির গায়ে হাঁটু ভাঁজ করা পা সাঁটিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে।

ট্রেঞ্চের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকশো শিফটা সৈনিকের চোখে দুটো জিনিস বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ধরা পড়ল—রেডক্রস আর সাদা পতাকা। দুটোই এমন শক্তিশালী প্রতীকচিহ্ন, যতই না কেউ রক্তপিপাসু হোক, মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল থাকলেও, গুলি করতে ইতস্তত করবে সে।

'কাজ হচ্ছে!' আচমকা গাড়ি ঘোরাল অ্যানি, টারিট থেকে ছিটকে পড়ে যাবার অবস্থা হলো রানার, আগের পথে ফিরে এল নিতম্বিনী।

শার্ট ফেলে দিয়ে টারিটের কিনারা আঁকড়ে ধরল রানা, ডানা মেলা সাদা পাখির মত উড়ে গেল সেটা।

'ওই যে! ওই যে বানু!' আবার চেঁচাল অ্যানি। নাক বরাবর সামনে সাদা স্ট্যালিয়নের লাশ পড়ে রয়েছে। ব্রেক করল সে, পিছলানো চাকায় কয়েক সেকেন্ড সচল থাকল নিতম্বিনী, তারপর ঘোড়াটার পাশে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, লাশের স্তূপ আর শিফটাদের মাঝখানে নিশ্ছিদ্র আড়াল তৈরি করল গাড়িটা।

ক্যাবে নামল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে সরে এসে গাড়ির পিছনের ডাবল-ডোর খুলে ফেলল। 'হ্যাচ কাভার নামিয়ে রাখো, ফর গডস সেক!' নির্দেশ দিল অ্যানিকে, 'খোদার দোহাই, মাথা তুলো না!'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল

অ্যানি।

‘তর্ক কোরো না,’ রানার চেহারা মারমুখো, অ্যানির অপূর্ব সুন্দর বুক থেকে জোর করে ছিঁড়ে আনতে হলো দৃষ্টি। ‘ওখান থেকে একচুল নড়বে না—এঞ্জিনটা চালু থাকে যেন।’

দড়াম করে খুলল দরজা, সামনে মাথা দিয়ে গড়িয়ে ঝুরঝুরে মাটিতে পড়ল রানা। থুথুর সঙ্গে মুখভর্তি ধুলো ফেলে সাদা ঘোড়ার দিকে ক্রল করে এগোল ও। কাছ থেকে পেটটা অস্বাভাবিক ফোলা আর ঢলঢলে লাগল, ঝাঁঝরা শরীর ঘিরে ভন ভন করছে ইস্পাত নীল মাছি। বানুর নীচের দিকটা চাপা পড়ে রয়েছে স্ট্যালিয়নের তলায়, মেয়েটার মুখ সেঁটে রয়েছে মাটির সঙ্গে।

নগ্ন শিশুর মৃত্যুর কারণ সহজেই অনুমান করতে পারল রানা। তার ছোট্ট খুলির একটা পাশ ভিতর দিকে দেবে গেছে, সম্ভবত ধরাশায়ী হবার সময় ঘোড়ার বিদ্যুৎগতি একটা পা লেগেছিল ওখানে। সে-ও চাপা পড়ে আছে ঘোড়ার নীচে, চ্যাপ্টা হয়ে আছে ছোট্ট বুকটা। বিষণ্ন মনে বানুর দিকে ফিরল ও।

‘বানু,’ ডাকল রানা, কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুলল সে, গভীর কালো বড়বড় চোখে নগ্ন আতংক নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। তার সারা মুখে ধুলো, মাটিতে ঘষা খেয়ে চামড়া উঠে গেছে কপালের। ‘তোমার গুলি লেগেছে?’ তার পাশে পৌঁছল রানা।

‘জানি না,’ স্বর ফুটল কি ফুটল না, খসখসে গলায় বলল বানু।

রানা দেখল বানুর আলখেল্লা আর আঁটো পা’জামায় রক্তের ঘন দাগ লেগে রয়েছে। ঘোড়ার লাশে দুটো পা ঠেকাল ও, ঠেলে সরিয়ে ওটার নীচে থেকে মুক্ত করতে চাইল বানুর পা দুটো। কিন্তু লাশটা বিশাল আর অসম্ভব ভারি। রানা বুঝল, ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়াতে

হবে ওকে, যা থাকে কপালে।

দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত হালকা স্পর্শে শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল, ধীরে ধীরে শিফটাদের সবচেয়ে কাছের ট্রেঞ্চের দিকে পিছন ফিরল ও, ঘোড়ার উপর ঝুঁকল।

লাশটার লেজ আর পিছনের একটা পা ধরে টানল রানা, চেষ্টা করল উঁচু করবার। বানুর পা আর কোমরের পাশটা চাপা পড়ে আছে, ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল সে, ঘাবড়ে গিয়ে থামতে বাধ্য হলো রানা।

কাঁদছে বানু, ধুলো মাখা গালে খুদে নালা তৈরি করে নেমে আসছে পানির দুটো ধারা, অ্যামহারিক ভাষায় কী যেন বলছে সে বিড়বিড় করে।

হাঁপাচ্ছে রানা, চোখে ঘামের ফোঁটা নিয়ে বলল, 'আরেকবার–দুঃখিত।' ঝুঁকে আবার ঘোড়ার পা আর লেজ ধরল ও।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ি থেকে অ্যানির আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। 'রানা! ওরা আসছে! জলদি! তাড়াতাড়ি করো! ওহ্ গড! ওহ্ গড!'

চরকির মত আধপাক ঘুরে গাড়ির দিকে ছুটে এল রানা, উঁচু এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল।

বড়সড় খোলা একটা গাড়ি, পিছনে লম্বা ধুলোর চওড়া লেজ মোচড় খাচ্ছে বাতাসে, ঢালের দিক থেকে খ্যাপা ষাঁড়ের মত সরাসরি তেড়ে আসছে ওদের দিকে, গাড়ির ভিতর থেকে উপচে পড়ছে সশস্ত্র লোকজন।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা, কুঁচকে থাকা চোখের পাতা তির্যক সূর্যরশ্মি ঠেকিয়ে রেখেছে। 'এ কী করে হয়!' প্রচুর ধুলো, তবু ব্যাপারটা দৃষ্টিভ্রম নয়, ওটা একটা রোলস-রয়েসই বটে।

ব্যাপারটা অবাস্তব বলে মনে হলো রানার, এই বীভৎস আর কদর্যতার মাঝখানে এমন একটা চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্য কীভাবে আসতে পারে।

‘রানা, ঈশ্বরের দোহাই! রানা!’ অ্যানির ব্যাকুল তাগাদা যেন সপাং করে চাবুক মারল রানার গায়ে, এক ছুটে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ও।

লেজ বাদ দিয়ে দুই পা ধরে লাশটাকে চিৎ করবার চেষ্টা করল রানা। কাজটায় ওর সাফল্যের উপর নির্ভর করছে তিনজনের জীবনমৃত্যু। শুধু দৈহিক শক্তি নয়, সমস্ত মনোবল একত্রিত করল রানা, ধীরে ধীরে চিত করল ঘোড়াটাকে। একদিকে বানু, আরেক দিকে অ্যানি চিৎকার করছে। এক সময় ভাঁজ করা ঘোড়ার পা বাঁকাভাবে আকাশের দিকে উঠল, আর ঠিক তখন রোলস-রয়েসের এঞ্জিনের আওয়াজ পেল রানা, অস্পষ্টভাবে কানে ঢুকল উত্তেজিত আরোহীদের চেঁচামেচি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ইচ্ছেটাকে দমন করল রানা, চিৎ হওয়া লাশটাকে টেনে আরেক দিকে কাত করল, হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটু মুড়ে বসল বানুর পাশে। পায়ের উপর দিকে গুলি খেয়েছে সে, ঢুকবার মুখে বুলেটটা ক্ষত তৈরি করেছে হাঁটু থেকে ছ’ইঞ্চি উপরে। আঙুলের স্পর্শ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল রানা হাড় ভেঙেছে কিনা, মাংসের উপর চাপ পড়তেই ক্ষত থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে এসে রাঙিয়ে দিল আঙুলের মাথা। ঊরুর পিছনে আরেকটা গর্ত পেল ও, তারমানে বেরিয়ে গেছে বুলেট, কোন হাড় না ছুঁয়েই। তবে এখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে বানু, শরীরে খুব বেশি রক্ত অবশিষ্ট নেই আর।

কালো পা’জামা ছিঁড়ে ক্ষতের উপর পট্টি বাঁধতে বেরিয়ে গেল

মূল্যবান দশ-বারোটা সেকেন্ড, তবে বাঁধনটা এত শক্ত হলো যে সঙ্গে সঙ্গে রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো। কাজ সেরে মুখ তুলল রানা, ধুলোর মেঘ তুলে নিতম্বিনীর সামনে ঘ্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস-রয়েস।

আরোহীদের মধ্যে কী নিয়ে যেন মহা হাঙ্গামা বেধে গেছে, সে দিকে তাকিয়ে আবার অবাস্তব অনুভূতিটা ফিরে এল রানার মনে। সামনের সিটে ড্রাইভারের একটা হাত স্টিয়ারিঙে, রাইফেলসহ অপর হাতটা ম্যালেরিয়ার রোগীর মত কাঁপছে। তার ফ্যাকাসে চেহারা হয় প্রচণ্ড জ্বরে নয়তো ভয়ংকর আতংকে ভিজে গেছে ঘামে। তার পাশের সিটে কুঁকড়ে বসে আছে বানরের মত ছোটখাট একজন লোক, তার এক কাঁধে রাইফেল অপর কাঁধে চৌকো আর কালো একটা ক্যামেরা, ক্যামেরার সঙ্গে অস্বাভাবিক বড় লেন্স। রোলস-রয়েসের পিছনের সিটে রয়েছে দীর্ঘদেহী এক যুবক, মুখ নয় যেন গ্র্যানিট পাথর কেটে তৈরি করা অবয়ব, গাম্ভীর্য থমথম করছে। বিপজ্জনক লোক, সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল রানা। ইটালিয়ান সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরে আছে সে, অবশ্যই বেআইনী কাজ, একজন মেজর। তার হাতেও একটা রাইফেল রয়েছে, অপর হাত দিয়ে মাঝারি আকারের এক লোককে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করছে সে। এই লোকটা সুবেশী, সুদর্শনই বলা যায়, তার কালো গ্যাবার্ডিন সুটে মেডেল আর রঙচঙে ফিতের ছড়াছড়ি। মাথায় কালো একটা হেলমেট রয়েছে, কার্নিসবিহীন। এক সেকেন্ডের মধ্যেই রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, মেজর চেষ্টা করলে কী হবে, দাঁড়ানোর কোন ইচ্ছেই নেই লোকটার। সিটের কোণে কুঁকড়ে আছে সে, যদি গোলাগুলি হয় তারই আহত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম । মেজরের বাড়ানো চওড়া হাতে ঘন ঘন চাপড় মারছে সে, চাপাকণ্ঠ প্রতিবাদমুখর, অলংকৃত পিস্তল

নেড়ে হুমড়ি দিচ্ছে মেজরকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, রোলস-রয়েসে তার উপস্থিতি স্বেচ্ছামূলক নয়।

বানুর দিকে ঝুঁকল রানা, একটা হাত রাখল তার কাঁধের নীচে, অপরটা হাঁটুর পিছনে, সিধে হলো ধীরে ধীরে। শিশুর মত ওকে আঁকড়ে ধরল বানু।

রানার এই নড়াচড়া গম্ভীরমুখ মেজরের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল, ওর দিকে রাইফেল তাক করে কঠিন সুরে একটা নির্দেশ দিল সে। ভাষাটা ইটালিয়ান, বলছে এক চুল নড়লেই গুলি করবে। মুহূর্তের জন্য ভাবল রানা, না বুঝবার ভান করবে কিনা। প্রথমে রাইফেল মাজল, তারপর লোকটার চোখ দেখল ও–না, লোকটা কথা রাখবে। রানা তার নির্দেশ অমান্য করুক, এটাই যেন চাইছে সে, গুলি করবার সুযোগ খুঁজছে। লোকটার অনড়-অটল পাথুরে ভাব এমনই ভীতিকর, যেন অদৃশ্য একটা অশুভ প্রভা ছড়াচ্ছে। বানুকে বুকের কাছে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, হার্টবিট বেড়ে গেল, কথাগুলো গুছিয়ে নিল মনে মনে।

'আমি একজন বিদেশী,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ও। 'বাংলাদেশী ডাক্তার।' নতুন কোন উপলব্ধির ছাপ মেজরের চেহারায় পড়ল না, তবে ঘাড় ফিরিয়ে অপর অফিসারের দিকে তাকাল সে। সিভিল ড্রেস পরা অফিসার নড়ে উঠল, সিট থেকে মাত্র খানিকটা নিতম্ব তুলল, তারপর আবার কী ভেবে ডুবে গেল নরম সিটে। মেজরের দীর্ঘ দেহের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কথা বলল সে।

'আপনি আমার বন্দী,' থেমে থেমে, কাঁপা গলায় ইংরেজিতে বলল সে, বলা যায় আর্তচিৎকার করে উঠল। 'আমি আপনাকে জিম্মি হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

'আপনি আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করছেন,' বলবার ভঙ্গিতে

কাঠিন্য আর অভিযোগ দুটোই ফোটাতে চেষ্টা করল রানা, অস্থির পা ফেলে নিতম্বিনীর পিছনে খোলা দরজার দিকে খানিকটা এগোল, যেন রাগের মাথায় খেয়াল করছে না কোন দিকে যাচ্ছে। 'যদিও সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। কিন্তু আমাকে আটক করার চেষ্টা হলে সেটা জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লংঘন হবে।'

'আপনার কাগজ-পত্র পরীক্ষা করতে হবে আমাকে,' বলল লোকটা, অস্বস্তিবোধ কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে সে, সুদর্শন চেহারায় রঙ ফিরে আসতে শুরু করেছে। 'আমি, কর্নেল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক, আপনাকে আদেশ দিচ্ছি, আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস এই মুহূর্তে আমার সামনে হাজির করুন।' তার দৃষ্টি ছুটে গেল বিশাল নিতম্বিনীর দিকে। 'এটা একটা সশস্ত্র যুদ্ধযান। আপনি রঙ লাগিয়েছেন ধোঁকা দেয়ার জন্যে, স্যার।'

কথা বলবার সময়, এই প্রথমবারের মত খেয়াল করল কাউন্ট, মান্ধাতা আমলের গাড়ি বা মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল নিয়ে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিদেশী লোকটা কোন অস্ত্র বহন করছে না। গাড়ির টারিটে গান-মাউন্টিং খালি। বাঁধ ভাঙা পানির মত সাহস ফিরে এল তার। এতক্ষণে সে লাফ দিয়ে সিধে হলো, সটান দাঁড়িয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল ফোলানো বুক, এক হাত কোমরে, অপর হাতের পিস্তলটা তাক করল রানার দিকে। 'আপনি আমার বন্দী,' আবার দাবি করল সে, তারপর ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে সামনের সিটে বসা বানানটো সাতাকে ফিসফিস করে বলল, 'সাতা, জলদি! বিদেশী স্পাইকে হাতেনাতে ধরলাম আমি, একটা ছবি তোলো।'

'জ্বে-আজ্ঞে, জ্বে-আজ্ঞে, ইওর এক্সেলেন্সী,' কাউন্ট মনের সাধ প্রকাশ করবার আগেই চোখে ক্যামেরা তুলেছে সাতা।

'আমি আপত্তি করছি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রানা, আড়াআড়িভাবে

আরও খানিকটা এগোল, নিতম্বিনীর খোলা দরজা ব্যাকুলভাবে ডাকছে ওকে।

'নড়বেন না, খবরদার, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন!' ধমকে উঠল কাউন্ট, আড়চোখে তাকাল সাতার দিকে। 'ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বিদেশী ভদ্রলোককে বলুন, একটু যেন ডান দিকে সরে দাঁড়ান,' জবাব দিল সাতা, এখনও তার চোখ ভিউ ফাইন্ডারে।

'ডান দিকে সরুন, স্যার,' ইংরেজিতে বলল কাউন্ট, সেই সঙ্গে পিস্তল নেড়ে দিক নির্দেশ দিল।

মনের আনন্দ চেহারায় ফুটতে না দিয়ে ডান দিকে সরে গেল রানা, নিতম্বিনীর খোলা দরজার আরেকটু কাছে চলে এল। আগের মতই প্রতিবাদমুখর ও। 'আন্তর্জাতিক রেড ক্রস আর মানবিকতার খাতিরে...'

'আজই আমি জেনেভায় রেডিও মেসেজ পাঠাব,' পাল্টা চিৎকার করল কাউন্ট, 'আপনার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইব...।'

'একটু হাসুন, মাই কাউন্ট, ইওর এক্সেলেন্সী,' বলল সাতা।

ক্যামেরার দিকে মুখ খানিকটা ঘুরিয়ে এক গাল হাসল কাউন্ট। 'তারপর গুলি করে মারব আপনাকে,' রানাকে বলল সে, বিরামহীন হাসিতে কোন ছেদ পড়ল না।

'এই মেয়েটা মারা গেলে আপনাকে দায়ী করা হবে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'আপনি বর্বরের মত আচরণ করছেন!'

অদৃশ্য হলো হাসি, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রানাকে ভেঙচাল কাউন্ট। 'আর আপনি, স্যার, হাতেনাতে ধরা পড়েছেন একজন স্পাই! আপনার যথেষ্ট প্যাঁচাল শুনেছি, এবার আত্মসমর্পণ করুন!'

পিস্তল তুলে রানার বুকের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করল সে।

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা, দেখে ফেলেছে রাইফেলের সেফটি ক্যাচ 'ফায়ার' পজিশনে নিয়ে এল মেজর, ওর পেটের দিকে তাক করা হয়েছে মাজল।

সংকট যখন তুঙ্গে, ধাতব ঝন ঝন শব্দে ড্রাইভারের হ্যাচ উন্মুক্ত হলো, সবাইকে চমকে দিয়ে নিতম্বিনীর টারিটে মাথা তুলল অ্যানি উইসপার। তার সোনালি চুল বাতাসে উড়ছে, চোখে আগুন, রাগে লাল হয়ে আছে মুখ। 'আমেরিকান প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার আমি,' তার চিৎকারও পুরুষদের চেয়ে কম জোরাল নয়। 'শতকরা একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এই অন্যায়ের বিশদ বিবরণ বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানানো হবে। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি–,' ভান নয়, নয় কোন অভিনয়, নির্ভেজাল নির্জলা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চলেছে সে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, উন্মাদিনীর মত লাফাচ্ছে আর হাত ছুঁড়ছে–বেমালুম ভুলে গেছে যে কোমর পর্যন্ত তার ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাবরণ।

একই ভুল অবশ্য তার দর্শকদের হলো না। হুড তোলা রোলস-রয়েসের প্রতিটি আরোহী এমন একটা দেশের নাগরিক যে-দেশের লোকদের অবসর সময় কাটে সুন্দরী মেয়েদের পিছু ধাওয়া করে। ওদের সবাই এ-ব্যাপারে নিজেকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বলে মনে করে।

উত্তেজনায় আর রাগে কাঁপছে অ্যানি, তারই সঙ্গে কাঁপছে তার সুডৌল বুক, সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ইটালিয়ানরা, চোখগুলোয় যতটা না অবিশ্বাস তারচেয়ে বেশি আনন্দ। উঁচিয়ে ধরা অস্ত্র নামানো হলো, সেই সঙ্গে ভুলে যাওয়া হলো সেগুলোর অস্তিত্ব। সম্মান ও ভব্যতা প্রদর্শনের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা

করল মেজর, যদিও তার সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে আবার তাকে বসিয়ে দিল কাউন্ট। ক্লাচ থেকে পিছলে নেমে গেল ড্রাইভারের পা, ফলে চারপায়ে লাফিয়ে উঠল রোলস-রয়েস, খক খক করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। সাতার গলা চিরে বেরিয়ে এল চাপা গোঙানির শব্দ, প্রশংসাসূচক শপথবাক্যের মত শোনাল সেটা। ক্যামেরাটা আবার তুলল সে, তাক করল অ্যানির দিকে, পরমুহূর্তে আবার গুঙিয়ে উঠল—এবার ব্যথায় আর হতাশায়, কারণ ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে। অ্যানির উপর চোখ রেখেই ক্যামেরাটা খুলল সে, আনাড়ি ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ফেলে দিল হাত থেকে। ক্যামেরার কথা ভুলে গেল সে, দু'কান বিস্তৃত হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকল মাখন রঙা সুন্দর দৃশ্যটার দিকে।

মাথা থেকে হেলমেট নামাল কাউন্ট, নিজেকে একজন বীরযোদ্ধা বলে ভাবছে সে। সবার চেয়ে উঁচু হবার জন্য সিটের উপর দাঁড়াল, উদ্দেশ্য অর্ধনগ্ন প্রেমের দেবীকে স্যালুট করবে। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। তার এক হাতে পিস্তল, অপর হাতে হেলমেট, হাতও ওই মাত্র দুটো। অগত্যা এক হাতে দুটো জিনিস ধরতে হলো তাকে, এক হাতে নিয়ে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখল হেলমেট আর পিস্তল, তারপর কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে অ্যানিকে স্যালুট করল। 'ম্যাডাম,' কপাল থেকে হাত নামানোর কোন লক্ষণ নেই তার। চোখ বিস্ফারিত, কণ্ঠস্বরে রোমান্টিকতার কোমল রেশ। 'মাই ডিয়ার লেডি...'

এই সময় আবার গাড়ি থেকে নামবার চেষ্টা করল মেজর, কিন্তু এবারও কাউন্ট তাকে হাঁটুর ঘন ঘন গুঁতোয় বসে থাকতে বাধ্য করল। ওদিকে আগের মতই একনাগাড়ে রাগ ঝাড়ছে অ্যানি,

তার লম্ফঝম্প আর হাত নাড়বারও কোন বিরাম নেই।

ইটালিয়ানরা রানার কথা একেবারেই ভুলে গেছে। হন হন করে এগোল ও। লম্বা কয়েকটা পা ফেলে পৌঁছে গেল নিতম্বিনীর পিছনের দরজায়। ডাইভ দিয়ে ভিতরে ঢুকল, একটা গড়ান দিয়ে বুক থেকে নামিয়ে রাখল বানুকে সিটের পিছনে, ক্ষিপ্রতায় কোন ঢিল পড়তে না দিয়ে লাথি মেরে বন্ধ করল দরজা, নামিয়ে দিল লকিং হ্যান্ডেল। 'ড্রাইভ!' অ্যানির উদ্দেশে চিৎকার করল ও, সিটে দাঁড়িয়ে থাকায় তার শুধু পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছে। 'অ্যানি!' এক হাতে তার ট্রাউজার ধরে নীচের দিকে টানল, লেদার সিটের উপর ধপ্ করে বসে পড়ল অ্যানি, এখনও অনর্গল চিৎকার করছে শত্রুদের উদ্দেশে। 'ড্রাইভ!' তার কানের কাছে গর্জে উঠল রানা। 'পালাও!'

অ্যানির আকস্মিক অন্তর্ধানে হতাশায় মুষড়ে পড়ল ইটালিয়ানরা, হতাশাজনিত আঘাতের কারণে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড পঙ্গু হয়ে থাকল তারা।

গর্জে উঠল আর্মারড কারের এঞ্জিন, সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এল সেটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘুরে যেতে শুরু করায় ঠিক গুঁতো নয়, ধাক্কা খেলো রোলস-রয়েস। সামনের মাডগার্ড তুবড়ে গেল, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল হেডল্যাম্পের কাচ। ধুলোর ঝড় তুলে ছুটল নিতম্বিনী, ঝড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হতাশাজনিত পঙ্গুত্ব থেকে সবার আগে মুক্তি পেল মেজর লুইগি রাকা। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ধরবার জন্য ছুটল, ড্রাইভারের উদ্দেশে চিৎকার করে বলছে এঞ্জিন স্টার্ট দাও। প্রথম বার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাতেই স্টার্ট নিল রোলস-রয়েস, লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে উঠে পড়ল মেজর।

'ধরো ওদের!' ড্রাইভারের কানে গরম সীসার মত আওয়াজ

ছাড়ল সে। 'ধাওয়া করো!' ঝুঁকে নিজের সিট থেকে রাইফেলটা তুলে নিল।

সবেগে ছুটল রোলস-রয়েস, তাল সামলাতে না পেরে নরম গদির উপর আছাড় খেলো কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক, মাথায় সদ্য তোলা হেলমেট হড়কে নেমে এল চোখের উপর, পালিশ করা বুট আকাশের গায়ে কিছু আঁকবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, পিস্তল ধরা হাতের অবাধ্য আঙুল চেপে বসছে ট্রিগারের উপর।

বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো বেরেটা, অল্পের জন্য সাতার কান ছুঁলো না বুলেট। সিট থেকে কাউন্টের পায়ের কাছে ক্যামেরার উপর পড়ে গেল সে, নিতম্বে ব্যথা আর মনে ভয় নিয়ে কেঁদে ফেলল।

'আরও জোরে!' ড্রাইভারের কানটাকে একাই দখল করে রেখেছে মেজর। 'ধরো ওদের! আর্মারড কারকে পিছনে ফেলে বাঁক নিতে বাধ্য করো ওদের!' প্রতি মুহূর্তে আরও তেজি হলো তার কণ্ঠস্বর, সেই পরিমাণে কর্তৃত্বের সুরও বাড়ল। আর্মারড কারের দুটো মাত্র জায়গা দুর্বল, ড্রাইভারের ভাইজার আর খোলা গান-মাউন্টিং। দুটোর একটাকে সরাসরি দৃষ্টিপথে পেলেই গুলি করবে সে।

'স্টপ!' আদেশ করল কাউন্ট। 'এরজন্যে তোমাকে আমি গুলি করে মারব!'

দুটো গাড়ি পাশাপাশি ছুটছে, মাঝখানের ব্যবধান দশ ফুটেরও কম।

ভাইজারের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রোলস-রয়েসকে দেখতে পাচ্ছে না অ্যানি, ওর চোখের সামনেটা ধরা পড়ছে ছোট্ট খিলান আকৃতি নিয়ে। সেদিকে চোখ রেখে চেঁচাল, 'কোথায় ওরা?'

নিতম্বিনী ছুটতে শুরু করবার মুহূর্তে এক কোণে ছিটকে পড়েছিল রানা আর বানু, অ্যানির প্রশ্ন শুনে হামাগুড়ি দিয়ে কমান্ড টারিটের দিকে এগোল ও। পাশের রোলস-রয়েসে তৈরি হলো মেজর, শক্ত করল পেশী, হাতের রাইফেল তুলল নিতম্বিনীর দিকে। এত কাছ থেকেও তার পাঁচটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, আর্মারড কারের খোলে লেগে পিছলে গেল সব ক'টা। মাত্র একটা বুলেট ঢুকল গান-মাউন্টিঙে।

খোলের ভিতর আটকা পড়ে, বুলেটটা ওদের তিনজনকে ঘিরে জ্যান্ত একটা মৌমাছির মত ছুটোছুটি করতে লাগল, যার গায়ে প্রথম বিঁধবে তারই ভবলীলা সাঙ্গ। অবশেষে পিছন থেকে ড্রাইভারের সিটে ঢুকল ওটা।

টারিট থেকে মাথা তুলে রানা দেখল, ওদের পাশ ঘেঁষে ছুটছে রোলস, ব্যস্ত হাতে রাইফেলটা রি-লোড করছে মেজর, অন্যান্য আরোহীরা গাড়ির সঙ্গে অসহায়ভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে।

'ড্রাইভার!' হাঁক ছাড়ল রানা। 'হার্ড রাইট!' সঙ্গে সঙ্গে অ্যানি সাড়া দিতে ক্ষণস্থায়ী গর্ববোধ করল ও, মুহূর্তের জন্য উথলে উঠল স্নেহ। এমন আকস্মিকভাবে বিশাল আর্মারড খোল ঘুরিয়েছে সে, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের সময় পায়নি রোলসের ড্রাইভার। সংঘর্ষের আওয়াজটা হলো দীর্ঘস্থায়ী বজ্রপাতের মত, উজ্জ্বল সাদা আগুনের একরাশ ফুলকি ছুটল।

'মমতাময়ী ঈশ্বরের মা, আমাদের বাঁচাও!' শুকনো চোখে কেঁদে উঠল কাউন্ট। 'আমরা মারা গেছি!'

পিছিয়ে পড়ছে রোলস-রয়েস, তবে এখনও তার গায়ে প্রায় চড়াও হয়ে রয়েছে নিতম্বিনী। দামী গাড়িটার একটা পাশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, প্রায় চেঁছে তুলে নেওয়া হয়েছে সব রঙ, তুবড়ে-তাবড়ে যা-তা অবস্থা।

সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে ঢিলেঢালা একটা লাফ দিয়ে ব্যাক সিটে আশ্রয় নিয়েছে মেজর রাকা, সংঘর্ষের পরমুহূর্তে বুঝতে পেরেছে আরেকটু দেরি হলে একটা পা চিরকালের জন্য হারাত সে। তবে ইতিমধ্যে সে তার রাইফেলে গুলি ভরা শেষ করেছে।

'দূরত্ব চাই, আমি দূরত্ব চাই।' আবার ড্রাইভারের কানটা দখল করল মেজর রাকা। 'তা না হলে আমি গুলি করতে পারছি না!'

কিন্তু অবশেষে কাউন্ট তার সাহস এবং ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে, হেলমেটটা চোখ থেকে মাথার উপর তুলল সে। 'স্টপ, ইউ ফুল! খচ্চরের বাচ্চা, বাপকে চিনতে ভুল করছিস!' পরিষ্কার গলা তার, অত্যন্ত জরুরী সুর। 'তোর না হয় প্রাণের মায়া নেই, ক'পয়সাই বা দাম, কিন্তু আমি একজন কাউন্ট—থাম! থাম! স্টপ!'

পরম স্বস্তির সঙ্গে ব্রেক করল ড্রাইভার, আজ সারাদিনে এই প্রথম হাসল।

'গাড়ি ছাড়ো! ড্রাইভার, গাড়ি ছাড়ো!' এবার শুধু গর্জন নয়, ড্রাইভারের কানে রাইফেলের মাজল ঢোকাবার চেষ্টা করল মেজর রাকা। বেচারা ড্রাইভারের হাসি দপ করে নিভে গেল, সামনে এগিয়ে যাওয়া আর্মারড কারের দিকে চোখ রেখে আবার গাড়ি ছাড়ল সে।

'স্টপ!' বলল কাউন্ট, টলতে টলতে দাঁড়াল সে, এক হাতে মাথার সঙ্গে চেপে ধরে আছে হেলমেট, অপর হাতে ড্রাইভারের খালি কানটায় পিস্তলের মাজল ঢুকানোর চেষ্টা করছে। 'আমি, তোমার কর্নেল, আদেশ করছি! থামো!'

'থামলেই গুলি!' হুমকি দিল মেজর। 'যেতে থাকো!'

দুই কানে ধাতব ছিপি থাকায় কারও কথাই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না ড্রাইভার। চোখ বন্ধ করল সে, যা থাকে কপালে। হাত

দুটো স্টিয়ারিঙ থেকে তুলে নিতে সাহস পেল না। তীরবেগে ছুটল রোলস-রয়েস। সামনে পিঠ উঁচু লাল মাটি, ওই প্রায়-খাড়া ঢালই পাহারা দিয়ে রেখেছে নালার মুখটাকে—প্রতি মুহূর্তে ওদের দিকে ছুটে আসছে সেটা।

রোদে পোড়া মাটির পাঁচিলে রোলস-রয়েস ধাক্কা খেতে যাচ্ছে, তবে তার আগেই উভয়সংকট থেকে রক্ষা পেয়ে গেল ড্রাইভার। আব্বাস খায়ের, সমমনা আরেকজন সঙ্গীর অনুপস্থিতিতে, সে তার যুদ্ধপ্রিয় দাদুর গর্ব আর গৌরবের কাছে ব্যাকুল আবেদন জানাল। পাল্টা কৌতুক করতে গিয়ে মাইকেল সেভারস্ যদিও তাঁকে যথেষ্ট তেজ খাইয়ে দিয়েছে, নাতির আবেদনে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন প্রাচীন বীরযোদ্ধা, দেহরক্ষীদের নিজের চারদিকে জড়ো করে নির্দেশ দিলেন, সবাই তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। নালা ধরে ছোট্ট আরেকটা জনতার ঢল নামতে শুরু করল, সবার আগে কামাল হাসান আর আব্বাস খায়ের।

নালা থেকে বেরিয়ে এল দু'জন, দেখল ধুলোর পাহাড় তুলে আর্মারড কার আর রোলস-রয়েস সরাসরি ওদের দিকেই ছুটে আসছে। যে-কোন দুঃসাহসী প্রেমিকের জন্যও দৃশ্যটা ভীতিকর, ডাইভ দিয়ে লাল মাটির গোড়ায় আশ্রয় নিল আব্বাস। কিন্তু কামাল হাসান তার বরাদ্দের সিংহটা অনেক আগেই বধ করেছেন, তাঁর এমনকী চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না। পুরানো বন্ধু মার্টিনি হেনরি রাইফেলটা তুলে গুলি করলেন তিনি। কামান দাগবার মত আওয়াজ হলো, নীল ধোঁয়ার বিশাল একটা বেলুন ফুলে উঠল, ব্যারেল থেকে ছুটল লম্বা লাল শিখা।

রোলসের উইন্ডস্ক্রীন ভাঙবার দৃশ্যটা দেখবার মত হলো, কাচ নয় যেন বিস্ফোরিত হলো একতাল রুপো, তারই একটা টুকরো

কেটে দিল কাউন্টের একদিকের গাল।

'ঈশ্বরের নিষ্ঠুর মা, আমি মারা গেছি!' হাউমাউ করে উঠল কাউন্ট। 'শেষ পর্যন্ত বেজন্মা ড্রাইভারের জন্যে তাৎপর্যহীন মৃত্যুকে মেনে নিতে হলো...!' যেন ঠিক এই গুলি আর গালিটার জন্যই অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার, চোখ খুলেই বন বন করে স্টিয়ারিঙ ঘোরাল সে, সগর্জনে বাঁক নিতে শুরু করল রোলস-রয়েস। যথেষ্ট হয়েছে, মেজরের শত হুমকিও এখন আর ড্রাইভারকে দ্বিধায় ফেলতে পারবে না, ঘাঁটিতে ফিরবে সে।

'মাই গড!' হাঁপিয়ে উঠে বলল অ্যানি, দেখতে পেল বাঁক ঘুরে ফিরে যাচ্ছে তোবড়ানো রোলস-রয়েস। গাড়ির ভিতর আরোহীরা এখনও পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, আকাশের দিকে মুখ তুলে রয়েছে রাইফেল আর পিস্তলের মাজল, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের চেঁচামেচি।

আবার গর্জে উঠল কামাল হাসানের রাইফেল, ইটালিয়ানদের পলায়ন আরও দ্রুতগতি হলো, তার কাছাকাছি এসে নিতম্বিনীর ব্রেক কষল অ্যানি। নীচে নেমে প্রাচীন বৃদ্ধকে গাড়িতে তুলে নিল রানা, তাঁর চোখ রক্ত ভরা দুটো আঙুর যেন, গা থেকে যে গন্ধটা ছড়াচ্ছে তা শুধু মদ চোলাইয়ের কারখানায় পাওয়া যায়, তবে তাঁর জ্ঞানপাপী পুরানো চেহারা শত সহস্র বলিরেখা নিয়ে উজ্জ্বল তৃপ্তিমাখা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। 'হাউ ডু ইউ ডু?' ভুরু নাচিয়ে পরম আনন্দের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মন্দ নয়, স্যার,' তাঁকে আশ্বস্ত করল রানা। 'কোনভাবেই খারাপ বলা যায় না!'

চোদ্দ

দুপুরের খানিক আগে, কুয়াগুলোর বিশ মাইল সামনে ঘাস মোড়া খোলা প্রান্তরে আর্মারড কারগুলো থামানো হলো, পিছিয়ে পড়া আদিবাসীরা যাতে ওদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এখানেই প্রথম সুযোগ পেল অ্যানি বানুর শুশ্রূষা করবার। গত এক ঘণ্টায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার পা, ক্ষতের উপর জমাট বেঁধে রয়েছে রক্ত। ক্ষতটা পরিষ্কার করবার সময় বানু প্রতিবাদ না করলেও তার চেহারা ম্লান কাদার মত হয়ে উঠল, কপাল আর ঠোঁটের উপর ঘাম ফুটল বিন্দু বিন্দু। বানুর মন অন্য দিকে ফেরাবার জন্য উপত্যকার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিল অ্যানি।

চুপ করে শুনবার পর বানু বলল, 'রোগশোক, খিদে আর পাহাড়ে যুদ্ধ করে যুগ যুগ ধরে আমরা শুধু মারাই যাচ্ছি–না আছে কোন উদ্দেশ্য, না কারণ।' দার্শনিকসুলভ বিষণ্ন একটা ভাব ফুটল তার চোখে। 'কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আলাদা। আজ যারা মারা গেল তাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল–আমাদের কথা দুনিয়ার লোককে জানিয়ে গেল ওরা।' ক্ষতের উপর ডিজইনফেকট্যান্ট জ্বালা করে ওঠায় গুঙিয়ে উঠল সে।

'দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি বলল অ্যানি।

'ও কিছু না,' বলল বানু, তারপর কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলল না। এক সময় জিজ্ঞেস করল সে, 'বিষয়টা নিয়ে তুমি লিখবে, তাই না, অ্যানি?'

'অবশ্যই,' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল অ্যানি। 'অবশ্যই লিখব। আচ্ছা বলতে পারো, টেলিগ্রাফ অফিস পাব কোথায়?'

'সারডিতে আছে একটা,' জানাল বানু। 'রেলওয়ে অফিসে।'

ওষুধের বাক্স থেকে ব্যান্ডেজ বের করে ক্ষতটা বেঁধে দিল

অ্যানি। এক সেকেন্ড ইতস্তত করবার পর বলল, ‘তোমার পরনের পা’জামা খুলতে হবে। এত টাইট পরো কী করে? ঘা হয়ে যায়নি সেটাই আশ্চর্য!’

‘এভাবেই পরার নিয়ম,’ ব্যাখ্যা করল বানু। ‘নিয়ম নয়, বলতে পারো আইন। আমার দাদুর দাদু রাস আবদুল্লাহি আইনটা করে গেছেন।’

‘গুড লর্ড।’ অ্যানি শুধু বিস্মিত নয়, অস্বস্তিও বোধ করল। ‘কিন্তু কেন?’

‘আগেকার দিনে মেয়েরা খুব পাজি ছিল,’ ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে বলল বানু। ‘আর আমার দাদুর দাদু ছিলেন নিতান্ত ভাল মানুষ। পা’জামা খোলা যাতে সহজ না হয় সেজন্যেই এই আইন তৈরি করেন তিনি।’

হেসে উঠল অ্যানি। ‘তার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? মানে, আজকালকের মেয়েরা কি কঠিন বলে ঘন ঘন পা’জামা খুলবার চেষ্টা বাদ দিয়েছে?’

‘আরে না!’ হেসে উঠল বানুও। ‘তবে কাজটা সত্যিই কঠিন।’ তার সুরটা এমন, যেন অভিজ্ঞতা থেকে বলছে। ‘অবশ্য খোলার সময় তেমন অসুবিধে হয় না–অসুবিধা হয় তাড়াতাড়ি পরার সময়।’

ওষুধের বাক্স থেকে একটা কাঁচি বের করল অ্যানি। ‘তোমার এটা কেটে নামাতে হবে।’

‘এত সুন্দর একটা জিনিস, কাটো–রানা তো আগেই ওটার বারোটা বাজিয়েছে।’

কাঁচি দিয়ে কেটে পা’জামাটা বানুর কোমর থেকে খসিয়ে আনল অ্যানি। ‘এবার তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।’ তার

গায়ে একটা উলেন আলখেল্লা চাপাল সে, কোমর থেকে নীচের দিকটা নগ্নই থাকল। গাড়ির মেঝেতে, মোটা চটের উপর শুয়ে আছে সে।

পোর্টেবল টাইপরাইটার নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে অ্যানি, পিছু ডাকল বানু, 'চলে যেয়ো না, ভাই। আমার সাথে আর কিছুক্ষণ থাকো।'

ইতস্তত করে অ্যানি বলল, 'কিন্তু আমাকে যে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।'

'এখানে বসে করো। আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।'

'প্রমিস?'

'আই প্রমিস।'

কেস থেকে বের করে টাইপরাইটারটা কোলে নিল অ্যানি, লম্বা করে একটার উপর আরেকটা তুলে দিয়েছে পা। মেশিনে নতুন কাগজ ভরে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল সে। তারপর তার আঙুল প্রজাপতির মত ছুঁয়ে যেতে শুরু করল কী-গুলোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাগ আর ভাবাবেগ ফিরে এল তার মধ্যে, প্রাঞ্জল শব্দের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হলো সব হলুদ কাগজের বুকে। তার চেহারায় লালচে আভা ফুটল, মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে সোনালি চুল সরাল চোখ থেকে।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকল বানু, নড়ছে না বা কথা বলছে না। তারপর আরেকটা নতুন কাগজ ভরল অ্যানি মেশিনে, এই সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল সে। 'ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করেছি, অ্যানি।'

'করেছ?' অ্যানি মুখ তুলে তাকাল না।

'আমার ধারণা লোকটা মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা?' দ্রুত মুখ তুলল অ্যানি, হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তনের

কারণ বোধগম্য হলো না।

'হ্যাঁ,' নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বানু। 'তোমার প্রথম প্রেমিক হিসেবে রানাকেই আমরা গ্রহণ করব।' বলবার ঢঙে পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্যাপারটাকে দলীয় আয়োজন হিসাবে দেখছে সে।

'তাই? তোমার বুঝি সেরকম ধারণা?' ধারণাটা আগেই অ্যানির মাথায় ঢুকেছে, বলা যায় প্রায় শিকড় গেড়ে বসেছে, কিন্তু এরকম একটা ব্যক্তিগত বিষয়ে এত স্পষ্ট রায় আরেকজনের কাছ থেকে আসায় দ্রুত উপেক্ষা করবার একটা প্রবণতা পেয়ে বসল তাকে।

'সত্যিকার একটা পুরুষ! গায়ে কী জোর! তেমনি সাহস। হ্যাঁ, ওকেই।' বলে চলেছে বানু, 'আমার ধারণা, রানাকেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।' কথাগুলো বলে, রানার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, এক নিমেষে সেটাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিল সে।

এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নাক টানল অ্যানি, ঝড় তুলল টাইপরাইটারে। আসলে সে স্বাধীনচেতা মেয়ে—যে কিনা ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করে।

ঢেউ খেলানো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে ঘাস মোড়া মুক্ত প্রান্তর পর্যন্ত পশু আর মানুষ গিজগিজ করছে। গোটা এলাকার উপর মিহি ধুলো উড়ছে, রোদ লেগে চারদিকে ঝিক ঝিক করছে বর্শার ফলা আর তামার ঢাল। গোত্রে যারা প্রভাবশালী শুধু তারা ঘোড়ায় চেপে আসছে, তাদের প্রায় সবার পরনে রঙচঙে সিল্কের আলখেল্লা। মাল-পত্র বয়ে আনছে পশুগুলো, তাদের মধ্যে দূর

দিগন্তের কাছে চেনা যাচ্ছে শুধু উটগুলোকে।

চঞ্চলার টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, হেলমেটের ছায়ায় বিনকিউলারের লেন্স, ধুলোর পাহাড় ভেদ করে দূরে চলে গেছে ওর দৃষ্টি, বিশৃংখল আদিবাসীদের ঘাড়ে চড়াও হবার জন্য শিফটারা ধাওয়া করে আসছে কিনা বুঝতে চায়। খারাপ দিকটা কল্পনা করতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল ওর। শিফটারা এখন যদি এসে পড়ে, আবার পাইকারীভাবে মারা পড়বে আদিবাসীরা—শিকার হবে ক্রস ফায়ারের।

হঠাৎ রানার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। ওদের অস্ত্রগুলো কখন পৌঁছুবে কে জানে। এই জনারণ্যের ভিতর কোথায় সেগুলো লুকিয়ে আছে তাই বা কে বলবে!

কাঁধে হাত পড়ায় ঘাড় ফেরাল ও। দেখল পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্স হাসান সালে।

'ধন্যবাদ, মি. রানা,' শান্ত গলায় বলল প্রিন্স।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার চোখে বিনকিউলার তুলল রানা।

'ঠিক কাজটি করেছ তা বলি না, তবু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।'

'কেমন আছে ও?'

'এইমাত্র মিস অ্যানির সাথে দেখে এলাম, বিশ্রাম নিচ্ছে—তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে।'

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল, তারপর প্রসঙ্গটা তুলল রানা, 'আমার চিন্তা হচ্ছে, প্রিন্স। একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি আমরা। শিফটারা যদি ধাওয়া করে, বীভৎস কাণ্ড ঘটে যাবে। অস্ত্রগুলো কোথায় বলতে পারো? ওগুলো আমাদের এখুনি দরকার।'

জনারণ্যের বাম দিকের শাখাটার দিকে হাত তুলল প্রিন্স। 'ওই

তো।’

একদল উটকে এই প্রথম খেয়াল করল রানা, দূরত্ব আর ধুলোর পাহাড় অস্পষ্ট করে রেখেছে, তবে ওগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা হারারি পনিগুলোর চেয়ে অনেক উঁচু। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় অচল নয়, এদিকেই এগিয়ে আসছে।

‘পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লাগবে,’ বলল প্রিন্স।

খানিকটা স্বস্তিবোধ করল রানা। একটা প্ল্যান তৈরি করল মনে মনে, ভিকার্স গানগুলো তাড়াতাড়ি আর্মারড কারে তুলতে হবে। শিফটারা হামলা করলে পাল্টা জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি থাকা চাই ওদের। ওর চিন্তায় বাধা দিল প্রিন্স।

‘মি. রানা, মেজর সেভারসকে কতদিন থেকে চেনো তুমি?’

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে নিঃশব্দে হাসল রানা। ‘কখনও এমনও মনে হয় যেন আগের জন্ম থেকে চিনি ওকে,’ বলেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে, কারণ উদ্বেগ ফুটে উঠেছে প্রিন্সের চেহারায়। ‘না, ব্যঙ্গ করছি না। ঠাট্টা করছিলাম। ওর সাথে পরিচয় হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি।’

‘ওর সম্পর্কে অত্যন্ত ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর এই দায়িত্বটা দিয়েছি ওকে...।’

‘দায়িত্ব মানে ফাঁদে ফেলে ভাড়া করেছ, আদিবাসীদের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে?’

ক্ষীণ একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স। ‘ঠিক তাই,’ বলল সে। ‘আমরা জেনেছি, বিবেকবর্জিত নিষ্ঠুর লোক সে, নীতির কোন বালাই নেই, কিন্তু আনাড়ি রিক্রুটদের ট্রেনিং দেয়ার কাজে ভারি দক্ষ। এক্সপার্ট উইপন ইনস্ট্রাকটর। মডার্ন আগ্নেয়াস্ত্রের

মেকানিজম আর ব্যবহার সম্পর্কে ভাল জানে।'

'শুধু ভুল করেও তার সাথে তাস খেলতে বোসো না।'

'পরামর্শটা মনে থাকবে, মি. রানা।' একটু হাসল প্রিন্স, পরমুহূর্তে আবার গম্ভীর হলো। 'মিস অ্যানি উইসপার তাকে কাপুরুষ বলেছে। কথাটা ঠিক নয়। আমার নির্দেশ পালন করছিল মাইকেল, একজন সৈনিকের যেমন করা উচিত।'

'কী বলতে চাও বোঝা গেল,' হাসল রানা। 'তবে আমি সৈনিক নই, স্রেফ সাধারণ একজন মেকানিক।'

'কী উদ্দেশ্যে বা কারণে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাও তুমি, সেটা আমার কৌতূহলের বিষয় নয়,' বলল প্রিন্স। 'তোমার যে সব ব্যাপারেই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে তা বেশ বোঝা যায়। মাইকেলের সাথে তোমাকে উপরি হিসেবে পেয়েই আমি সন্তুষ্ট।'

রানা বিব্রত বোধ করলেও হাসির আড়ালে সেটা চাপা থাকল। 'আমরা মাইকেল প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'হ্যাঁ। মাইকেল তার সামরিক জীবন সম্পর্কে যতই কমিয়ে বলুক তার কৃতিত্ব সম্পর্কে সবই আমি জানি। ট্রেনার হিসেবে ন্যাটোয় ছিল সে। বড় কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তা সত্যি, কিন্তু একাধিক মহড়ায় পদক পেয়েছে সে।'

'মানুষ হিসেবে নিজেকে সে যতটা ভাল বলে জানে,' বলল রানা, 'আসলে তারচেয়ে ভাল সে।'

মাথা ঝাঁকাল প্রিন্স সালে। 'আমি তার সামরিক অভিজ্ঞতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিই। মাইকেল সত্যি একজন দক্ষ...'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে কনভিন্স করতে পেরেছ,' প্রিন্সকে বাধা দিল রানা। 'সেটাই তো চাইছ, তাই না?'

'না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল প্রিন্স। 'আশা করছিলাম

তুমি হয়তো কনভিন্স করতে পারবে আমাকে।' দু'জনেই ওরা হেসে উঠল।

'বললে আমার সম্পর্কে তোমার কৌতূহল নেই, তারমানে কি খোঁজ নেয়ার চেষ্টাও করোনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'করিনি,' বলল হাসান সালে। 'তোমার কথা প্রথম আমি দার-এস-সালামে শুনি। তুমি আর তোমার আর্মারড কার–জাদুর একটা বাক্স হিসেবে গ্রহণ করি আমি।' একটু থেমে মুখ তুলে সরাসরি রানার চোখে তাকাল সে, নিচু গলায় বলল আবার, 'রাগটা তোমার ভেতর এখনও রয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি আমি।'

অবাক হয়ে উপলব্ধি করল রানা, প্রিন্স ঠিকই বলছে। এ ধরনের অকারণ মানবহত্যার ঘটনা আর মাত্র একটা চাক্ষুষ করেছে ও। একাত্তরে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যখন গণহত্যা চালিয়েছিল। সেটা ছিল ওর প্রিয় দেশকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র। হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল রানা। ভাড়াটে ইটালিয়ান অফিসার আর শিফটাদের প্রতিও সেই একই আক্রোশ জেগেছে ওর মনে। উপত্যকায় যে নির্মম দৃশ্য চাক্ষুষ করেছে আজ, কোনদিন ভুলবে না।

'আমার বিশ্বাস, আমাদের সাথে সাময়িকভাবে হলেও, একটা বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছ তুমি, মি. রানা,' নরম সুরে, বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স হাসান সালে।

তার গভীর সত্যকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না রানা। এ-ব্যাপারে নিজের প্রতি ওর কোন প্রতিশ্রুতি আছে কিনা এখনও তা পরিষ্কার নয়। আফ্রিকায় পা ফেলবার পর নিজের ছাড়া অন্য কারও সমস্যা নিয়ে এই প্রথম বিচলিত বোধ করছে ও। কাল পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল, মাইকেল আছে বলে সে-ও

আছে, বিশেষ করে সভ্য দুনিয়া থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যটা যখন পূরণ হচ্ছে। কিন্তু আদিবাসীদের অসহায়ভাবে মরতে দেখবার পর এখানে ওর উপস্থিতি অন্য এক তাৎপর্য বহন করছে। যতদিন দরকার, আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে ওকে। অসহায় মানুষকে ক্রীতদাস হতে দিলে, গোটা মানবকুলকে, মাসুদ রানাকে সহ, অপমানিত হতে দেওয়া হবে, সবার সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হবে তারও খানিকটা স্বাধীনতা।

'নো ম্যান ইজ অ্যান অ্যাইল্যান্ড...,' বলল রানা।

'...এন্টায়ার অভ ইটসেলফ্। এনি ম্যান'স ডেথ ডিমিনিশেস মি, বিকজ আই য়্যাম ইনভলভড্ ইন ম্যানকাইন্ড,' মাথা ঝাঁকিয়ে উদ্ধৃতিটা পূরণ করল প্রিন্স সালে। প্রিন্সের গভীর কালো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'হ্যাঁ, মি. রানা—জন ডন। তোমাকে পেয়ে সত্যি আমি গর্বিত। তুমি যদি আগুন হও তো মাইকেল সেভারস্ বরফ। দু'জনেই তোমরা আমার উপকার করবে। আমি বুঝতে পারি, এরইমধ্যে তোমরা দু'জন একটা বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছ।'

'বাঁধন?' হেসে উঠল রানা, সামান্য কর্কশ শোনাল, নিরেট কোন সত্য অস্বীকার করতে যাওয়ার ফল কিনা বোঝা গেল না। তবে হাসি থামিয়ে প্রিন্সের কথাগুলো ভাবল ও। যতটুকু আন্দাজ করা যায়, লোকটার উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তার চেয়েও বেশি। অচেনা সত্য উন্মোচিত করে দেখানোর একটা অদ্ভুত শক্তি রয়েছে তার ভিতর।

'হ্যাঁ, মি. রানা, একটা বাঁধন। আগুন আর বরফ। তুমি দেখো, এক সময় বুঝতে পারবে নিজেই।'

বেশ কিছুক্ষণ ওরা কথা বলল না। চঞ্চলার টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন, গায়ে রোদ, যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন।

এক সময় পশ্চিম দিকে তাকিয়ে একটা হাত তুলল প্রিন্স

সালে। 'ওই দেখা যায় ইথিওপিয়ার হৃদয়,' বলল সে। 'পাহাড়।' দু'জনেই ওরা আকাশ ছোঁয়া পাহাড়শ্রেণীর দিকে মুখ তুলল।

প্রতিটি মালভূমিকে দু'ভাগ করেছে পাথরের খাড়া পাঁচিল, পাঁচিলের উপর পরবর্তী মালভূমি, উঁচু আর বহুদূরে বলে নীলচে একটা ধোঁয়াটে ভাব ঘিরে আছে, মেঘগুলো যেন মালভূমি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়শ্রেণীর মাথার উপর, পাহাড়ের গায়ে মুখ ব্যাদান করে আছে গিরিসংকটগুলো।

'এই পাহাড়ই আমাদের রক্ষা করে। দু'দিকে একশো মাইল পর্যন্ত এমন কোন ফাঁদ নেই যেটা দিয়ে ঢুকতে পারবে শত্রুরা।' হাত তুলে দক্ষিণ আর উত্তর দিকটা দেখাল প্রিন্স, দু'দিকেই নীলচে অস্পষ্টতার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড়শ্রেণী।

'কিন্তু ওই যে, সারডি গিরিসংকট রয়েছে,' বলল রানা, পাহাড়ের গায়ে গভীর চেরা দাগটা পরিষ্কারই দেখতে পেল, চোঙ আকৃতির একটা গহ্বর। দূরে বলে সরু দেখালেও, সবচেয়ে চওড়া অংশটা প্রায় পনেরো মাইলের কম হবে না, তারপর দ্রুত চিকন হয়ে খাড়াভাবে উঠে গেছে, মিলিয়ে গেছে আরও উঁচু অস্পষ্টতার ভিতর।

'হ্যাঁ, সারডি গিরিসংকট!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল প্রিন্স সালে। 'সম্রাটের সম্রাট, হাইলে সেলাসি, তাঁর নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্যে উত্তরে সৈন্য মোতায়েন করেছেন। কমিউনিস্টদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে ওখানে। কমিউনিস্টদের বড় একটা দল রওনা হয়েছে। অনেক আগেই, প্রায় দেড় লাখ ইরিত্রীয়। ইরিত্রিয়া প্রায় খালি হয়ে গেছে। আর সেজন্যেই তো শিফটারা এতটা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।'

'তারমানে সম্রাটের কাছ থেকে তোমরা কোন সাহায্য পাবে

না,’ আশংকা প্রকাশ করল রানা।

‘এখনও আমি হতাশ নই,’ বলল প্রিন্স। ‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখব। যদি ব্যর্থ হই, শেষ উপায় হিসেবে কমিউনিস্টদের ধরব। হয়তো ওরাই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে আমাদের। মোট কথা, কারও না কারও সাহায্য আমাদের পেতেই হবে। কারণ, আমার কাছে গোপন খবর আছে, শিফটাদের আরও অনেক বড় বাহিনী গিরিসংকট পেরিয়ে আসতে পারে এদিকে। আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার, শিফটাদের সঙ্গে নাকি কয়েক হাজার ভাড়াটে সৈনিকও থাকবে। তারা আসবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সম্রাটের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার জন্যে। ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্টদের আমি পছন্দ করি না, তবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কারও সঙ্গে হাত মেলাতেই আমার কোন আপত্তি নেই।

‘সারডি গিরিসংকটে আসার পথটা অত্যন্ত দুর্গম, কিন্তু শিফটারা দুর্গম এলাকায় চলাফেরা করে অভ্যস্ত। তা ছাড়া, তাদের সাথে থাকবে ইটালিয়ান উপদেষ্টা–সেই জুলিয়াস সিজারের যুগ থেকেই এঞ্জিনিয়ারিঙে ওস্তাদ ওরা। গিরিসংকটের মুখে যদি শিফটা বাহিনী পৌঁছুতে পারে, হাইল্যান্ডের ভেতর দিকে পঞ্চাশ হাজার লোক পাঠাতে ওদের খুব বেশি হলে এক হপ্তা লাগবে।

‘তার মানে সম্রাটের বাহিনী আর কমিউনিস্টদের পিছনে পৌঁছে যাবে ওরা–সম্রাট আর তাঁর রাজধানী আদ্দিস আবাবার মাঝখানে–শহরে ঢোকার পথটা সম্পূর্ণ খোলা থাকবে তাদের সামনে। এটা যদি ঘটে, শেষ হয়ে যাব আমরা। শিফটারা তা জানে–ওয়েলস অভ চান্ডিতে তাদের উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। আজ আমরা যাদের সামনে পড়েছিলাম তারা ছিল ছোট্ট অ্যাডভান্স পার্টি। ওদের পিছু পিছু আসছে বিশাল শিফটা বাহিনী। গিরিসংকট পেরিয়ে এদিকে চলে আসবে ওরা…।’

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘ব্যাপারটা সেরকমই মনে হচ্ছে।’

‘সম্রাট আমার সাথে অদ্ভুত এক খেলা খেলছেন,’ বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স হাসান সালে। ‘আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সারডি গিরিসংকট রক্ষা করতে হবে। অথচ নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমার গোত্র থেকে যোদ্ধাদের পাঠাতে হবে লেক টানার তীরে–দুশো মাইল পশ্চিমে। কারণ কমিউনিস্টদের সাথে এই মুহূর্তে ওখানে তুমুল লড়াই চলছে সেলাসি বাহিনীর। কিন্তু যোদ্ধার সংখ্যা এমনিতেই কম আমাদের। তোমাদের দু’জনকে আর আর্মারড কারগুলো পাওয়ায় সারডি গিরিসংকট হয়তো রক্ষা করতে পারব আমরা…।’

‘তুমি দেখছি খুব বেশি ভরসা করছ আমাদের ওপর,’ বলল রানা। ‘আর্মারড কারগুলো কিন্তু তেমন কোন কাজে আসবে না…।’

‘আমি জানি, মি. রানা। সেজন্যেই তো পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টাই আমি চালিয়ে যাচ্ছি।’

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা।

দম নিয়ে শুরু করল প্রিন্স, ‘গালা নামে আমাদের চিরশত্রু একটা গোত্র আছে। সারডি গিরিসংকটে শিফটাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে তাদের সাথে হাত মেলাচ্ছি আমি। নূর আয়াঙ গালাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, এখন দেখা যাক সে কী করে। লোকটা আক্ষরিক অর্থেই একটা পিশাচ আর খুনী, তার লোকেরাও শিফটাদের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না, তবে তারা ভাল যোদ্ধা।’

প্রিন্স ওর উপর অনেক বেশি নির্ভর করছে, এটা বুঝতে পেরে আদিবাসীদের সঙ্গে রানার বাঁধনটা আরও যেন জোরাল হয়ে

উঠল। মৃদুকণ্ঠে বলল ও, 'বিশ্বাস করা যায় না এমন বন্ধু কিন্তু শত্রুর চেয়েও খারাপ।'

'কার উদ্ধৃতি?' কৌতূহলে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল প্রিন্স।

'মাসুদ রানা, মেকানিক।' হাসল রানা। 'দেখে শুনে সন্দেহ করার কারণ নেই, কঠিন একটা কাজ পড়েছে আমাদের ঘাড়ে। আমার কী দরকার সেটা বলি–চালাক-চতুর আর স্বাস্থ্যবান কিছু যুবক। যাদেরকে আমি গাড়ি চালানো শেখাতে পারি বা মাইকেল বন্দুক চালানো শেখাতে পারে।'

'হ্যাঁ, বিষয়টা নিয়ে এরইমধ্যে মেজরের সাথে আলোচনা হয়েছে আমার। সে-ও একই পরামর্শ দিয়েছে। বাছাই করা কিছু ছেলে তোমাদের হাতে তুলে দেব আমি।'

'কম বয়েসী হওয়া চাই,' বলল রানা। 'তাড়াতাড়ি শিখবে।'

ত্রিকালজ্ঞ প্রাচীন শকুনের আকৃতি নিয়ে মাইকেলের গাড়ি গরবিনীর ছায়ায় বসে রয়েছেন কামাল হাসান, চোখদুটো এমন কুঁচকে আছে, ঠিক যেন একজন্লাইপারের চোখ; তাঁর ঠোঁট নড়লেও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না, উত্তেজিত হাঁ করা মুখের কোণ থেকে সামান্য লালা ঝরছে। ঝুঁকে পড়ে দাদুর কার্ড দেখবার চেষ্টা করল আব্বাস, কাঁধের ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিলেন কামাল হাসান, কার্ডগুলো হাত দিয়ে বুকের সঙ্গে সেঁটে ধরলেন। তাঁর সামনে বসে রয়েছে মাইকেল সেভারস্, সে-ও তার কার্ড জ্যাকেটের সঙ্গে চেপে রেখেছে।

আব্বাস অভিযোগ করল, 'দাদু বলছেন, আমাকে তাঁর আর দরকার নেই। খেলাটা নাকি এরইমধ্যে শিখে ফেলেছেন।' এতক্ষণ দোভাষীর দায়িত্ব পালন করছিল সে।

'ওঁকে বলো, তাস খেলায় উনি সহজাত প্রতিভার অধিকারী।'

ঠোঁটের এক কোণে চুরুট চেপে রেখে অপর কোণ থেকে নীল ধোঁয়া ছাড়ল সে কামাল হাসানের মুখ বরাবর। 'বলো, মন্টি কার্লোয় একবার পৌঁছুতে পারলে সেরা জুয়াড়ী হিসেবে বরণ করে নেয়া হবে তাঁকে।'

প্রশংসা শুনে দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসলেন কামাল হাসান, তারপর মাইকেল কী কার্ড ফেলে দেখবার জন্য সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

'বেগম দরকার আছে কারও?' নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল মাইকেল, হরতনের বিবিটা সিধে করে রাখল অ্যামুনিশন বক্সের উপর।

তাসটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন কামাল হাসান, আনন্দে বগল বাজাতে শুরু করলেন। দুম করে একটা ঘুসি মারলেন বাক্সের গায়ে, তারপর হাতের সব কার্ড সিধে করে মেলে দিলেন দু'জনের মাঝখানে।

'আবার হেরে গেলাম, মাই গড!' মাইকেলের চেহারা চরম হতাশায় দুমড়েমুচড়ে বিদঘুটে আকৃতি পেল, আয়না থাকলে নিজের এই বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় দেখে মূর্ছা যেত সে।

আরও খানিকটা লালা ঝরালেন কামাল হাসান। প্রশ্ন করলেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

অদম্য হাসিতে হাড্ডিসার বৃদ্ধকে গড়িয়ে পড়তে দেখে মাইকেল বুঝল, হাঁসের গায়ে যথেষ্ট চর্বি জমেছে, এবার ওটাকে জবাই করা যেতে পারে। 'তোমার ভাগ্যবান দাদুকে জিজ্ঞেস করো, পরবর্তী খেলায় লেনদেনের ব্যবস্থা থাকবে কিনা। একদম খালি হাতে আর কতক্ষণ! আমার কাছে তাঞ্জানিয়ান শিলিং আছে। জিজ্ঞেস করো, উনি কী দিয়ে খেলতে চান।' প্রস্তাবটা ভাল করে

বোঝাবার জন্য মানিব্যাগ বের করে টাকা দেখাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন কামাল হাসান। অন্তত দশ গেম জিতেছেন তিনি। মানিব্যাগ নয়, তিনি একটা চামড়ার ছোট থলে বের করলেন, ভিতর থেকে বেরুল ইথিওপিয়ান ডলারের গোল পাকানো অনেকগুলো নোট।

লোভে চকচক করে উঠল মাইকেলের চোখ। 'তাস বাঁটুন, ওল্ড স্পোর্ট, দেরি কীসের?'

কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক নিজের তাঁবুতে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে, মাঝে মধ্যে থেমে হাত নেড়ে শাসাচ্ছে, গালাগালি করছে মেজর লুইগি রাকাকে। 'তুমি একটা ইতর, মেজর রাকা। তুমি একটা বেজন্মা, একটা শুয়োরছানা। তোমার অনেক বেয়াদপি আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তোমাকে বিশ্বাস করে কমান্ডিঙ পোস্টে চাকরি দিয়েছি, কাজেই সব দোষ আমার। হ্যাঁ, নিজেকেই আমি দায়ী করি। সেজন্যই এতদিন তোমাকে আমি কিছু বলিনি, তোমার সমস্ত অবাধ্যতা মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু আজ যা ঘটেছে, এরপর আর তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। আমিও একজন সোলজার, লুইগি রাকা, আমার ইউনিফর্মেরও একটা মর্যাদা আছে। কাজেই তোমার অপরাধ আমি দেখেও না দেখবার ভান করতে পারি না। তোমার শাস্তি, রাকা, মৃত্যুদণ্ড। আর শাস্তিটা তোমাকে আমি নিজের হাতে দেব। আমার বাহিনীর জন্য এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আজ সন্ধ্যায়, সূর্য যখন অস্ত যাবে, উপত্যকার কিনারায় দাঁড় করিয়ে আমি নিজের হাতে তোমাকে গুলি করে মারব। তবেই আমার শান্তি।'

দীর্ঘ বক্তৃতা, তবে অভ্যেস আছে, কাউন্ট হাঁপাল না। বক্তৃতা শেষ করল সে হাত দুটো নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'দিকে মেলে দিয়ে,

সামনের আয়নায় পোজটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তাঁবুতে সে একা, কিন্তু কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে হাজার হাজার দর্শক মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, হাততালিতে ফেটে পড়ছে আনন্দমুখর জনতা। হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে হেঁটে এল সে, তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। 'মেজর লুইগি রাকাকে এই মুহূর্তে ডেকে আনো এখানে।'

'এই মুহূর্তে, মাই কর্নেল!' বলল সেন্ট্রি।

পর্দা ফেলে তাঁবুর মাঝখানে ফিরে এল কাউন্ট।

দশ মিনিট পর তাঁবুতে ঢুকল মেজর রাকা, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল সে। 'আমাকে ডেকেছেন, মাই কর্নেল?'

'মাই ডিয়ার, রাকা।' ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল কাউন্ট, সবটুকু সৌন্দর্যসহ তার মধুরতম হাসিটি ফুটিয়ে তুলল চেহারায়, সাগ্রহে এগিয়ে এল মেজরের কাঁধে স্নেহের হাত রাখবার জন্য। 'এক গ্লাস ওয়াইন চলবে নাকি, মাই ডিয়ার ফেলো?'

কাউন্ট ডিকানডিয়ার এইটুকু বাস্তব জ্ঞান আছে বৈকি যে মেজর রাকাকে বাদ দিয়ে শিফটা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা তার একার পক্ষে কোন কালেই সম্ভব নয়। লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কাউন্ট তার মানসিক চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, এরপর আর মেজরের প্রতি তার কোন বিরূপ মনোভাব থাকবার প্রশ্নই ওঠে না।

'বসো, বসো,' বলল সে, ডেস্কের উল্টোদিকে ফেলা ক্যাম্প চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখাল। 'সিগার রয়েছে, ধরাও না। আরে লজ্জা কী!' স্নেহে প্রশ্রয় দিল মেজরকে, একজন বাবা তার বড়ছেলেকে যেমন দিয়ে থাকে। 'আমি চাই, রিপোর্টটা তুমি পড়ো, পড়ার পর আমার পাশে তুমিও একটা সই করো।'

কাগজগুলো ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল মেজর

রাকা, পড়তে পড়তে বুলডগের মত ভাঁজ হয়ে গেল তার চেহারা। 'মাই কর্নেল, এখানে আপনি লিখেছেন চল্লিশ হাজার মানুষখেকো জংলী আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমার সন্দেহ আছে…'

'মতভেদ থাকতেই পারে, রাকা। সময়টা ছিল অন্ধকার। সঠিকভাবে কেউই বলতে পারবে না সংখ্যায় ওরা ক'জন ছিল।' অমায়িক হেসে আপত্তিটা অগ্রাহ্য করল কাউন্ট। 'এটা স্রেফ একটা তথ্যভিত্তিক হিসাব–পড়ে যাও। তোমার আচরণ সম্পর্কে ভাল দু'একটা কথাও লিখেছি।'

আবার পড়া শুরু করল মেজর, কিন্তু আবার হোঁচট খেলো সে। 'কর্নেল, শত্রুরা হতাহত হয়েছে একশো ছাব্বিশজন, বারো হাজার ছশোজন নয়।'

'ভুলটা কলমের, রাকা। হেডকোয়ার্টারে পাঠাবার আগে ওই জায়গাটা মেরামত করে দেব।'

'স্যার, আপনি কোথাও বলছেন না যে শত্রুদের সাথে আর্মারড ভেহিকেল রয়েছে।'

বৈঠক শুরু হওয়ার পর এই প্রথম কাউন্টের ভুরু কুঁচকে উঠল। 'আর্মারড ভেহিকেল, রাকা? বুঝতে পেরেছি, আসলে তুমি অ্যাম্বুলেন্সের কথা বলতে চাইছ।' কাউন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অদ্ভুতদর্শন মেশিনটার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎলাভের ঘটনাটা ভুলে যাওয়াই সবদিক থেকে ভাল। গোটা ব্যাপারটায় তাদের, বিশেষ করে তার, কোন কৃতিত্ব একেবারেই ছিল না। প্রসঙ্গটা তোলা হলে জেনারেল ফাদের মনে অকারণ খটকা সৃষ্টি করা হবে, তা ছাড়া তার এত সুন্দর রিপোর্টের সৌন্দর্য আর গুণগত মানও ক্ষুণ্ন হবে। 'শত্রুদের সাথে মেডিকেল সাপ্লাই, বাহন ইত্যাদি তো থাকবেই–অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। উল্লেখ করার কোন দরকার নেই। পড়ে যাও! পড়ে যাও! দেখো না, তোমার পদোন্নতির

জন্যেও সুপারিশ করেছি আমি!’

পনেরো

অ্যানির প্রস্তাবে রাজি হলো প্রিন্স হাসান সালে, একটা আর্মারড গাড়িতে করে বানুকে সারডি শহরে পাঠানো যেতে পারে। ওখানে একটা ক্যাথলিক মিশন আছে, পরিচালক ভদ্রলোক জার্মান ডাক্তার। বানুর পায়ের ক্ষত ঠিকভাবে সারছে না, পুঁজ কমা তো দূরের কথা বরং বাড়ছে, ফোলাটাও যেন আগের চেয়ে বেড়েছে। এ-সব লক্ষণ দেখে ভারি উদ্বিগ্ন বোধ করছে অ্যানি।

ন্যারো গেজ একটা রেললাইন আছে সারডি পর্যন্ত, যানবাহনের জন্য আদ্দিস আবাবা থেকে ফুয়েল এসে পৌঁচেছে সেখানে। কয়েক ড্রাম ফুয়েল গাধা আর উটের পিঠে তুলে গিরিখাদের খাড়া অংশ থেকে নীচে নামানো হয়েছে। এই মুহূর্তে গিরিখাদের গোড়ায় ড্রামগুলো অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। ওখানে দিক বদলেছে সারডি নদী, অ্যাকাইশা বনভূমির ভিতর দিয়ে এগিয়ে নেমে গেছে ত্রিভুজ আকৃতির একটা উপত্যকায়। মরুভূমিকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার আগে উপত্যকার মুখটা চওড়ায় দাঁড়িয়েছে পনেরো মাইল। উপত্যকার মাথায়, শুকনো মাটিতে শুকিয়ে গেছে নদীটা, ওখান থেকে শুরু হয়েছে তার পাতাল অভিযান, অবশেষে আবার উদয় হয়েছে ওয়েলস অভ চান্ডির ছড়ানো ছিটানো কুয়াগুলোয়।

অ্যানির কারে সারডি পর্যন্ত যাচ্ছে প্রিন্স সালে, কারণ ওখানেই তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা গালা গোত্রের নূর আয়াঙের সঙ্গে। দুই গোত্র এক হয়ে শিফটাদের আক্রমণ প্রতিহত করবে, গালাদের

সঙ্গে এ ধরনের একটা চুক্তি হয়ে গেলে উভয় পক্ষেরই লাভ। ওখানে যাবার আরও একটা কারণ রয়েছে প্রিন্সের। আদ্দিস আবাবা থেকে সারডিতে একটা প্লেন পাঠানো হবে, যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য লেক টানায় যাবে প্রিন্স—সম্রাটকে বোঝানোর শেষ চেষ্টা করবে সে।

রওনা হবার আগে রানা আর মাইকেলের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করল হাসান সালে। এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে তিনজন ওরা হাঁটছে, রাস্তাটা প্রায় খাড়াভাবে গিরিখাদের দিকে উঠে গেছে। পাথরের গা বেয়ে বিপুল বেগে নেমে আসছে সারডি নদীর জলরাশি।

ওদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রিন্স, মুখ তুলে রাস্তার মাথায় তাকাল। প্রথম খাড়া বাঁকটা পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা, পাশেই জলপ্রপাতের আকৃতি নিয়ে সগর্জনে নীচে নামছে নদী। রাস্তার উপর কুয়াশার মত ভাসছে জলকণা।

'ঢালটা দেখলেই তো ভয় করে,' বলল রানা। 'গাড়ি নিয়ে অ্যানি উঠতে পারবে বলে মনে হয়?'

'তোমরা গাড়িগুলো আনছ এই খবর যখন থেকে জানি, সেই থেকে আমার প্রায় এক হাজার লোক রাতদিন কাজ করছে এই রাস্তার ওপর,' বলল প্রিন্স। 'দুর্গম, তা ঠিক, তবে গাড়ি নিয়ে যেতে কোন সমস্যা হবে না।'

'তোমার কথা যেন সত্যি হয়, চকলেট সালে,' গম্ভীরমুখে বিড়বিড় করল মাইকেল। 'পিছিয়ে এসে যে ফাঁদে আমরা ধরা পড়েছি তা থেকে বেরুবার এই একটাই তো পথ দেখছি। শিফটারা যদি উপত্যকার প্রবেশপথটা বন্ধ করে দেয়...,' হাত ইশারায় ওদের নীচে পাহাড় আর প্রান্তরগুলো দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে, কথাটা শেষ করবার প্রয়োজন বোধ করল না, তার বদলে দাঁত

দেখিয়ে প্রিন্সের মুখের উপর হাসল। 'আমরা শুধু তিনজন রয়েছি এখানে, চকলেট, ওল্ড বয়। তোমার বক্তব্য শোনার জন্যে ভয়ানক উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। ঠিক কী চাও তুমি আমাদের কাছে? তোমার কী কী কাজ করতে হবে আমাদের? সি.আই.এ., মাফিয়া, ইটালিয়ান আর শিফটা-পাওনা টাকা পাবার আগে এতগুলো বাহিনীকে পরাজিত করতে হবে?'

'না, সেভারস,' বলল প্রিন্স। 'আমি তো আগেই তোমাদের জানিয়েছি সব কথা। সেলাসি বাহিনী আর কমিউনিস্টদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে, এই যুদ্ধ আর শিফটাদের মাঝখানে রয়েছি আমরা। শিফটারা যাচ্ছে সেলাসি বাহিনীকে মদদ দেয়ার জন্যে, যাবার পথে আমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে যাবে-এটা তাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। কারণ প্রথম থেকেই ভাব দেখানো হচ্ছে, এটা নেহাতই শিফটাদের হামলা, যেমন প্রতিবছর হয়ে থাকে, গোত্রে গোত্রে কলহ বা দাঙ্গা,-উদ্দেশ্য দুনিয়ার লোক যাতে বুঝতে না পারে সম্রাটকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্যে বিদেশী কোন শক্তি সাহায্য করছে বা কমিউনিস্টদের মেরে সাফ করে দেয়া হচ্ছে।

'সম্রাটের সাথে আমার কথা হবে, তবে লাভ কতটুকু হবে বলতে পারছি না। একটা কথা ঠিক, খালি হাতে ফিরব না আমি। হয় সম্রাট আমাকে সাহায্য করবেন, নয়তো কমিউনিস্ট গেরিলারা। এবার আসল সমস্যায় আসা যাক। শেষ পর্যন্ত, যতই না আমরা চেষ্টা করি, গিরিসংকট পেরিয়ে মালভূমি ও ডেসি আর আদ্দিসের রাস্তায় পৌঁছুবেই শিফটারা, আমরা তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তবে দেরি করিয়ে দিতে পারব। দেরি করাতে হবে, কারণ এখুনি বললেই তো আর আমি সম্রাট বা গেরিলাদের

সাহায্য পাচ্ছি না।'

'কতদিন দেরি করাতে হবে?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

'নির্ভর করছে সাহায্য নিয়ে ক'দিনের মধ্যে আমি ফিরতে পারব তার ওপর।'

'চকলেট সালে, কাজের তুলনায় তুমি বেতন আমাদেরকে নেহাতই কম দিচ্ছ,' অভিযোগ করল মাইকেল।

প্রিন্স ভাব দেখাল তার কথা শুনতে পায়নি। তার পরবর্তী বক্তব্য ওদের মনোযোগ কেড়ে নিল। 'আর্মারড কারগুলো এখানে আমরা গিরিখাদের সামনে খোলা গ্রাউন্ডে কাজে লাগাব, আর আমার বাবার ট্রুপস তোমাদের সাপোর্ট দেবে।' থেমে নীচে তাকাল সে, বিশাল জায়গা জুড়ে অ্যাকাইশা গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে থাকা ক্যাম্পগুলোর দিকে তাকাল ওরাও। কামাল হাসানের বাহিনী সবাই এখনও পৌঁছুতে পারেনি ওখানে, এখনও ওয়েলস অভ চান্ডির কিনারা থেকে গোটা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বহু লোক, বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে বা মন্থরগতি গাধা ও খচ্চরের পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছে। তবে পদাতিক যোদ্ধারা একত্রিত হয়ে কয়েকটা ঝাঁক বেঁধেছে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে ঘোড়সওয়ার পদস্থ সর্দাররা। 'গালারা যদি আমাদের সাথে হাত মেলায়, আমাদের বারো হাজারের সাথে যোদ্ধার সংখ্যা পাঁচ হাজার বাড়বে। স্কাউট পাঠিয়ে শিফটাদের সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছি–কমবেশি এক হাজার। জানি ওদের অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক, তবু এখানে ওদেরকে আমরা বেশ কিছুদিন আটকে রাখতে পারব...।'

'যদি না ওদের সংখ্যা আরও বাড়ে, বাড়বে ধরে নেয়াই ভাল,' বলল মাইকেল। 'কিংবা যদি না আর্মার পৌঁছায় ওদের হাতে, পৌঁছুবে ধরে নেয়াই ভাল, কী?'

‘সেক্ষেত্রে গিরিখাদে পিছিয়ে যাব আমরা, পিছু হটার সময় ব্যারিকেড তুলব রাস্তায়, ভাল আড়াল পেলে দু’এক জায়গায় থেমে বাধা দেব ওদেরকে। যতক্ষণ না সারডিতে পৌঁছাই, আর্মারড কার আর ব্যবহার করতে পারব না। তবে ওদিকটায় পাহাড়ের পেটে খোলা জমি আছে, নড়াচড়ার প্রচুর জায়গা পাওয়া যাবে। ওটা শেষ একটা পয়েন্টও বটে, যেখানে শিফটাদের বাধা দেয়ার জন্যে জুতসই ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।’

প্রিন্স থামতেই এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। ওরা দেখল, আর্মারড কার গিরিখাদের গোড়ায় পৌঁছুল। ধীরগতিতে, সগর্জনে উঠে আসছে খাড়া ঢাল বেয়ে। রাস্তাটা সোজা উঠে আসেনি, পাথরের গায়ে চওড়া কার্নিস কোথাও কোথাও চুলের কাঁটার মত বাঁক নিয়েছে।

‘একটা কথা তোমাদেরকে না বললেই নয়,’ নিস্তব্ধতা ভাঙল প্রিন্স। ‘আমার বাবা আগের দিনের যোদ্ধা। ভয় কাকে বলে তিনি জানেন না। আধুনিক অস্ত্র সম্পর্কে তাঁর ভাল জানা নেই। বিশেষ করে একটা মেশিনগান পদাতিক বাহিনীর কী সর্বনাশ করতে পারে, তাঁর কোন ধারণা নেই। আমি আশা করব, তিনি অযৌক্তিক কোন সিদ্ধান্ত নিলে তোমরা তাঁকে ঠেকাবে।’

‘তাঁর ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারো,’ মুচকি হেসে বলল মাইকেল। ‘তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, ঠিকই সামলাতে পারব।’ নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে কথাগুলো বলল মাইকেল। মদ আর তাস, তার এই দুটো অস্ত্র খুব কম সময়ই হতাশ করে তাকে। সবাই তো আর মাসুদ রানার মত শক্ত মনের অধিকারী নয়। কামাল হাসান মদ খান না বটে, কিন্তু সেটা কোন বাধাই নয়। এরইমধ্যে মদ্যপানরত মাইকেলের সঙ্গে বসে

ঘন ঘন চা পান করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে। কারণটা সহজেই অনুমেয়।

গাড়িটা উঠে এল, সাদা গায়ে এখনও লাল ক্রস জ্বলজ্বল করছে। হ্যাচে অ্যানির মাথা দেখা গেল। নিশ্চয়ই গোসল করবার সুযোগ হয়েছে তার, সদ্য ধোয়া চকচকে চুল মাথার পিছনে সিল্ক রিবনের সঙ্গে আটকানো। চুলের সোনালি রঙ রোদ লেগে সামান্য সাদাটে দেখাল, পাকা আপেলের মত গোলাপি আভা ফুটে রয়েছে মুখে। সঙ্গে সঙ্গে রানা আর মাইকেল দ্রুত সামনে বাড়ল, অ্যানির সঙ্গে কেউ কাউকে যেন মুহূর্তের জন্যও একা থাকতে দিতে রাজি নয়।

কিন্তু অ্যানি ব্যস্ত। বানুকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন সে। নরম চামড়া আর কম্বল দিয়ে ক্যাবের মেঝেতে একটা বিছানা তৈরি করা হয়েছে, তাতে শুয়ে রয়েছে বানু। দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিল অ্যানি, অল্প দু'একটা কাজের কথা বলল শুধু। পিছনের দরজা দিয়ে নিতম্বিনীর ভিতর ঢুকল প্রিন্স সালে, হ্যাচ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যানির মাথা।

খাড়া রাস্তা ধরে আবার রওনা হয়ে গেল আর্মারড কার। সামনে একদল ঘোড়সওয়ার রয়েছে, সবাই তারা প্রিন্সের দেহরক্ষী, চেহারা আর হাবভাব দেখে ওয়েস্টার্ন ছবির পিশাচতুল্য রেড ইন্ডিয়ান বলে মনে হয়। পাহাড়ী ঘোড়াগুলোর গা থেকে অ্যামুনিশন ভরা ব্যাগ, তরোয়াল, বর্শা আর রাইফেল ঝুলছে। তাদের পিছু নিয়ে নিতম্বিনীকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। তারপরও সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও।

ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে কাঁধ দিয়ে রানার বাহুতে মৃদু একটা ধাক্কা দিল মাইকেল সেভারস। 'মনটাকে কাছাকাছি কোথাও ফিরিয়ে আনো, ওল্ড চ্যাপ,' ব্যঙ্গ ঝরল তার কণ্ঠে। 'ওটা এখন

তোমার শিফটাদের জন্যে দরকার হবে।’

গিরিখাদের গোড়া থেকে পাহাড় গর্ভের সমতল জমিটুকুর ঠোঁট পর্যন্ত দূরত্ব হবে মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ মাইল, কিন্তু রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উঠেছে পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত; কাজেই ওখানে, অর্থাৎ সারডি শহরে পৌঁছুতে ছ'ঘণ্টা গাড়ি চালাতে হলো অ্যানিকে।

প্রিন্সের শ্রমিক বাহিনী রাস্তার উপর এখনও কাজ করছে। ধুলো আর কাদা মেখে ভূতের মত হয়েছে তাদের চেহারা, সবার পরনে ঢোলা আলখেল্লা। পাথুরে কার্নিস যেখানে সরু হয়ে আছে সেখান থেকে বোল্ডার সরিয়ে ফেলে দিচ্ছে নীচের গভীর খাদে, আবার কোথাও শাবল দিয়ে খুঁড়ে সমান করছে খানিকটা বিস্তৃতি। দু’জায়গায় কার্নিসের ঢাল এত খাড়া, অ্যানির নির্দেশে রশি দিয়ে বাঁধা হলো নিতম্বিনীকে, শ্রমিকরা ধীরে ধীরে টেনে তুলল ওটাকে, একশো গজ নীচে খরস্রোতা নদী টগবগ করে ফুটছে। কিনারা থেকে খসে পড়তে পড়তেও পড়ল না গাড়ি, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল।

বিকেলের দিকে আকাশ-ছোঁয়া পাথুরে প্রাচীরের আড়ালে পড়ে গেল সূর্য, গিরিখাদে নেমে এল গাঢ় ছায়া, ভারি আর্মারড কারের কন্ট্রোল সামলাতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও স্যাঁতসেঁতে একটা ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করে শিউরে উঠল অ্যানি। এঞ্জিনের মতিগতি বিশেষ সুবিধের নয়, ওটার আওয়াজে প্রায়ই কোন ছন্দ বজায় থাকছে না, বিকট বিস্ফোরণের মত শব্দ তুলে ব্যাকফায়ার করছে মাঝে মধ্যে। আড়ষ্ট দুটো হাত আর পিঠের পেশীগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য একবার থামল অ্যানি, বানুর খবর নিতে গিয়ে দেখল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তার গা। চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে, কালো চোখে

অদ্ভুত একটা চকচকে ভাব। বিশ্রামের কথা ভুলে গিয়ে আবার গাড়ি ছাড়ল অ্যানি।

সামনে এক সময় হঠাৎ সরু হতে শুরু করল গিরিখাদ, ফলে মাথার উপর আকাশ সরু নীল ফিতের আকৃতি পেল, দু'পাশের প্রাচীর যেন পাথুরে চোয়াল, হাঁ করে গিলতে চাইছে গাড়িটাকে। প্রায় অসম্ভব বলে মনে হলেও, সামনের রাস্তা আরও খাড়াভাবে বাঁক নিয়েছে, ফলে বড় বড় কালো চাকাগুলো পিছলাতে শুরু করল ঘন ঘন, খসিয়ে দিল মুঠো আকৃতির পাথরের টুকরো—কামানের গোলার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেগুলো, একেবারে কাছ থেকে যারা অনুসরণ করছে ছিটকে সরে যেতে হলো তাদেরকে।

তারপর অকস্মাৎ গাড়ি নিয়ে ঢালের মাথায় উঠে এল অ্যানি, খিলান আকৃতির পাথুরে প্রবেশপথ থেকে বেরুতেই সামনে দেখা গেল চওড়া আর খোলা সমতল মাঠ, চারদিকে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়প্রাচীরগুলো বিশ মাইল দূরে। স্থানীয় লোকেরা পাহাড়ের ভিতর এই ফাঁকা জায়গাটাকে প্রকৃতির গর্ভ বলে। কোথাও কোথাও চাষাবাদও করা হয়েছে, গাছের পাতা আর বাঁশ দিয়ে তৈরি কৃষকদের গোলাকার কুঁড়েঘর রয়েছে অনেকগুলো। সারডি নদীর কিনারায় প্রচুর ঘাস জন্মেছে, ছাগল আর গরু চরছে সেদিকে।

ইঁটের তৈরি সাদা চুনকাম করা বেশ কিছু বাড়িঘর নিয়ে শহর, প্রতিটি বাড়ির ছাদ গ্যালভানাইজড করোগেটেড টিন দিয়ে ছাওয়া। পশ্চিম গিরিখাদের ভিতর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ছাদে, রুপোর মত জ্বলছে সেগুলো।

শুধু পশ্চিমেই পিছন দিকে কাত হয়ে রয়েছে পাহাড়গুলো, একটানা দু'হাজার ফুট উঠে গেছে ঢাল, তেমন খাড়া নয়, মিলিত হয়েছে হাইল্যান্ডের সমতল মালভূমির সঙ্গে। লূপ আকৃতির

অসংখ্য বাঁক নিয়ে সরু ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে রেলওয়ে লাইনটা। সমতল মাঠের এক জায়গায় অনেকগুলো দোচালা আর খোঁয়াড়ের মাঝখানে এসে থেমেছে।

শহরের আরও সামনে, পশ্চিম ঢালের উপর ক্যাথলিক মিশনটা। ওটাও ইঁটের তৈরি একটা বাড়ি, মাথায় টিনের ছাদ। চার্চটাই একমাত্র বাড়ি, যেটায় সদ্য চুনকাম করা হয়েছে। খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকবার সময় অ্যানি দেখল, শক্ত কাঠের বেঞ্চিগুলো খালি পড়ে রয়েছে, তবে বেদির উপর মোমবাতি জ্বলছে, ফুলদানিতে তাজা ফুলও দেখা গেল।

বারান্দায় প্রায় পঞ্চাশজন লোক মেঝের উপর উবু হয়ে বসে রয়েছে, এরা সবাই চিকিৎসা পাবার জন্য এসেছে এখানে। তাদের নীচে গাড়ি থামাল অ্যানি, কেউ তেমন আগ্রহ নিয়ে তাকাল না।

ডাক্তার ভদ্রলোক মোটাসোটা, বয়স ষাটের কম হবে না। কাঁচাপাকা চুল ছোট করে ছাঁটা, গোঁফ নেই, ম্লান নীল চোখ। তিনি ইংরেজি জানেন না, ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকালেন, তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বানুকে নিয়ে। ডাক্তারের দু'জন সহকারী স্ট্রেচারে তুলল বানুকে, বারান্দায় নিয়ে এসে নামাল। পিছু নিতে যাচ্ছিল অ্যানি, তাকে বাধা দিল প্রিন্স সালে।

'ভাল লোকের হাতে পড়েছে বানু, আর কোন চিন্তা নেই—এদিকে আমাদেরও তো কাজ আছে।'

রেল স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল টেলিগ্রাফ অফিসে তালা ঝুলছে, তবে প্রিন্সের চেঁচামেচি শুনে লাইন ধরে কোত্থেকে যেন ছুটে এল স্টেশন মাস্টার, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে হাসান সালেকে চিনতে পারল সে।

অ্যানির রিপোর্টটা দীর্ঘ, টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সেটা পাঠানো স্টেশন মাস্টারের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। এর আগে যে সব মেসেজ পাঠিয়েছে সে, কোনটারই শব্দ সংখ্যা দশ-বারোটার বেশি ছিল না। অনেক শব্দই সে বুঝল না, ঘন ঘন মাথা চুলকাল, বিড়বিড় করল সারাক্ষণ, ভুরুটা স্থায়ীভাবে কুঁচকে থাকল। তার পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে ভাবল অ্যানি, নিউ ইয়র্কে তার সম্পাদকের ডেস্কে না জানি কী এলোমেলো চেহারা নিয়ে পৌঁছুবে রিপোর্টটা।

ওকে টেলিগ্রাফ অফিসে রেখে দেহরক্ষীদের সঙ্গে সরকারী বাসভবনে চলে গেছে প্রিন্স সালে। শহরের এক প্রান্তে সেটা। রিপোর্ট পাঠানো শেষ করতে রাত ন'টা বেজে গেল, ইতিমধ্যে পায়চারি করতে করতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে অ্যানির। পাঁচ হাজার শব্দের রিপোর্ট, স্টেশন মাস্টারকে দোষ দিতে পারল না সে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল পাহাড়ী রাত আলকাতরার মত কালো।

আকাশে কোন তারা নেই, হেডলাইট জ্বেলে শহরের ভিতর দিয়ে সরকারী ভবন খুঁজতে বেরুল অ্যানি। প্রিন্সের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ নেওয়া ছিল, খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। বেশ বড় একটা বাড়ি, বারান্দাটা লম্বা আর চওড়া, চুনকাম করা দেয়াল আর টিনের ছাদ। বাড়িটার চারদিকে ঘন গাছপালা, অন্ধকার ডাল থেকে ডানা ঝাপটে বাদুড় উড়ে যাওয়ার শব্দ পেল অ্যানি। উঠনের একধারে গাড়ি থামাল সে, গাড়ির চারদিকে অন্ধকারের ভিতর অনেকগুলো ছায়ামূর্তি দেখতে পেল, সবাই সশস্ত্র ও সতর্ক। এরা যে প্রিন্সের দেহরক্ষী নয়, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়েছে অ্যানি। না, রাসটাফারিয়ান বা হারারি গোত্রের লোক নয় এরা।

উঠনে অনেক ঘোড়াও রয়েছে। ঝোপ-ঝাড়ের ওদিক থেকে

নারীকণ্ঠ আর শিশুদের গলাও ভেসে এল। বিশাল এলাকা জুড়ে বাড়ি আসলে একটা নয়, অনেকগুলো—এঞ্জিন বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বহু লোকের ভারি একটা গুঞ্জন ঘিরে ধরল অ্যানিকে। একটু ভয় ভয় লাগল ওর। এত লোক কোত্থেকে এল!

গাড়ি থেকে বেরুল সে, সামনে ভিড় অথচ অন্ধকারে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। সাবধানে এগোল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'পাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল লোকগুলো। বারান্দায় উঠে এল অ্যানি।

বারান্দায় কোন আলো নেই, তবু বোঝা যায় লোক গিজগিজ করছে। সামনের ঘরটায় ঢুকল অ্যানি, ভিতরে প্যারাফিন ল্যাম্প জ্বলছে, প্রতিটি ল্যাম্প থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে হু-হু করে। ঘরের ভিতর পুরুষমানুষের ঘাম, তামাক, রান্না করা মাংস আর মশলা ও তেজের গন্ধ।

অ্যানি ঢুকতেই বিপজ্জনক একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভিতর, দোরগোড়ায় অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চোখে নগ্ন সন্দেহ আর মারমুখো ভাব নিয়ে বহুলোক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এই সময় কামরার একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে সিধে হলো প্রিন্স সালে।

'মিস উইসপার,' বলে ভিড় ঠেলে হন হন করে এগিয়ে এল সে, অ্যানির সামনে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরল। 'তোমার কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছিল। রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে?' আবার ভিড় ঠেলে নিজের জায়গায় নিয়ে এল তাকে সে, পাশে বসাল, তারপর হাত-ইশারায় সামনে বসা লোকটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'গালা গোত্রের প্রধান ও, নূর আয়াঙ গালা।'

ক্লান্ত আর খানিকটা সন্ত্রস্ত হলেও, লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল অ্যানি। উঠনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখে যেমন ভয় ভয়

লেগেছিল, এই লোকটাকে দেখেও সেই ভাবটা ফিরে এল মনে। লোকটার চেহারায় উৎকট শত্রুতার ভাব ফুটে আছে, লুকিয়ে বা চেপে রাখবার কোন চেষ্টা নেই। সরীসৃপের মত ঠাণ্ডা চোখ, বড়বড় হলেও নেশাগ্রস্তের মত ঢুলুঢুলু, অপলক। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে নীচ, ইতর আর নির্দয় বলে মনে হলো অ্যানির। সেজন্য অবশ্য নিজেকে মনে মনে তিরস্কারও করল সে। কারও সম্পর্কে না জেনেই কোন সিদ্ধান্তে আসা কি উচিত?

লোকটার বয়স বেশি নয়, তিরিশের কোঠা এখনও পেরোয়নি। তবে হয় রোগ নয়তো লাম্পট্যের কারণে তার মুখ আর শরীর কেমন যেন চুপসে আছে, গায়ের চামড়ার নীচে মাংস যেন নরম কাদা। চামড়ার রঙও অনুজ্জ্বল সাদাটে, লোকটা যেন কখনও রোদে বোরোয়নি। ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, কাঁচা মাংসের মত লালচে, ত্বকের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

লোকটার দৃষ্টি একদম সহ্য করতে পারল না অ্যানি। ভব্যতার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। নিজের কুৎসিত ভাব সে গোপন রাখতে অভ্যস্ত নয়। শুধু যে অ্যানির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘন ঘন দৃষ্টি বুলাল তাই নয়, বুকের উপর আর তলপেটের নীচের দিকে একদৃষ্টে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে থাকল। ঘৃণায় রি-রি করে উঠল অ্যানির সারা শরীর। প্রচণ্ড রাগের মধ্যে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল সে। ওকে এমন নির্লজ্জের মত দেখছে বটে নূর আয়াঙ গালা, কিন্তু তার চেহারায় হাসি বা প্রশংসার ভাব বিন্দুমাত্র ফুটল না। এমন ভাবলেশহীন চেহারা কল্পনাও করা যায় না।

খক করে একবার কাশল প্রিন্স, তারপরও দীর্ঘ এক মিনিট অ্যানির উপর চোখ বুলাল নূর আয়াঙ গালা। অবশেষে হাসান সালের দিকে ফিরল সে, হরিণের শিং দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড পাইপটা লালচে ঠোঁটে তুলে ঘন ঘন টান দিল, কটুগন্ধী তামাকের ধোঁয়ায়

জায়গাটা ভরে গেল। গন্ধটাই অ্যানিকে বলে দিল লোকটার চেহারা অমন চুপসে আছে কেন। মারিহুয়ানা খাচ্ছে সে।

'সারাদিন তোমার কিছু খাওয়া হয়নি,' বলল প্রিন্স, চাকর-বাকরদের ডেকে খাবার পরিবেশন করবার নির্দেশ দিল সে। 'আমাদের ক্ষমা করতে হবে, মিস উইসপার,' অ্যানির দিকে ফিরে আবার বলল সে। 'নূর আয়াঙ ইংরেজি বোঝে না, তা ছাড়া আমাদের আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে—খেয়ে নিয়ে তুমি নিজের ঘরে চলে যাও, তোমার ঘুম দরকার।'

'কোথায় শোব আমি?' একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

'তোমার জন্যে একটা কামরা ঠিক করা হয়েছে, কোন ভয় নেই,' অ্যানির মনের ভাব বুঝতে পেরে আশ্বস্ত করল প্রিন্স। 'আমাদের আলোচনা সারারাত ধরে চলবে,' ক্ষীণ হাসল সে। 'কথা হবে প্রচুর, সিদ্ধান্ত হবে কিনা বলা মুশকিল—শত বছরের শত্রুতা ভুলে রাতারাতি এক হওয়া সহজ কথা নয়।' নূর আয়াঙের দিকে ফিরল সে।

গরম, মশলাবহুল খাবার অ্যানির পেটের ফাঁপা আর ঠাণ্ডা খাদ ভরে তুলল, সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিল এক গ্লাস তরল আগুন অর্থাৎ তেজ। সাহস ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকসুলভ কৌতূহল পেয়ে বসল তাকে। নিজের চারদিকে কী ঘটছে জানবার আগ্রহে উঠবার নামটিও মুখে আনল না।

পালা করে কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে। নূর আয়াঙ যখন কথা বলছে, তার শুধু ঠোঁট নড়তে দেখল অ্যানি। শরীর স্থির, হাত অনড়, চোখ অপলক। থেমে থেমে কথা বলল সে, প্রচণ্ড ঝাঁঝের সঙ্গে, মাঝে মধ্যে দু'একটা শব্দ বারবার উচ্চারণ করল, দু'একটা

শব্দ বেরিয়ে এল বিস্ফোরণের মত সগর্জনে। আর প্রিন্স কথা বলল ঠাণ্ডা, মৃদু স্বরে। মাঝে মধ্যে হাত নাড়ল সে, ভুরু কপালে তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দু'চার সেকেন্ড করে বিরতি নিল, কিন্তু নূর আয়াঙ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় শুরু করল আবার।

নূর আয়াঙের দু'পাশে বসে আছে দুই যুবতী গালা। কালো, তবে চেহারায় লাবণ্য আছে। চুলে বোধহয় কখনও চিরুনি পড়েনি, জটা পড়ে গেছে। মেয়েগুলোর চোখ অস্বাভাবিক সরু, এবং আড়চোখে তাকানোর প্রবণতা ভারি অস্বস্তিকর। চেহারায় কোন ভাব নেই, শান্ত পুতুলের মত বসে আছে তারা। অন্যমনস্কভাবে দু'জনের যে-কোন একজনকে আদর করছে নূর আয়াঙ—অনেকটা প্রিয় কুকুরের গায়ে হাত বুলানোর ঢঙে। মাঝখানে একবার অসভ্যতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেল নূর আয়াঙের আচরণ—একটা মেয়ের ব্লাউজের ভিতর হাত গলিয়ে চাপ দিল সে। মেয়েটা ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, ব্যথা পেয়ে একবার শুধু গাল কোঁচকাল, তা ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার, এমনকী নূর আয়াঙের দিকে তাকালও না, ব্লাউজের ভিতর থেকে তার হাতটা সরিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করল না। গা ঘিন ঘিন করে উঠল অ্যানির, কারণ মেয়েটার ব্লাউজে ভিজে দাগ ফুটে উঠেছে। বোঝা গেল, দুধে ভরে আছে মেয়েটার বুক।

ক্লান্তিহীন সুস্থ থাকবার অনুভূতিটা দ্রুত হারিয়ে ফেলছে অ্যানি। মাথাটা একটু একটু ব্যথা করতে শুরু করছে। ধোঁয়ায় জ্বালা করছে চোখ। দুর্বোধ্য অ্যামহারিক ভাষার একঘেয়ে কথাবার্তা নার্ভের উপর হাতুড়ির বাড়ি মারতে শুরু করল। প্রিন্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়বে বলে ভাবছে, এই সময় কামরার বাইরে কীসের একটা গোলমাল শুরু হলো। প্রচণ্ড ঘৃণা আর আক্রোশের সঙ্গে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ চিৎকার করছে। কামরার

ভিতর কী এক প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠল লোকগুলো, ঝট করে মুখ তুলে ঝগড়াটে গলায় কিছু বলল নূর আয়াঙ।

দু'জন সশস্ত্র গালা এক যুবককে ধরে নিয়ে এল কামরার ভিতর। যুবকের বয়স আঠারো কি উনিশ হবে। তাড়াহুড়ো করে কামরার মাঝখানটা, নূর আয়াঙের সামনে, খালি করা হলো। রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে যুবকের হাত দুটো, কব্জির চামড়া কেটে ভিতরে ঢুকে গেছে রশি। চরম আতংকে দর দর করে ঘামছে সে, কোটরের ভিতর ছটফট করছে চোখের মণি।

যুবকের পিছু পিছু এল এক বুড়ি, তারস্বরে অবিরাম চিৎকার করছে। তার বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব ব্যাপার। সব চুল সাদা হয়ে গেছে, মাড়িতে একটাও দাঁত নেই, দু'পায়ে দাঁড়ানো বাঁদরের মত শরীর, কোমরের কাছে পিছনটা অদ্ভুতভাবে বাঁকা। বার বার বুড়ি লাফ দিয়ে যুবকের মুখ খামচানোর চেষ্টা করল। তার হাত হাড্ডিসার, শিরাগুলো ফুলে আছে, প্রতিটি আঙুলে নোংরা নখ এক দেড় ইঞ্চি করে লম্বা। চিৎকার করবার সময় মুখ হাঁ করছে সে, ভিতরটা কুচকুচে কালো আর পিচ্ছিল। তার প্রতিটি হামলা অনায়াসে, সহাস্যে, ব্যর্থ করে দিল সশস্ত্র প্রহরীরা, ঘন ঘন হাত ঝাপটা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখল বুড়িকে।

সামনের দিকে ঝুঁকে আগ্রহের সঙ্গে দৃশ্যটা উপভোগ করছে নূর আয়াঙ গালা, কী এক প্রত্যাশায় চকচক করছে তার চোখ। এতক্ষণে মাত্র একটা প্রশ্ন করল সে।

জবাবে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল বুড়ি তার সামনে। ফাঁকা জায়গাটায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করল সে। নিজের মাথার সাদা চুল ছিঁড়ছে, দাঁতহীন মাড়ির সাহায্যে হাত কামড়াচ্ছে, চড় মারছে নিজের গালে, আর এ-সবের সঙ্গে সমানে চলেছে আর্তচিৎকার।

স্তব্ধ বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেও, হঠাৎ করে অ্যানি উপলব্ধি করল, বুড়ি আসলে নূর আয়াঙের কাছে কিছু একটা চেয়ে আবেদন করছে।

নূর আয়াঙ সিধে হলো। তারমানে প্রত্যাখ্যান করল সে।

ব্যস, পাগল হয়ে গেল বুড়ি। প্রথমে সে আরও দ্রুতবেগে গড়াগড়ি খেলো নূর আয়াঙের পায়ের সামনে, ফলে তার পরনের ঢোলা আলখেল্লা ঊরুর উপর উঠে গেল। ফড়ফড় করে ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেলল সে, শেষ একটা গড়ান দিয়ে চলে এল নূর আয়াঙের পায়ের উপর। পালা করে গালা প্রধানের পায়ে চুমো খেলো আর মাথা ঠুকল। হেসে উঠে বুড়ির পেটে লাথি মারল নূর আয়াঙ, দূরে ছিটকে পড়ল বুড়ির হালকা শরীর, নূর আয়াঙের চোখে নেচে উঠল অশুভ একটা আলো।

দাঁড়াল বুড়ি, আবার ডাইভ দিয়ে পড়ল নূর আয়াঙের পায়ের সামনে। বারবার একই দৃশ্য–লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে বুড়ি, আবার ফিরে এসে নূর আয়াঙের পায়ে মাথা ঠোকে। মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করল গালা প্রধান, জবাব এল কখনও গার্ডদের কাছ থেকে, কখনও বুড়ির কাছ থেকে।

'মিস উইসপার,' বিড়বিড় করে বলল প্রিন্স। 'আমার পরামর্শ যদি শোনো, এখুনি তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এরপর যা ঘটবে তা তুমি দেখে সহ্য করতে পারবে না।'

'কেন, কী ব্যাপার?' দ্রুত জানতে চাইল অ্যানি, তার ভিতর সাংবাদিকসুলভ আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। 'কী করছে ওরা?'

'বুড়ির অভিযোগ, যুবক তার ছেলেকে খুন করেছে। গার্ড দু'জন ঘটনার সাক্ষী। আর নূর আয়াঙ বিচার করবে। এখুনি রায় দেবে সে। শাস্তিও দেয়া হবে সাথে সাথে।'

'এখানে?' হতচকিত দেখাল অ্যানিকে।

'হ্যাঁ, মিস উইসপার। আমি অনুরোধ করছি, তুমি চলে যাও। গালাদের প্রধান মুসলমান হলেও, ওরা বেশিরভাগই খ্রীস্টান—বুড়ি আর যুবকও তাই। কাজেই এ ধরনের অপরাধের শাস্তি বাইবেলে যা লেখা আছে তাই হবে—ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে রায় নেবে নূর আয়াঙ। ব্যাপারটা হবে দাঁতের বদলে দাঁত।'

প্রিন্সের পরামর্শ মেনে নিতে ইতস্তত করল অ্যানি। সম্ভাব্য সবরকম অভিজ্ঞতাই একজন সাংবাদিকের থাকা দরকার, তা সে যতই না কেন ভীতিকর বা বীভৎস হোক। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর সময় পাওয়া গেল না।

হাসতে হাসতে বুড়ির উন্মুক্ত বুকে একটা লাথি মেরে তাকে দূরে সরিয়ে দিল নূর আয়াঙ, অভিযুক্ত যুবককে ধরে থাকা গার্ডদের কী যেন একটা নির্দেশ দিল সে। রায় শুনে অকস্মাৎ বোবা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল বুড়ি। মনের আশা পূরণ হওয়ায় আনন্দে কী করবে ঠাহর করতে পারল না। উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল সে, জরাগ্রস্ত মুখে কুৎসিত হাসি। তারপর রোমহর্ষক একটা চিৎকার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না, অগত্যা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল যুবকের দিকে। গার্ডরা আবার তাকে হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিল, যুবকের গা থেকে সব কাপড় ঘন ঘন হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে তারা। দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়ল যুবক, শুধু হাত দুটো এক করে বাঁধা রয়েছে।

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর এত লোক ঢুকেছে যে তিল ধারণেরও জায়গা নেই। সব ক'টা দরজা আর জানালায় উপচে পড়ছে মানুষের মাথা। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে লোকজন, চিৎকার করে কথা বলছে। এমনকী ভাবলেশহীন দুই যুবতী গালা, নূর আয়াঙের

পাশে যারা বসে আছে, তারাও যেন কীসের প্রতীক্ষায় ছটফট করছে। পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কথা বলছে তারা, চুপিচুপি হাসছে, সরু চোখে নগ্ন উল্লাস।

অভিযুক্ত যুবক নরম গলায় ফোঁপাচ্ছে। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাল সে, যেন পালানোর পথ খুঁজল। তার নগ্ন শরীরে ফুটে রয়েছে সুগঠিত পেশী, ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে মধু-রঙা ত্বক, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। তার উপর থেকে দৃষ্টি ছিঁড়ে আনবার চেষ্টা করল অ্যানি, কিন্তু পারল না, সম্মোহিতের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

বন্দীর সামনে বারবার লাফ দিল বুড়ি, হুপ হুপ আওয়াজ করল, কখনও বসে কখনও দাঁড়িয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে উপভোগ করল অসহায় শিকারের প্রতিক্রিয়া। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, সে-ও তেমনি সন্তানের হত্যাকারীকে নিয়ে খেলছে। যুবকের মুখে থুথু ছিটাল সে, তার দিকে পিছন ফিরে কাপড় তুলে নিতম্ব নাচাল। যুবকের নাকের পাশে পড়া থুথু গড়াতে গড়াতে নেমে এল উদোম বুকে, ঘন কালো চুলের উপর।

'প্লিজ, মিস উইসপার! এবার তুমি যাও! প্লিজ!' আবেদন জানাল প্রিন্স।

দাঁড়াবার চেষ্টা করল অ্যানি, কিন্তু পা নড়ল না। চোখের সামনে যা ঘটছে তা বাস্তব বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না, আরও অবিশ্বাস্য লাগল তার নিজের উপস্থিতি।

অ্যানির উল্টোদিকে বসা গালা যোদ্ধাদের একজন কোমরের ঝোলা থেকে হাতড়ে একটা ড্যাগার বের করল। খাপ থেকে মুক্ত করবার পর দেখা গেল ফলাটা সরু আর হাতলটা বুনো ষাঁড়ের শিং থেকে চেঁছে তৈরি করা হয়েছে, বাঁধা হয়েছে তার দিয়ে। ফলার মাথা সামান্য একটু বাঁকা আর অসম্ভব ধারাল, লম্বায় প্রায় এক

হাত। বুড়ির দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্য চিৎকার করল সে, তারপর ড্যাগারটা মেঝের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

বুড়ির পায়ের কাছে স্থির হলো ড্যাগার। আনন্দের আতিশয্যে আবার বোবা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল সে। তারপর গায়ে কাঁটা দেওয়া একটা চিৎকার ছেড়ে তুলে নিল সেটা।

ড্যাগার উঁচিয়ে যুবকের দিকে ছুটে গেল ডাইনি বুড়ি। কোপ মারল, কিন্তু না, শুধু ভয় দেখাল–যুবকের বগলের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল চকচকে ফলা। এভাবে বারবার যুবকের শরীরের বিভিন্ন অংশে লক্ষ্যস্থির করল সে, ছুটে গেল, কোপ মারবার ভঙ্গি করল, কিন্তু লাগাল না। সারাক্ষণ হাসছে সে, ঠোঁটের দুই কোণ থেকে লালা গড়াচ্ছে। প্রতিবার ছুটে যাওয়ার সময় দর্শকরা একযোগে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিল তাকে।

প্রহরীরা এখনও শক্ত করে ধরে আছে যুবককে। ছাড়া পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় মোচড় খাচ্ছে সে। ওদের তিনজনেরই দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে বুড়ির হাতে ধরা ড্যাগারের উপর।

আবার আগের মতই ড্যাগার উঁচিয়ে ছুটে এল বুড়ি। এবার যুবকের হৃৎপিণ্ড বরাবর লক্ষ্যস্থির করেছে সে। কোপ মারল, সত্যি মারল, কিন্তু বুড়ির গায়ে জোর কম বলে ভিতরে খুব একটা ঢুকল না ফলা, হাড়ে লেগে পিছলে স্থানচ্যুত হলো।

যুবকের পাঁজরের কয়েকটা সাদা হাড় বেরিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে হাড়গুলো লাল তাজা রক্তে ঢাকা পড়ে গেল। উল্লাসে মুখর হয়ে উঠল গালারা। যুবকের উদ্দেশে কুকুর আর বিড়ালের ডাক ছাড়ল তারা। শিস দিল কেউ কেউ। মানুষ নয়, আক্ষরিক অর্থেই ওরা যেন একদল পশু।

বারবার চেষ্টা করল বুড়ি। আর একবারও সে মিথ্যে ভান

করছে না। দুই প্রহরীর মাঝখানে হাত বাঁধা যুবক ধস্তাধস্তি করছে, আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে প্রহরীরা। ইতিমধ্যে বুড়ির ড্যাগার ধরা গোটা হাত আর মুখ রক্তে ভিজে গেছে। ড্যাগারের ডগা হৃৎপিণ্ড ভেদ করতে পারছে না দেখে আক্রোশ বাড়ছে বুড়ির, রাগের সঙ্গে আরও জোরে ড্যাগার চালাল সে, কিন্তু আগের মত হৃৎপিণ্ডের চার ধারে শুধু গভীর অগভীর দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হলো, বুক ভেদ করতে পারল না।

বুকে ঢোকাতে না পেরে এবার বুড়ি যুবকের মুখের দিকে মন দিল। প্রথম কোপে যুবকের নাক আর উপরের ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে গেল। পরবর্তী কোপ চিরে দিল একটা চোখ, কোটরটা এক নিমেষে হয়ে উঠল গাঢ় রক্ত ভরা গর্ত। প্রহরীরা ছেড়ে দিতেই মেঝেতে পড়ে গেল যুবক।

সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে তার বুকে চেপে বসল বুড়ি, ঠিক যেন একটা কালো ভ্যাম্পায়ার। বুকে বসে যুবকের গলা কাটতে চেষ্টা করল সে। করাতের মত ড্যাগার চালাল কণ্ঠনালীর উপর। অবশেষে এক সময় ক্যারটিড ধমনী বিস্ফোরিত হলো, লাফিয়ে বেরিয়ে এল রক্তের মোটা ধারা, ভিজে একাকার হয়ে গেল বুড়ির কালো আলখেল্লা আর চারদিকের মেঝে, সেই পিচ্ছিল মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল শিকার আর শিকারী, দর্শকরা উন্মত্ত উল্লাসে নাচতে শুরু করল।

এতক্ষণে নড়ে উঠল অ্যানি উইসপার। ছেড়ে দেওয়া স্প্রিঙের মত সিধে হলো সে, মানুষের নিরেট পাঁচিল ফুটো করে দরজার দিকে ছুটল। প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে কীভাবে সে বেরিয়ে এল, বলতে পারবে না। রাতের অন্ধকার, ঠাণ্ডা উঠনে নেমে হাঁপাতে লাগল সে, যেন পাঁচ মাইল দৌড়ে এসেছে। বুঝতে পারছে ঘামে ভিজে গেছে তার ব্লাউজ, বমিটা গলায় উঠে আটকে আছে। একটা গাছের গায়ে

হেলান দিয়ে কেঁদে ফেলল সে। ধীরে ধীরে বসে পড়ল গাছের গোড়ায়। তারপর বমি করল।

বমি করবার পরও কয়েক ঘণ্টা কষ্ট পেল অ্যানি, আতংকটা কোনমতে ছাড়ল না তাকে, চোখে ঘুম আসতে দিল না। তার জন্য বরাদ্দ করা ঘরে একা শুয়ে থাকল সে, ড্রাম পেটানোর আওয়াজ আর গালাদের কর্কশ গলার একঘেয়ে গান শুনল। আর খানিক পরপর শিউরে উঠল।

*

ঘুম এল এক সময়, কিন্তু একটু পরই ছারপোকার কামড়ে জেগে উঠল অ্যানি। গা-হাত চুলকাতে গিয়ে দেখল, চামড়া ফুলে গেছে। বাকি রাতটা নিতম্বিনীর ভিতর কুঁকড়ে বসে থেকে কাটিয়ে দিল সে। গাড়ির হ্যাচ আর তলা দিয়ে ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস ঢুকে কাঁপিয়ে দিল ওকে। গায়ে চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে কখন ভোর হবে তার আশায় বসে থাকল সে।

ভোরের প্রথম আলো ফুটতে ইমার্জেন্সী রেশন ব্যাগ থেকে রান্না করা শুকনো মাংস আর বিয়ার বের করে খেলো অ্যানি। পশ্চিম খাদের ঢাল বেয়ে রওনা হলো গাড়ি, বানুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে। ওখানে পৌঁছে রাতের আতংক সামান্য হলেও ছেড়ে গেল তাকে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জার্মান ডাক্তারের চিকিৎসায় এরইমধ্যে সুফল ফলতে শুরু করেছে, বানুর ক্ষতটা আগের মত ভীতিকর লাগল না। তবে এখনও দুর্বল সে, যদিও জ্বর ছেড়ে গেছে। রীতিমত উৎফুল্ল দেখাল তাকে, অ্যানিকে বাস্তব জ্ঞান দান করবার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

লম্বা একটা দোচালার ভিতর অনেকগুলো লোহার বেড, নারী-

পুরুষ সব ধরনের রোগী রয়েছে আশপাশে। চারদিকে কাশি আর যন্ত্রণার শব্দ। বেডের কিনারায় বসে বানুর একটা হাত ধরে রয়েছে অ্যানি, কাল রাতের দুঃস্বপ্নটার বর্ণনা দিয়ে হালকা করছে মন।

'নূর আয়াঙ,' অ্যানি থামতে ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করল বানু, 'একটা মড়াখেকো। গাভীগুলো তার সাথে ছিল, তাই না?'

গাভী? বুঝতে পারল না অ্যানি। তারপর তার মনে পড়ল দুই যুবতীর কথা। 'কেন, ওদের তুমি…?'

বানু বলল, 'বুক ভরা দুধ আছে এমন যুবতী মায়েদের খুঁজে বের করার জন্যে নূর আয়াঙের লোকেরা পাহাড় চষে বেড়ায়।' বমি করবার ভাব দেখাল সে, নাটকীয় ভঙ্গিতে শিউরে উঠল। 'ও একটা পশু, অ্যানি। তার প্রজারাও জানোয়ার। সেই রাজা সলোমনের যুগ থেকে ওরা আমাদের শত্রু। ওদের সাথে হাত মেলাতে হচ্ছে আমাদের, সত্যি এরচেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না।' এরপর সে তার সুভাবসুলভ নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রসঙ্গ বদল করল। 'আজও কি তুমি খাদ বেয়ে নামবে ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বানু। 'ডাক্তার বলেছেন, তোমার সাথে আমি যেতে পারব না। আরও বেশ ক'টা দিন।'

'তুমি সুস্থ হও, তোমাকে আমিই এসে নিয়ে যাব,' বলল অ্যানি।

'আরে না, তার দরকার কী,' বলল বানু। 'ঘোড়ার পিঠে আরাম বেশি, শর্টকাট রাস্তাটাও ব্যবহার করা যাবে। চিন্তা কোরো না, খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের মাঝখানে দেখতে পাবে আমাকে। তবে ইতিমধ্যে একটা কাজ করো, ভাই–আমার পক্ষ থেকে গভীর ভালবাসা জানিয়ো আব্বাসকে। তাকে বলবে, তার জন্যে আমার হৃদয় ফোঁপাচ্ছে। বলবে, কল্পনায় আমার কাছে তাকে আসতে

হয়। সে এলে কী ঘটে...তাকে কল্পনা করে নিতে বলো। আরও বলবে, আমার চিন্তায়-চেতনায় তার হাঁটার শব্দ পাই আমি।'

হাসি চেপে গম্ভীর হলো অ্যানি। 'ঠিক আছে, বলব।'

এই সময় দীর্ঘদেহী এক যুবক ঢুকল দোচালায়। তার বয়স হবে বিশ কি বাইশ, পরনে বাদামি জ্যাকেট। অত্যন্ত সুদর্শন, চলাফেরায় স্মার্ট একটা ভাব। সোজা ওদের দিকে এগিয়ে এল সে।

এক নিমেষে বদলে গেল বানু। ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখ আধবোজা করে গোঙাতে লাগল সে। যুবক এগিয়ে এসে অ্যামহারিক ভাষায় সান্ত্বনা দিল বানুকে, তার জ্বর আর পালস্ রেট দেখল।

যুবক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল বানু। চাপা হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠল তার শরীর। অ্যানির মাথাটা ধরে নীচের দিকে টানল সে, কানে কানে বলল, 'ঠিক পাহাড়ী ভোরের মত সুন্দর ও, তাই না? ডাক্তারী পড়ছে, কিছু দিনের মধ্যে বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে যাবে। কাল রাত থেকে আমার প্রেমে পড়েছে ও। আমার পায়ের ব্যথা একটু কমলেই ওকে আমি প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করব।' অ্যানির চেহারায় স্তম্ভিত বিস্ময় দেখে আবার তাড়াতাড়ি বলল, 'আরে না, স্থায়ীভাবে না। দু'চার দিনের জন্যে। যতদিন না ঘোড়ায় চড়ে আব্বাসের কাছে ফিরতে পারি আর কী।'

দেহরক্ষীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এল প্রিন্স হাসান সালে। ওরা বাইরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকল, মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে ভিতরে ঢুকল প্রিন্স। তার গম্ভীর থমথমে মুখ মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য নরম হলো মেয়েকে আলিঙ্গন করবার সময়। প্রিন্স দেখল বানু খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠছে। এরপর সে কথাটা বলল

ওদেরকে।

'আমার গুপ্তচর খবর এনেছে, শিফটারা যে-কোন মুহূর্তে হামলা করবে।'

'আর ঠিক এই সময় আমি পড়ে আছি বিছানায়!'

প্রিন্স বলল, 'মিস উইসপার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাওয়া দরকার তোমার। গিরিখাদের গোড়ায় বাবা অপেক্ষা করছেন, তুমি তাকে খবরটা দিয়ে সাবধান হতে বলবে।' পকেট থেকে সোনালি পকেট-ওয়াচ বের করে সময় দেখল সে। 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা প্লেন ল্যান্ড করবে এখানে, সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবে আমাকে। খুশি হতাম তুমি যদি আমার সঙ্গে ল্যান্ডিং ফিল্ড পর্যন্ত যেতে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো অ্যানি।

'ওখানে নূর আয়াঙের লোকেরা জড়ো হয়েছে,' বলে চলল প্রিন্স। 'বারোশো ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা পাঠাতে রাজি হয়েছে সে। তারা তোমার পিছু নিয়ে যাবে...,' তাকে বাধা দিল বানু।

'নূর আয়াঙের ওই হায়েনাগুলোর সাথে একা থাকবে অ্যানি? কী বলছ? ওরা তো ওদের আপন মাকেও খেয়ে ফেলবে।'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল প্রিন্স, মৃদু হাসল। 'আমার নিজের বডি গার্ড থাকবে মিস উইসপারের সাথে। তারা ওর নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখবে–প্রতিটা মুহূর্ত।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না,' প্রতিবাদ করল বানু, অ্যানির হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে।

'আমার কিছু হবে না, বানু।' ঝুঁকে তার গালে চুমো খেলো অ্যানি, পাহাড়ী মেয়েটা মুহূর্তের জন্য আলিঙ্গন করল ওকে।

'আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি,' ফিসফিস করে বলল বানু। 'আমি না যাওয়া পর্যন্ত কিছু কোরো না। শেষ পর্যন্ত হয়তো

মাইকেলেরই প্রথম সুযোগ পাওয়া উচিত।’

অসহিষ্ণু একটা শব্দ করে অ্যানি বলল, ‘তুমি না আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে। একবার এর কথা বলো, একবার ওর কথা বলো…।’

‘হ্যাঁ,’ অভিযোগ স্বীকার করল বানু। ‘দু’জনেই ওরা অত্যন্ত যোগ্য প্রেমিক। সেজন্যেই তো তোমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে কাছাকাছি আমার থাকা দরকার।’

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা-১৬৩

দুইখণ্ডে সমাপ্ত দুর্দান্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

মুক্ত বিহঙ্গ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

আত্মগোপন করে আফ্রিকায় রয়েছে মাসুদ রানা
সাধারণ এক মেকানিকের ছদ্মবেশে।
গোটা কয়েক বাতিল গাড়ি কিনতে গিয়ে
পরিচয় হলো এক ইংরেজ ঠগবাজের সাথে।
কি করে যেন বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওদের।
তারপর এক এক করে
অনেক কিছুই জুটলো রানার কপালে—
আশ্চর্য এক বন্ধু, চারটে লৌহমানবী, প্রেম
এবং আদিবাসীদের পুরোদস্তুর একটা অসম যুদ্ধ।
গণহত্যার বর্বরতা
আবার একবার আগুন জ্বাললো রানার রক্তে—
ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে ওর সত্যিকার রূপ।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম ৪ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তিরিশ টাকা